KON-TIKI
By Thor Heyerdahl
Bengali Translation
by Jayanta kumar Bhaduri

প্রচ্ছদ / বিজয় চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৫৭



পত্রপুট

প্রকাশিকা / আরতি চক্রবর্তী, পত্রপুট, ৩৭/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। মুদ্রক / সুদেবচন্দ্র ঘোষ, দি নিউ কমলা প্রেস, ৯৪/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

লেখক ও রচনা প্রসঙ্গে

আধুনিক কালের এক অচিন্তনীয় দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের সত্যকাহিনী—কন-টিকি। নিউইয়র্কের ভাষায়—আমাদের কালের সব থেকে লোমহর্ষক সমুদ্র-কাহিনী। এই অভিযানের রূপকার হলেন থর হেয়ারডাহ্‌ল। জাতিতে নরওয়েজীয়। তিনি ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে নরওয়ের লার্ভেকে জন্মগ্রহণ করেন। একজন প্রকৃত সত্যান্বেষী নৃ-বিজ্ঞানী। তিনি মারকুয়েসাস দ্বীপে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে আমেরিকার আদিবাসীদের সম্বন্ধে এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথম যারা বসতি স্থাপন করেছিল, তারা জন্মসূত্রে দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী। তিনি যখন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা অভিজ্ঞমহলের কাছে পেশ করেন, তাঁরা এ সিদ্ধান্তকে উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত বলে হেসে উড়িয়ে দেন। এ সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করার অভিযানকে তাঁরা পাগলের প্রচেষ্টা বলে উপহাস করেন। কিন্তু হেয়ারডাহ্‌ল তাঁর সিদ্ধান্তে অটল—অবিচল। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করার জন্য আর পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে একদিন প্রাগৈতিহাসিক বালসা কাঠের ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের তুয়ামোতুতে অবতরণ করেন—১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে। সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনীই এই কন-টিকি (১৯৪৭) গ্রন্থে গ্রথিত। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে হেয়ারডাহ্‌ল প্যাপিরাসের তৈরি নৌকোয় চেপে মরোক্কো থেকে বার বোডাসে অভিযান চালিয়ে আর এক কীর্তি স্থাপন করেছেন। এবারও তাঁর প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীরাই একদিন এই নলকাঠির নৌকোয় চেপে দুস্তর সমুদ্র পেরিয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। সেই অ্যাডভেনচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাঁর লেখা 'রা-এক্সপিডিশনে' (১৯৪৭)।

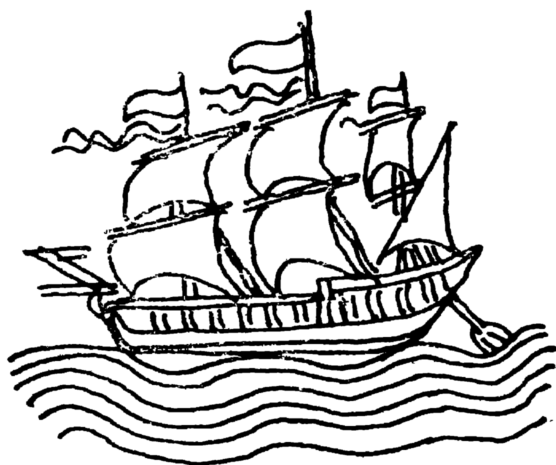
কন-টিকি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ইতিহাস ভূ-পরিচয় যথাযথ বজায় রেখে অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টির এমন নিদর্শন দুর্লভ।

কন-টিকি

[ভেলায় সমুদ্র অতিক্রমণের এক দুঃসাহসিক অভিযান]







মাঝে মাঝে ভারি অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। একটু একটু করে সমস্যার গভীরে ঢুকে পড়া—তারপর স্বাভাবিক নিয়মে নিজেই পথ কেটে এগিয়ে চলা। কিন্তু যখন তুমি সেই পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাও, হঠাৎ একসময় অবাক বিস্ময়ে নিজেকে জিজ্ঞেস কর—আচ্ছা, এরকম ঘটলটা কি করে ?

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন একদিন যদি ভেলায় চেপে মাঝ দরিয়ায় ভেসে পড়, সঙ্গী একটা তোতাপাখি, আর তোমার মতোই পাঁচজন মানুষ—এটা একেবারে অবশ্যম্ভাবী, একদিন সকালে ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে, একটু আত্মস্থ হয়ে অবাক বিস্ময়ে ভাবতে বসবে এ সম্পর্কে।

আমিও এই রকম এক সকালে আমার দিনপঞ্জি লেখার ডায়েরিতে লিখতে বসে গেলাম :

১৭ই মে, নরওয়ের স্বাধীনতা দিবস। উত্তাল সমুদ্র। ফুরফুরে সুন্দর বাতাস। আজ আমার রান্নার পালা। পাটাতনের উপর সাতটা উড়ুক্কু মাছ আর টরস্টেইনের স্লিপিং-ব্যাগে আরও একটা অজানা মাছ···এখানে এসে পেন্সিলের গতিরুদ্ধ হল। সেই চিন্তাটা মাথায় হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। সত্যিই কি মে মাসের এক অদ্ভুত সতের তারিখ! সব দিক থেকে বিচার করলে এ এক অদ্ভুত অস্তিত্ব। আচ্ছা, ঘটনাটা ঘটল কি করে ? ঘটনার মুখপাতই বা হল কি ভাবে ?

বাঁ দিকে তাকালে দিগন্তহারা নীল সমুদ্র, সমুদ্রের ফোঁসফোঁসানি। ভেলার গা ছুঁয়ে ধেয়ে চলেছে সমুদ্র দিগন্তের দিকে—যে-দিগন্ত নিরন্তর সরে সরে যাচ্ছে দূরে—বহুদূরে। ডাইনে তাকালে দেখতে পাচ্ছি অ াধার-মলিন কেবিনের ভিতরটা—সেখানে একজন দেড়ে চিত হয়ে শুয়ে গ্যেটে পড়ে চলেছে। পায়ের পাতা কেবিনের ছাদের বাঁশের বাখারির জাফরির ফাঁকে সতর্কভাবে গলিয়ে দেওয়া। এটাই আমাদের সার্বজনীন শয়ন-কক্ষ। 'ভাইয়া ?', তোতাটাকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম আমি। সবুজ তোতাটা অনবরত ডায়েরি বইটার উপর বসতে চেষ্টা করছে। 'আচ্ছা ভাই, আন্দাজ করতে পার কেমন করে ঘটল সমস্ত ব্যাপারটা ?'

'তা পারি। কিন্তু তোমারই তো সব থেকে ভালো জানার কথা। তোমার মাথা থেকেই তো বেরিয়েছে। তবে স্বীকার করতেই হবে মতলবটার মৌলিকত্ব আছে।'

দেড়ে পাট্রা তিনটে বাখারির উপরে তুলে ধরে আবার পড়ায় মনঃসংযোগ করল। ওকে একটুও চিন্তিত দেখা গেল না। নিঃশঙ্ক, অবিচলিত। কেবিনের বাইরে আরও তিনজন সঙ্গী রোদে ভাজা হয়ে কাজ করছে—বাঁশের পাটাতনের উপর বসে। ওদের অর্ধ উলঙ্গ বলা চলে। গায়ের রঙ রোদে পুড়ে বাদামী। মুখ ভরতি দাড়ি। পিঠে

হ্ননের ছোপের দাগড়াদাগড়ি। দেখে মনে হবে এই কাঠের ভেলা বাওয়া ছাড়া জীবনে আর কোন কাজ করেনি।

ভেলা চলেছে পশ্চিমমুখো—প্রশান্ত মহাসাগরের জল কেটে।

এরিক হামাগুড়ি টেনে এগিয়ে এল—হাতে সেক্সট্যান্ট (দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ মাপার যন্ত্র) আর এক বাণ্ডিল কাগজ। ৯৮° ডিগ্রী ৪৬ মিনিট পশ্চিম ও ৮° ডিগ্রী ২ মিনিট দক্ষিণে কোণ বরাবর চলেছে ভেলা। গতকালের তুলনায় চমৎকার, বুঝেছ খোকারা।

সে আমার হাতের পেন্সিলটা খপ করে কেড়ে নিয়ে বাঁশের দেয়ালে টাঙানো সমুদ্রের মানচিত্রে পেরুর পশ্চিম উপকূলের ক্যালাও থেকে যে উনিশটা বৃত্ত পর পর একটু বক্রভাবে সাজানো রয়েছে, তার পরে আরও একটা ছোট বৃত্ত আঁকল। হেরমান, হ্যুট টরস্টেইনরাও ওর কাছে এসে ভিড় জমাল। তাদের মুখে-চোখে প্রচণ্ড আগ্রহ দপ দপ করছে। এই বৃত্ত থেকে জানা গেল দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ থেকে এখন চল্লিশ সমুদ্র-মাইল দূরত্বে আছে তারা। বেশ গর্বের সঙ্গে বলল হেরমান, 'দেখতে পাচ্ছ খোকারা? এর অর্থ, পেরু থেকে আটশ পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে এসেছি আমরা।'

'অর্থাৎ এখনও গন্তব্যের নিকটতম দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছুতে তিন হাজার পাঁচশ মাইল বাকি—'আলতো করে কথাটা ছুঁড়ে দিল হ্যুট।

'আরও যথাযথ ভাবে বলতে হলে বলব আমরা সমুদ্রের উপরে পনের হাজার ফীট উঁচুতে আছি আর চাঁদ থেকে কয়েক ফ্যাদম নিচে।'

এখন ঠিক কোথায় আছি আমরা, সবাই জানতে পারলাম। আর তাই আমি এ ব্যাপারে কল্পনার আকাশে পাখা মেলে দিতে পারি। তোতার এসবের বালাই নেই। তার একমাত্র চিন্তা আমার দিনপঞ্জির বইটা নিয়ে গুণটানা। সমুদ্রটাকে আকাশের মতোই গোলাকার দেখাচ্ছে। উপরে নীল—নিচেও নীলের সমারোহ।

নিউইয়র্ক যাদুঘরের অফিসে আগের বছরের শীতে সমস্ত ঘটনার মুখপাত শুরু হয়েছিল। না, খুব সম্ভবত দশ বছর আগেই শুরু—প্রশান্ত মহাসাগরের মারকুয়েসাস দলভুক্ত ছোট্ট একটা দ্বীপে। হয়ত আমরা এখন সেই দ্বীপেই উঠব যদি না উত্তুরে হাওয়া আমাদের দক্ষিণে তাহিতি ও তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জে ঠেলে নিয়ে যায়। ছোট্ট দ্বীপটাকে আমি মনের আকাশপটে দেখতে পাচ্ছি। বন্ধুর মরচেলাল পাহাড়, সবুজ বন-জঙ্গল যা একেবারে সমুদ্রের কোলে এসে ঢলে পড়েছে। লম্বা নমনীয় তালীবৃক্ষ-রাজি সারা দ্বীপ ঘিরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—তরঙ্গায়িত হচ্ছে বাতাসের দাপটে। দ্বীপটার নাম ফাতুঁ হিভা। আমরা এখন যেখানে ভেসে চলেছি সেখান থেকে আমাদের ও এই দ্বীপের মাঝখানে আর কোন স্থলভাগ নেই। কয়েক হাজার সমুদ্র-

মাইল দূরে এখন আমরা। ঠিক যেখানটায় দ্বীপটা সমুদ্রে এসে মিশেছে সেখানে সঙ্কীর্ণ ওউইয়া উপত্যকা দেখতে পাচ্ছি। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে আমরা নির্জন সমুদ্রতটে চুপচাপ বসে থাকতাম, সামনে সীমাহীন সমুদ্র দূর প্রসারিত। এইভাবে কত সন্ধ্যাই না কেটে গেছে। আমার সঙ্গে তখন আমার স্ত্রী ছিল। এই জল-দস্যুরা কেউ সঙ্গে ছিল না। হাতের নাগালে যা পাচ্ছিলাম, কুড়োচ্ছিলাম—জীবন্ত যে-কোন প্রাণী, মৃত সভ্যতার মূর্তিটুর্তি, নানা পুরানিদর্শন।

একটি সন্ধ্যার কথা বিশেষ করে মনে আছে। সভ্য জগতকে মনে হচ্ছিল দূর অস্ত—অবাস্তব। পুরো একটি বছর এই দ্বীপে ছিলাম আমরা। আমরাই একমাত্র শ্বেতকায় মানুষ সেই দ্বীপে। সভ্যতা, ভালো-মন্দ সবকিছু স্বেচ্ছায় ফেলে এসেছি। ছোট্ট একটা কুঁড়েতে থাকতাম। কুঁড়েটা নিজের হাতেই তৈরি করা। তাল গাছের নিচে—সমুদ্রের কাছাকাছি। খেতাম, গ্রীষ্মমণ্ডলের বনে যা পেতাম আর প্রশান্ত মহাসাগার যা যোগাত কুড়িয়ে পুঁজি করতাম।

রোজ যেমন বসে থাকি, সেই বিশেষ সন্ধ্যায়ও তেমনি বেলাভূমিতে বসে আছি। সামনে সমুদ্র। জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। চারদিকে যে রোমাঞ্চকর পরিবেশ, সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কোন কিছুই যেন আমার চোখ আর কানকে এড়িয়ে যেতে না পারে, সে-সম্বন্ধেও সজাগ। জঙ্গল আর লোনা সাগরের গন্ধ নাক ভরে নিচ্ছি, তালগাছের মাথায় আর গাছের পাতায় বাতাসের আলোড়নের সাড়া পাচ্ছি। নির্দিষ্ট সময়ান্তর সমুদ্রের ঢেউ সব শব্দকে ছাপিয়ে ভেঙে পড়ছে দ্বীপের গায়ে—প্লাবিত করে দিচ্ছে বেলাভূমি। গণ্ডশৈলের গা ফেনময় হয়ে উঠছে। শুধু জলের গর্জন, কলকল, ছলছল। আবার সব নিঃশব্দ হয়ে আসে—সমুদ্রের জলরাশি ফিরে যায় সমুদ্রের গর্ভে। আবার ফিরে আসবে নতুন শক্তি নিয়ে অজেয় অটল দ্বীপকে পুনরাক্রমণ করতে।

'দ্বীপের অপর পার্শ্বে ঊর্মিভঙ্গের কোন বালাই নেই,' মন্তব্য পেশ করল আমার বউ। 'এটা ভারি অদ্ভুত নয় কি?'

'এর মধ্যে অদ্ভুতের কোন ব্যাপার-ট্যাপার নেই,' বললাম আমি, 'দ্বীপের এ পাশটায়ই তো শুধু বাতাসের যত হামলা। তাই তো সমুদ্র এদিকের বেলাভূমিতেই অনবরত ভেঙে পড়ে।'

আমরা বসে বসে সমুদ্রের দৃশ্য, সমুদ্রের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলাম। সমুদ্র পূব দিক থেকে আবর্তিত হয়ে আসছে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। সমুদ্র যেন এই উচ্ছ্বাস বন্ধ করতে গররাজি। এটাই বিবর্তনী পুবাল হাওয়া—যাকে বলা হয় অয়ন বায়ু। এই বায়ুই সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ, উচ্ছ্বসিত করে তোলে। সমুদ্র তখন আবর্তিত হয়ে পূর্ব দিগন্তরে দিকে ধেয়ে চলে। পথে এই দ্বীপ পড়েছে—তাই এর তটভূমিতে ভেঙে পড়ে, নিরন্তর বিক্ষুব্ধ করে তোলে, পাহাড়ের গায়ে শিলাখণ্ডে আছড়ে পড়ে। আর

পূবাল হাওয়া শুধু তটদেশ বন জঙ্গল ঝোপঝাড় আর পাহাড়ের উপর দিয়ে নিরুদ্ধ গতিতে ছুটে চলেছে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে অস্তাচলের দিকে।

তাই তো, সমুদ্রের এই স্ফীতি আর মাথার উপরের মেঘপুঞ্জ সৃষ্টির সেই উষাকাল থেকে একটানা ভেসে চলেছে পুব দিগন্তে।

প্রথমে যে-আদিবাসীরা এই দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিল, তারাও প্রকৃতির এই খেয়ালিপনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল। এখন যারা এই দ্বীপে বাস করে, তারাও জানে এসব কথা। সাগরের বুকে যে-পাখিরা বিচরণ করে, তারাও মাছ শিকারের উদ্দেশে উজান ঠেলে উড়ে চলে পুব দিকে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পূবাল বাতাসে ডানা ভর করে ফিরে যায় যে যার ঘরে। ক্লান্ত তখন ডানা, পেট খাবারে ঠাসা। এখানকার গাছগাছালি উদ্ভিজ্জ সম্ভারও পূবাল হাওয়ায় সৃষ্ট বারিপাতের উপর একান্ত নির্ভরশীল। আমরাও জানতুম একথা। পূর্ব দিগন্ত থেকে আসে বাদল মেঘ—দক্ষিণ আমেরিকার অবারিত তীরে আছড়ে পড়ে সেই মেঘ থেকে, নামে অঝোর বৃষ্টিধারা। অথচ মাঝখানে চার হাজার মাইল বিস্তৃত সমুদ্র।

আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম ভেসেচলা মেঘ আর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্র। আমাদের সামনে বসে এক অর্ধউলঙ্গ বুড়ো—গল্প করছিল আর আমরা তার কথা কান পেতে শুনছিলাম। বুড়োর দৃষ্টি নিভে-আঁসা শিখাহীন আগুনের কুণ্ডের স্তিমিত আলোর দিকে স্থির নিবদ্ধ।

বুড়ো ফিসফিস করে বলছিল—টিকিই ছিলেন ভগবান আর গোষ্ঠীপতি। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের এখানে এনে বসতি করান। এর আগে আমরা ছিলাম বিপুল সমুদ্রের ওপারে কোন একটা বিরাট দেশে।'

বুড়ো কাঠি দিয়ে কাঠকয়লা খুঁচিয়ে দিল যাতে না আগুন নিভে যায়। বুড়ো ভাবনার সাগরের অতলে তলিয়ে গেছে। সে একজন সুপ্রাচীন পুরুষ—এই গোষ্ঠীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। পূর্বপুরুষদের সে শ্রদ্ধা করে, পূজো করে। সেই আদিম পিতা থেকে নেমে আসা অবিচ্ছিন্ন বংশধারার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা। এ বিশ্বাসও সে মনে মনে পোষণ করে, একদিন সেই দেশের সঙ্গে আবার তারা মিলিত হবে—যেখান থেকে এসেছে তারা।

ফাতু হিভার পূর্ব উপকূলের বিলুপ্ত জাতির একমাত্র বংশধর সে। সুপ্রাচীন তেইতেতুয়া। তার বয়সের কোন গাছ-পাথর নেই। সে নিজেই জানে না এখন তার বয়স ক' কুড়ি। কিন্তু তার কুঞ্চিত গাছের ছালের মতো বাদামী তেলতেলে গায়ের চামড়া দেখে মনে হয় শতাধিক বছরের রোদে-জলে শুকিয়ে এই অবস্থায় এসেছে। মহামানব পলিনেশীয় গোষ্ঠীপতি সূর্য-পুত্র দেবতা টিকি সম্বন্ধে বহু রূপক-কাহিনী প্রচলিত। বংশপরম্পরায় সে-কাহিনী চলে এসেছে। এখনও সে-সব কাহিনী যে-কজন আত্মভোলা

বুড়ো জানে সে তাদেরই একজন।

সে-রাতে গুটি গুটি ফিরে এসে আমরা ছোট্ট কুঁড়ের বাঁশের মাচার উপর পাতা বিছনায় শুয়ে পড়লাম। বুড়ো তেইতেতুয়ার কাছ থেকে শোনা টিকি-দেবতা ও আদিম দ্বীপবাসীদের বিশাল সমুদ্র-পাড়ের জন্মভূমির গল্প আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—মস্তিষ্ককে পীড়িত করতে লাগল আর সেই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছিলাম দূরাগত ফেনায়িত সমুদ্রের চাপা গর্জন। নিরবধিকালের ব্যবধান। সেই সুদূর অতীত থেকে যেন ভেসে আসছে কত কথা। আমাকে তাদের যেন অনেক কথা বলার আছে। ঘুমোতে পারলাম না আমি। একসময় মনে হল, কালের ব্যবধান যেন ঘুচে গেছে। টিকি আর তাঁর সমুদ্র-সঙ্গীরা এইমাত্র এখানকার তীরে এসে অবতরণ করেছেন। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মনে বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি বউকে বললাম, 'বনের মধ্যে টিকির বিরাট পাথরের মূর্তিটা লক্ষ্য করেছ? দক্ষিণ আমেরিকার বিলুপ্ত সভ্যতার প্রতীক একশিলা স্তম্ভের মতো নয় কি?'

তটভূমিতে যে-সমুদ্র আছড়ে পড়ছে সেই সমুদ্রের গর্জনে যেন আমাদের চিন্তা-ভাবনার সমর্থন শুনতে পাচ্ছি। আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল গর্জন আর আমিও এক সময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

* * * *

খুব সম্ভবত এই ভাবে শুরু হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটা। আর তার ফলেই দক্ষিণ আমেরিকার দরিয়ায় আমরা ছটি প্রাণী আর একটি তোতাপাখি ভেলায় চেপে ভেসে পড়ি।

এখনও চোখের সামনে ভাসছে—বাবা আমার প্রস্তাব শুনে কেমন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলেন, মা ও বন্ধু-বান্ধবেরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছিল যখন আমি নরওয়েতে ফিরে আসি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যার মিউজিয়মকে ফাতু হিভা থেকে সংগ্রহ করে আনা কাচের এক জার ভরতি বিটল আর মাছ উপহার দিলাম। প্রাণীচর্চা ছেড়ে দেব আমি। আদিবাসীদের জীবন নিয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা করব। দক্ষিণসমুদ্রের অজানা রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের হাতছানি দুর্নিবার হয়ে উঠেছে আমার পক্ষে। রূপকথায় রূপান্তরিত টিকি-রহস্য সমাধানই আমার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলাম।

এরপর যে-বছরগুলো এল, তরঙ্গোচ্ছ্বাস ও বনবিলোপন আমার কাছে দূরান্তরিত অবাস্তব স্বপ্নে পরিণত হল। কিন্তু এরাই প্রকারান্তরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে অনুসন্ধান-অনুশীলন পঠন-পাঠনের পটভূমি। অবশ্য আরামকেদারায় বসা সখের শিক্ষার্থীর পক্ষে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা চিন্তাভাবনা ও মতিগতির হদিশ করা বা সঠিক অনুসন্ধান-অনুধাবন সহজ নয়। কিন্তু পাঠাগারে বইয়ের শেলফে-রাখা বইপত্তর অনুশীলন করে সেও সময় ও সময়ের দিগন্ত ছাড়িয়ে এমন দূরে যেতে পারে

যেখানে বর্তমান যুগের আবিষ্কারকরা যাবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অতীত কালের আবিষ্কারকদের লেখা বই, ইউরোপ ও আমেরিকার মিউজিয়মে সংরক্ষিত অসংখ্য মালমশলা সব এক জায়গায় একত্রিত করতে সচেষ্ট হলাম আমি। দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কারের পর আমাদের জাতভাইরাই প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও পৌঁছেছিল। বিজ্ঞানের সকল বিভাগের লোকেরা দক্ষিণসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের এবং তাদের আশেপাশে যারা বাস করে তাদের সম্বন্ধেও অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীদের আদি উৎস সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত কোন তথ্য নেই। আর কেনই বা এই বিচ্ছিন্ন প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলোতেই এদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করতে দেখা যায়, তারও কোন সঠিক কারণ নির্ণিত হয়নি।

প্রথম ইউরোপের লোকেরা যারা এই বৃহত্তম মহাসাগর অতিক্রম করার সাহস সঞ্চয় করেছিল, তারা তখন এই মহাসাগরের মাঝখানে কতকগুলো পর্বতময় ছোট ছোট দ্বীপ ও চ্যাপ্টা প্রবাল দ্বীপ দেখে ভারি অবাক হয়েছিল; তারা শুধু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নই নয়, এমন কি সারা দুনিয়ার অন্যান্য অংশ থেকেও বিচ্ছিন্ন। চারপাশে অসীম সমুদ্র। প্রায় প্রত্যেকটি দ্বীপেই লোকজন বাস করছে, লম্বা সুশ্রী চেহারা। সমুদ্রের বেলাভূমিতে এসে তারা আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছে। সঙ্গে আছে কুকুর শুয়োর আর মোরগ। কোথা থেকে এল তারা এই দ্বীপে? তারা এমন ভাষায় কথা বলে যা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আর আমাদের জাতের লোকেরা যারা নিজেদের এই দ্বীপমালার দুঃসাহসী আবিষ্কারক বলে গর্ব বোধ করে, তারা এখানে এসে দেখল কি? দেখল কর্ষিত জমি, গ্রাম, দেবালয়, প্রতিটি বাসযোগ্য স্থানে কুঁড়ে ঘর প্রভৃতি রয়েছে। কোন কোন দ্বীপে সুপ্রাচীন পিরামিডও দেখেছে। দেখেছে—পাকা রাস্তা, চারতলা কোঠাবাড়ির সমান উঁচু উঁচু পাথরের মূর্তিও। কিন্তু এই রহস্যময় বসতির কোন যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য নেই। এই লোকগুলোই বা কারা—এলই বা কোথা থেকে?

এই জটিল প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন—কারুর সঙ্গেই কারুর মিল নেই। মালয়, ভারত, চীন, জাপান, আরব, মিশর, ককেসাস, অ্যাটলান্টিক—এমন কি জার্মানী ও নরওয়েকেও পলিনেশীয়দের জন্মভূমি অর্থাৎ আদিবাসস্থল বলে কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই এমন এক একটা জটিল সমস্যা ও কুটিল প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিটি যুক্তির কাঠামো এক ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে একেবারে।

বিজ্ঞান হাত গুটিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা হাত বাড়িয়ে দিল। ইস্টার দ্বীপের রহস্যময় পাথর খোদাই-করা মূর্তি, তাছাড়া এই ছোট্ট দ্বীপের আরও অনেক ছড়িয়ে-

ছিটিয়ে থাকা পুরাকীর্তি, সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ আর দক্ষিণ আমেরিকার তটভাগের মাঝামাঝি অজ্ঞাতবাসে নিরালায় অবস্থান করছে। যোগাচ্ছে নানা উর্বর কল্পনার রসদ। অনেকের মতে ইস্টার দ্বীপের পুরাকীর্তি দক্ষিণ আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক পুরাকীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হয়ত একসময় স্থলপথে কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। পরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইস্টার দ্বীপ ও দক্ষিণ সমুদ্রীয় অঞ্চলে যেখানে এই রকম সুপ্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়, তারা কি সমুদ্রগর্ভে বিলীন-হয়ে-যাওয়া স্থলভাগের অংশ?

এটাই একমাত্র জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত। সাধারণ লোকেরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। জীববিদরা দক্ষিণসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের কীটপতঙ্গ শামুক প্রভৃতির জীবন-বৃত্তান্ত অনুশীলন করে প্রমাণিত করেছে—মানবইতিহাসের কোন সময়েই এই দ্বীপমালার সঙ্গে কোন মহাদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না। আজ যেমন আছে আগেও তেমনি ছিল—কোন তারতম্য নেই।

পলিনেশীয় জাতি কোন একসময় ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, স্রোতে ভাসতে ভাসতে অথবা জলযানে চেপে এই দ্বীপে এসে উঠেছিল—এবিষয়ে এখন সবাই সুনিশ্চিত আর তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল দুরধিগম্য দ্বীপের অভ্যন্তরে। দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা গভীরভাবে নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় ব্যাপারটা খুব বেশি শতাব্দী আগেকার ঘটনা নয়। পলিনেশীয়রা সমগ্র ইউরোপের চারগুণ বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে আছে ধরে নিলেও, বিভিন্ন স্থানে বাসের দরুন তাদের মধ্যে কিন্তু কোন ভাষাগত পার্থক্য গড়ে ওঠেনি। উত্তরে হাওয়াই থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড, পশ্চিমে স্যামোয়া থেকে পূবে ইস্টার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান, তাহলেও এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে এমন এক ভাষায় কথা বলে যা সবারই মাতৃভাষা,—যাকে বলা হয় পলিনেশীয় ভাষা।

এইসব দ্বীপের লোকজনেরা লিখতে জানত না—তাদের সম্বল শুধুমাত্র কয়েকটা কাঠের চাকতি যাতে খোদিত আছে কিছু দুর্জ্ঞেয় বর্ণলিপি। ইস্টার দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে আজও তা রক্ষিত আছে, তারা বা বহিরাগত কেউ সেসবের মর্মোদ্ধার করতে পারেনি। অথচ তাদের বিদ্যালয় ছিল—যেখানে ইতিহাস কাব্যে শিক্ষণের একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। পলিনেশীয়দের কাছে ধর্মের মতোই এর গুরুত্ব। দ্বীপের বাসিন্দারা প্রাক্‌পুরুষদের উপাসক—টিকির সময় পর্যন্ত মৃত গোষ্ঠীপ্রধানদের পূজা-অর্চনা করে এসেছে। আর টিকি নিজেই তো সূর্য-পুত্র।

যবে এইসব দ্বীপে বসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকেই প্রায় প্রত্যেক দ্বীপের দলপতিদের নাম এদের জ্ঞানী-গুণীজনেরা হাতে গুণে বলে দিতে পারত। তাদের

স্মৃতিকে সহায়তা করার জন্য তারা দড়িতে এক একটা করে গিঁট দিয়ে রাখত। ভারি জটিল পদ্ধতি। পেরুর ইনকাদের মধ্যেও এই রকম প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকরা প্রতিটি দ্বীপ থেকে স্থানীয় ঠিকুজিকুলজীনামা সংগ্রহ করেছে। তাদের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক মিল লক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি যুগের নাম ও সংখ্যা এক—কোন গরমিল নেই। গড়পরতা পঁচিশ বছর অন্তর একটি পলিনেশীয় যুগ হয়। এর থেকে হিসেব করে দেখা গেছে খ্রীস্টের মৃত্যুর পাঁচশ বছর আগে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে কোন জনবসতি ছিল না।

পরবর্তীকালে এই সব দ্বীপে জনাক্রমণ কোথা থেকে হয়েছে? অতি অল্পসংখ্যক অনুসন্ধানকারী এই কথাটা ভেবে দেখেছে যে পরবর্তীকালে যারা এই দ্বীপে এসেছে, তারা প্রস্তর যুগের বাসিন্দা। এ তথ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাদের বুদ্ধিমত্তা আর বিস্ময়কর উন্নত ধরনের সংস্কৃতি সত্ত্বেও এই সমুদ্রবিহারী লোকেরা সঙ্গে করে এনেছিল বিশেষ ধরনের পাথরের কুঠার আর প্রস্তর যুগের নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। সে-সব তারা দ্বীপের সর্বত্র যেখানে যেখানে গিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে। একথা ভুললে চলবে না, একমাত্র নতুন যুগের জাতিরা ছাড়া বিশেষ গোষ্ঠীর লোকেরা আর আদিম অরণ্যবাসী ও পিছিয়ে-পড়া জাতিরা শুধু নয়, খ্রীস্টের মৃত্যুর ৫০০ বা ১১০০ বছর আগে পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় অন্য কোন জাতি বর্তমান যুগের কোথাও যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানত না, জানত না লোহার ব্যবহার—ব্যবহার করত পাথরের কুঠার বা ঐ ধরনের যন্ত্রপাতি।

কাজেই আমার সন্দেহ ও মনোযোগ প্রাচীন পৃথিবী থেকে দূরে সরে আসতে লাগল। অনেকেই এদিক নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন কিন্তু পাননি কিছুই। আমার দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ হল আমেরিকার জানা ও অজানা আদিম সভ্যতার দিকে। এদিকে এ পর্যন্ত কেউ নজরই দেয়নি। দক্ষিণ আমেরিকা প্রজাতন্ত্রী পেরুর সুদূর উপকূল থেকে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনেক তথ্য পাওয়া যেত—যদি কেউ সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার বোধ করত। এখানে একদল অজানা লোক বসবাস করত যারা পৃথিবীর এক অদ্ভুত সভ্যতার অধিকারী। কিন্তু হঠাৎ একদিন তারা উধাও হয়ে গেল কোথায়—বেমালুম মুছে গেল ধরাপৃষ্ঠ থেকে—যেন তাদের অস্তিত্বই ছিল না কোনদিন। তারা পিছনে ফেলে রেখে গেছে বিরাট বিরাট মানুষের পাথুরে মূর্তি যাদের দেখে পিতকারিন, মারকুয়েসাস ও ইস্টার দ্বীপের মূর্তির কথা সবার আগে মনে পড়ে যায় আর স্মরণে আসে তাহিতি ও স্থামোয়ার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বিরাট পিরামিডের কথাও। তারা পাথুরে কুঠারের সাহায্যে পর্বতের গা থেকে রেল গাড়ির মতো বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড কেটে বের করেছে, হাতির চেয়েও ওজনে ভারী। সেই সব পাথরখণ্ড মাইলের পর মাইল দূর থেকে বয়ে এনেছে গ্রাম-

গঞ্জের বসতির আশেপাশে, একটার উপর আর একটাকে স্থাপন করে বৃহদাকার ফটক, দেয়াল, ভবনশ্রেণী তৈরি করেছে—যেমনটি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপেও দেখতে পাওয়া যায়।

স্পেনীয়রা যখন পেরুতে প্রথম পদার্পণ করে, তখন এই পাহাড়ী অঞ্চলে ইনকা ইণ্ডিয়ানদের বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। স্পেনীয়রাও দেখেছে সে-সাম্রাজ্য। ইনকাদের কাছ থেকেই স্পেনীয়রা শুনেছে—মঠে-প্রান্তরে যে বিরাট বিরাট স্তম্ভ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে তাদের নির্মাতা হল একদল শ্বেতকায় দেবতার জাতি। ইনকারা এখানে সাম্রাজ্য বিস্তারের আগে তারাই এখানে রাজত্ব করত। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় এই অদৃশ্য স্থপতিরা নাকি খুব জ্ঞানী, গুণী, শান্তিপ্রিয় শিক্ষাদাতা ছিল। সৃষ্টির প্রদোষকালে তারা এসেছিল উত্তর থেকে—ইনকাদের আদি পুরুষদের তারাই নাকি শিখিয়েছিল স্থাপত্য বিদ্যা, কৃষিকর্ম, সেইসঙ্গে আদবকায়দা, শিষ্ট আচার-আচরণ। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তাদের অনেক পার্থক্য ছিল, তারা ছিল শ্বেতকায়, দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত—এমন কি ইনকাদের থেকেও অনেক লম্বা। যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই একদিন তারা পেরু ত্যাগ করে চলে গেছে। ইতিমধ্যে ইনকারা হাতে তুলে নিয়েছে দেশের শাসনদণ্ড। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগ থেকে এই শ্বেতকায় গুরুকুল চিরদিনের মতো অদৃশ্য হয়ে যায়—পালিয়ে যায় প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে পশ্চিম দিগন্তের দিকে।

পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা যখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথম পদার্পণ করল, তারা সবিস্ময়ে দেখল, দ্বীপবাসীদের অনেকেরই গায়ের রঙ সাদা, মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত। বহু দ্বীপের অনেক জায়গায় এমন এমন পরিবার আছে যাদের গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, মাথার চুল লাল থেকে ঈষৎ স্বর্ণাভ, নীলেগোলা ধূসর চোখ, প্রায় সেমেটিক বলা চলে, নাক বঁড়শির মতো সুবঙ্কিম। ওদের সঙ্গে তুলনা করলে সত্যিকার পলিনেশীয়দের গায়ের চামড়া সোনালী বাদামী, মাথার চুল কাকের গায়ের রঙের মতো কালো—নাক চ্যাপটা ও ফোলাফোলা। লাল চুলওয়ালারা ইউরুকেহু। তারা সরাসরি এসেছে এই দ্বীপের প্রথম দলপতিদের গোষ্ঠী থেকে—তারা হল ট্যাঙ্গারোয়া কেন ও টিকি। তারা শ্বেতকায়—দেববংশ-ভূত।

রহস্যময় এক শ্বেতজাতি বর্তমান দ্বীপবাসীদের আদিজনক—একথাই পলিনেশিয়ার সর্বত্র প্রচলিত এবং তারা তাই বিশ্বাসও করে। ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে রগেভীন যখন ইস্টার দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তিনি উপকূলভাগে 'শ্বেতকায় মানুষ' দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। দ্বীপবাসীদের সবারই ধারণা তাদের পূর্বপুরুষরা টিকি ও হোতু মাতুয়ার বংশধর। তারা জলযানে চেপে সূর্য-তেজদৃপ্ত পূব দেশ থেকে এসেছে এই দ্বীপপুঞ্জে।

অনুসন্ধান চালাতে চালাতে আমি পেরুতে কৃষ্টি পুরাণশাস্ত্র ও ভাষার এমন সব

বিস্ময়কর নিদর্শন পেলাম যা আমাকে মনোনিবেশ সহকারে আরও গভীরে অনুসন্ধান চালাতে প্রণোদিত করতে লাগল। কোথায় পলিনেশীয় উপজাতীয় দেবতা টিকির জন্মস্থান, যেমন করেই হোক তা খুঁজে বের করতেই হবে।

যা আশা করেছিলাম পেয়েও গেলাম। আমি বসে বসে ইনকাদের সূর্য-দেবতা ভিরাকোচা সম্বন্ধে উপকথা পড়ছিলাম। তিনিই পেরুর পৌরাণিক শ্বেতকায় মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রধান বলে কথিত। গল্পে আছে :

ভিরাকোচা একটা ইনকা নাম—কাজেই বেশ সাম্প্রতিক কালের নাম। প্রাচীন-কালে পেরুতে সূর্যদেবতা ভিবাকোচার যে-নামটা বেশি প্রচলিত ছিল, তা হল কন-টিকি বা ইল্লা-টিকি—যার অর্থ সূর্য-টিকি বা অগ্নি-টিকি। কন-টিকি একজন সর্বোচ্চ পুরোহিত—ইনকাদের উপকথায় বর্ণিত 'শ্বেত মানুষ'দের সূর্য-দেবতা। টিটিকাকা হ্রদের তীরাঞ্চলে এদেরই বিপুল ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গল্পে আছে—এই রহস্যময় শ্বেতকায় শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষেরা কোকুইম্বো উপত্যকা থেকে আগত কারি নামক এক দলনেতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। টিটিকাকা হ্রদের অন্তর্গত একটি দ্বীপের যুদ্ধে শ্বেতকায় মানুষেরা সবংশে নিহত হয়। কিন্তু কন-টিকি কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনুচর নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাঁরা সদলবলে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে এসে পৌছান—সেখান থেকে সমুদ্র অতিক্রম করে পশ্চিম দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যান…।

এবার আর আমার সংশয়ের কোন অবকাশ রইল না। শ্বেতকায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ—সূর্য-দেবতা টিকি। ইনকাদের পূর্বপুরুষরা যাঁকে পেরু থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে বিতাড়িত করেছিল, তিনিই শ্বেতকায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, সূর্য-দেবতা টিকি। এঁকেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের পূবের দ্বীপগুলোর বাসিন্দারা তাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিনন্দিত ও পূজা করে আসছে। টিটিকাকা হ্রদের আশেপাশের স্থানের সহিত জড়িত পেরুর সূর্য-পুত্র টিকির জীবনের খুঁটিনাটি যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, তাদেরই রেশ আবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের ঐতিহাসিক কাহিনী ও গল্প-উপকথার মধ্যে প্রতিধ্বনিত।

কিন্তু আমি যতদূর সম্ভব খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, কন-টিকির শান্তিপ্রিয় বংশধররা এই অঞ্চলের সর্বত্র চিরদিন তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। ভাইকিং জাহাজের মতো বড় বড় সমুদ্রবিহারী যুদ্ধ-ক্যানু থেকে—দুটো দুটো করে ক্যানু একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা—নতুন পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভারতীয়রা হাওয়াইয়ে এসে অবতরণ করেছে—ছড়িয়ে পড়েছে সুদূর দক্ষিণের দ্বীপে দ্বীপে। কন-টিকির জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে—যার ফলে পত্তন হয়েছে এক নতুন জাতির। এই দ্বীপময় রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন সভ্যতার। এরাই প্রস্তর যুগের দ্বিতীয় দল যারা পলিনেশিয়ায় এসেছে। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত না, মৃৎশিল্পের কৌশল অজ্ঞাত ছিল তাঁদের কাছে—তারা চাকা চালানো, তাঁত বোনা, কৃষিকার্য—

কিছুই জানত না। সে প্রায় খ্রীস্টের মৃত্যুর পর এগারশ বছর সময়কার কথা।

আমি ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ভারতীয়দের এলাকার মধ্যে প্রাচীন পলিনেশীয় রীতি-পদ্ধতিতে তৈরি পাথুরে ভাস্কর্যের খোঁজে খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে লাগলাম। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে জার্মানরা ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে নরওয়ে আক্রমণ করে বসল।

* * * *

একদিন বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফিরে এল শান্তি। এদিকে আমার সিদ্ধান্ত ও মতবাদের অনুকূলে গবেষণার কাজও সম্পূর্ণ। এবার আমেরিকায় যাব—সেখানে পেশ করব আমার বক্তব্য।

॥ ২ ॥

এই ভাবে শুরু আমার অভিযানের গৌরচন্দ্রিকা। সেদিন দক্ষিণসমুদ্রের একটি দ্বীপে আগুনের ধারে বসে এক বুড়ো আমায় গল্প বলেছিল—তাদের জাতির অনেক অতীত গল্পগাথা। এই ঘটনার অনেক বছর বাদে আমিও এক বুড়োর সঙ্গে বসে ছিলাম। বনেবাদাড়ে নয়—নিউইয়র্কের এক বিরাট মিউজিয়মের উপর তলার এক অন্ধকার অফিসঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

আমাদের চারধারে সারিবদ্ধ আলমারিতে কত সাজানো মাটির পাত্র রয়েছে—অতীতের টুকরো টুকরো স্মৃতিচিহ্ন যা প্রাচীন যুগের রহস্যঘেরা কুয়াশাচ্ছন্ন পথের দিকে মনকে টেনে নিয়ে যায়। দেয়ালে সারি সারি বই। কতকগুলো বইয়ের একজন মাত্র লেখক, কিন্তু দশজন পাঠকও সে-বইগুলো পড়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যে-বৃদ্ধ সবগুলো বই পড়েছেন এবং যিনি কোন কোন বইয়ের লেখকও বটে, তিনিই বসে আছেন আমার সামনে একটি চেয়ারে। তিনি অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর চেয়ারের হাতল এমন ভাবে চেপে ধরলেন যেন আমি তাঁর পা মাড়িয়ে দিয়েছি আর আমার দিকে এমন চোখ করে তাকালেন যেন আমি তাঁর নির্জনতার খেলায় বাধা সৃষ্টি করেছি।

'না,' বললেন তিনি, 'কখনই তা হতে পারে না।'

আগামী বড়দিন গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি পড়বে, একথা সান্তাক্লসকে কেউ যদি বলত জোর দিয়ে, তা হলে সান্তাক্লস যেমন কটমটিয়ে তাকাত তার দিকে, তিনিও তেমনি তীব্র দৃষ্টি হেনে তাকালেন আমার দিকে। বললেন তিনি, 'তোমার ভুল হয়েছে। নিশ্চিত ভুল।' এই বলে তিনি এমন রূঢ় রাগত ভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন যেন আমার মন থেকে ভুলের ভুতটাকে তাড়ানোই তাঁর উদ্দেশ্য।

'কিন্তু আপনি এখনও তো আমার যুক্তি পড়েননি,' আমি টেবিলের উপর রাখা পাণ্ডুলিপির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম আশা নিয়ে।

'যুক্তি ?' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'মানবজাতিবিদ্যা-সমস্যাকে তুমি গোয়েন্দা-রহস্য সমাধানের সমপর্যায়ে ফেলতে চাও নাকি ?'

'কেন নয় ?' বললাম আমি, 'আমার প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

'বিজ্ঞানের কাজ সহজসরল অনুসন্ধান,' বললেন তিনি, 'ইতি-উতি প্রমাণ করা নয়।'

তিনি সাবধানে না-খোলা পাণ্ডুলিপিটি একপাশে সরিয়ে টেবিলের উপর গা রেখে ঝুঁকে বসলেন।

'দক্ষিণ আমেরিকা নানা অদ্ভুত প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি—একথা খুবই সত্যি। ইনকারা ক্ষমতায় এলে তারা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল জানিও না। তবে একথা জোর দিয়ে বলা যায়—দক্ষিণ আমেরিকার কোন লোক প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে দক্ষিণসমুদ্রের কোন দ্বীপে যায়নি।'

তিনি আমার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে বললেন, 'কেন, তা জান কি ? উত্তর তো খুবই সহজ। সেখানে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না তাদের। সাগর পার হবার কোন জল-যান অর্থাৎ নৌকো ছিল না তাদের।'

'ভেলা ছিল তো!' একটু ইতস্তত করে দ্বিধার সঙ্গে বললাম আমি, 'আপনি তো বালসা-কাঠের ভেলার কথা জানেন!'

একথা শুনে বুড়ো একটু মুচকি হাসলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'বালসা কাঠের ভেলায় চেপে তুমি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে যাবার চেষ্টা করে দেখতে পার।'

আমার মুখে এর কোন প্রত্যুত্তর যোগাল না। এদিকে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আমার কাঁধে সস্নেহে চাপড় মেরে বিদায় জানালেন আমাকে। বললেন, যদি কোন সাহায্যের দরকার হয় বিনা দ্বিধায় তাঁর কাছে আসতে পারি। আর ভবিষ্যতে আমি যেন হয় পলিনেশিয়া নয়ত আমেরিকা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হতে চেষ্টা করি—দুটোকে এক করে গুলিয়ে না ফেলি। নৃতত্ত্বের দিক থেকে দুটো জায়গাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এলাকা। তিনি টেবিলের কাছে আবার ফিরে এলেন, পাণ্ডুলিপিটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন. 'এটার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।' আমি পাণ্ডুলিপির শিরোনামার দিকে তাকালাম, 'পলিনেশিয়া ও আমেরিকা : প্রাগৈতিহাসিক সম্পর্কের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।' আমি পাণ্ডুলিপিটা বগলদাবা করে খটখট শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এসে পথের জনারণ্যে মিশে গেলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় গ্রীনউইচ গ্রামের উপান্তে লোকালয় থেকে দূরে একটেরে একটা পুরানো ফ্ল্যাটের দরজায় এসে ঘা মারলাম।

যখনই কোন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ি, তখন ছোটখাট সমস্যা-সমাধানের জন্য এখানে আসা পছন্দ করি।

একজন রোগাপাতলা ছোটখাট মানুষ এসে দরজা খুলে দিল। তার নাকটা বেশ লম্বা। দরজা সম্পূর্ণ হাট করে খুলে দেওয়ার আগে একটু ফাঁক করে দেখে নিল। তারপর মুখটা হাসিতে ভরিয়ে আমাকে ভিতরে টেনে আনল। সোজা একেবারে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে টেবিলে কাঁটা চামচ প্লেট সাজানোর কাজে লাগিয়ে দিল আমায়। উনুনে গ্যাসের আগুনে একটা কিছু ফুটছিল—তার পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিল। নাকে বেশ গন্ধ পাচ্ছিলাম। তবে পদার্থটা যে কি বলতে পারব না।

'আমি খুশি হলাম তোমায় দেখে,' বলল সে, 'কি দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত?'

'একেবারে যাচ্ছেতাই,' বললাম আমি, 'কেউ পাণ্ডুলিপিটা একবার ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখছে না।'

সে প্লেটগুলো খাবারে ভর্তি করে দিল। আমরা খেতে শুরু করলাম।

বলল সে, 'ব্যাপারটা কি জান—যাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তারা সবাই এটা একটা খাপ্পায় চিন্তাধারা বলে ধরে নিয়েছে। তুমি তো জান, এখানে আমেরিকায় লোকদের নানা উদ্ভট চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।'

'কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, তোমার সমস্যা মোকাবিলা করার দিক। যাদের কাছে গিয়েছিলে তারা সবাই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তারা কেউ বিশ্বাসই করে না, কোন একটি বিষয়ের উদ্ভিদবিদ্যা থেকে শুরু করে নৃতত্ত্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানের সকল এলাকাতেই গতিবিধি থাকতে পারে। তারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয়েই মাত্র সীমাবদ্ধ থাকতে চায় যাতে অনুসন্ধানের ব্যাপারে গভীর মন সংযোগ করতে পারে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার দাবিই হল— যে যার নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান চালাবে। গবেষণা করতে গিয়ে নানা রকম প্রশ্নের থাবা উদ্যত হয়ে উঠলেই তার উত্তর খুঁজতে যাওয়া আদৌ স্বাভাবিক প্রথা নয়।'

সে উঠে গিয়ে একটা বেশ ভারী পাণ্ডুলিপি বের করে নিয়ে এল। বলল, 'এই দেখো, চীনে চাষীদের এমব্রয়ডারিতে পাখিদের বিচিত্র নকশা নিয়ে আমার সাম্প্রতিক রচনা। সাতটি বছর লেগেছে এ কাজ শেষ করতে। লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হতে চলেছে। আজকাল লোকেরা বিশেষ একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পছন্দ করে।'

কার্ল যা বলেছে, তাই ঠিক। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্যার সবদিকে আলোকপাত না করা আমার কাছে মনে হল, এক রঙ ব্যবহার করে একটি ধাঁধার সমাধান করা।

আমরা খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার করলাম। ডিশ ধোয়া মোছা করতেও কার্লকে সাহায্য করলাম আমি।

'শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও নতুন কিছু পাওনি?'

'না।'

'মিউজিয়মে তোমার পুরানো বন্ধু কি বললেন আজকে?'

'তিনি তো এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতেই উৎসুক নন,' বিড়বিড় করে বললাম আমি, 'যতদিন ইণ্ডিয়ানদের ভেলা ছাড়া অন্য কোন জলযানের ব্যবহারের তথ্য না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন তাদের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

হঠাৎ ছোট্ট মানুষটি হাতের প্লেটটা বেশ জোরে জোরে কাপড় দিয়ে মুছতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মুখের আগড় খুলল, 'সত্যি কথা বলতে কি আমার কাছেও তোমার সিদ্ধান্তের এটা বাস্তব প্রতিবন্ধকতা মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু ভুল বুঝো না আমাকে,' সঙ্গে সঙ্গেই ঝটিতি বলল সে, 'আবার একদিক থেকে বলতে গেলে তোমার যুক্তি আদৌ সুগ্রাহ্য নয়। পাখির নকশা নিয়ে আমার কাজ কিন্তু তোমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।'

'কার্ল?' বললাম আমি 'ইণ্ডিয়ানরা ভেলায় চেপেই প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল, আমার এ সিদ্ধান্তে আমি অটল। আমিও ঐ ধরনের ভেলা তৈরি করে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেব। আমার সিদ্ধান্তে যে ভুলচুক নেই, এটা প্রমাণ করবই।'

'তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে?'

আর কিছু বলার মতো কোন কথা যোগাল না কার্লের মুখে—অপলক চোখে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। অপেক্ষা করছিল আমি কখন হাসব অর্থাৎ আমি বুঝি একটু রসিকতা করছি তার সঙ্গে।

কিন্তু আমার মুখে হাসির চিহ্নও ফুটে উঠল না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি—কেউই আমার এ মতবাদ বাস্তবসম্মত মনে করবে না, যদি না আমি পেরু ও পলিনেশিয়ার মাঝখানের অনন্ত সমুদ্রের ব্যবধান প্রাগৈতিহাসিক ভেলার সাহায্যে অতিক্রম করার চেষ্টা করি।

কার্ল সংশয়াকুল চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু বলল, 'চলো, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।' আমরা বের হয়ে পড়লাম।

* * * *

এই সপ্তাহেই আমার বাড়ি ভাড়ার পয়সা মিটিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যে নরওয়ের ব্যাঙ্ক থেকে এক চিঠি এসে হাজির। আর আমি ব্যাঙ্ক থেকে ডলার ধার পাব না, সাফ জানিয়ে দিয়েছে ব্যাঙ্ক। আমি ট্রাঙ্কটা হাতে তুলে নিয়ে ব্রুকলিন যাবার সাব-ওয়ের দিকে হাঁটা দিলাম। এখানে নরওয়ের নাবিকদের থাকবার

আবাসনে জায়গা পেলাম এই আবাসনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালোই—স্বাস্থ্য-প্রদ। যা খয়রাতি করতে হল আমার পুঁজির পক্ষে তা অনুকূল। একতলা না দোতলার উপর ছোট্ট একখানা ঘর পেলাম, কিন্তু নিচের তলায় বিরাট হলঘরে নাবিকদের সঙ্গে একত্র বসে খানা খেতে হবে।

কত নাবিক আসছে—যাচ্ছে। তাদের কত বিচিত্র রূপ—কেউ কেউ আকারে বিরাট, কেউ কেউ কিছুটা মিতাচারী। কিন্তু একটা বিষয়ে এদের মিল দেখা যায়—যখন তারা সমুদ্র সম্বন্ধে কথা বলে, তাদের কথাবার্তা একান্ত বাস্তবসম্মত। কোথাও কোন কল্পনার লেশ মাত্র নেই। ওদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, সমুদ্রের গভীরতা বা তটদেশ থেকে দূরত্বের উপর তরঙ্গ-বিক্ষোভ নির্ভর করে না। বরং মাঝ দরিয়ার চেয়ে উপকূলের কাছেই সমুদ্রের তাণ্ডবের হিংস্রতা বেশি প্রকাশমান। অগভীর জলমগ্ন চড়া, তটবর্তী প্রতিসরণ-তরঙ্গ বা সমুদ্র-স্রোত—সবকিছুই সমুদ্র-উপকূলেই অপেক্ষাকৃত বেশি ক্রিয়াশীল, মাঝদরিয়ার চেয়ে এখানেই সমুদ্র-বিক্ষোভ অধিকতর উগ্র মূর্তিতে ফেটে পড়ে। যে-জাহাজ তটবর্তী এলাকায় ভেসে থাকতে পারে মাঝদরিয়ায় তার ভয়ের কোনই কারণ নেই। আরও জানলাম, সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভের সময় বড় বড় জাহাজের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ ঢেউয়ের জলের মধ্যে ডুবে যায়—টন টন জল জাহাজের পাটাতনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ইস্পাতের নলটল বাঁকিয়ে দুমড়িয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। অথচ সেই একই সমুদ্রে ছোট নৌকো দুটো তরঙ্গের মাঝখানে সিন্ধু শকুনের মতো পরম নিশ্চিন্তে দোল খেতে খেতে ঠিক ভেসে চলে। নাবিকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি—সমুদ্র যেখানে তাদের জাহাজকে লোপাট করে দিয়েছে, সেখান দিয়ে নৌকো করে অনায়াসে তারা পাড়ি দিয়েছে নিরাপদে।

তবে ভেলা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অতি সীমিত—নেই বললেই চলে। ভেলা তো আর জাহাজ নয়। না আছে তার জাহাজের মতো তলা বা প্রাচীরের মতো খাড়া উঁচু ধার বা দেয়াল। ভেলা হল একটা ভাসমান আশ্রয়—জলে বিপদে পড়লে যার সাহায্যে মানুষ আত্মরক্ষা করে কোনমতে। যতক্ষণ না কোন নৌকো বা ঐ জাতীয় কোন জলযান এসে উদ্ধার করছে তাকে। একজনের মাঝদরিয়ায় ভেলার উপকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে—জার্মান ডুবোজাহাজ তাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিলে সে একটা ভেলায় চেপে তিন সপ্তাহ সমুদ্রে ভেসে ছিল। তবে সে বলল, 'ভেলাকে চালনা করা দুরূহ কাজ। বাতাসের মর্জির উপর একান্ত নির্ভর করে চলতে হবে, কখন পার্শ্ব অভিমুখে, কখনও পিছু হটে, কখনও বা ঘুরতে ঘুরতে অর্থাৎ যেমন চালাবে বাতাস।'

প্রথমে যে-অভিযাত্রী প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছেছিল তার লিখিত বিবরণ ঘাঁটতে লাগলাম। ইণ্ডিয়ানদের বালসা কাঠের বড় বড় ভেলার অজস্র ছবি ও বর্ণনা আছে তাতে। চৌকো পাল, মাঝখানে পাটাতন,

পিছনের দিকে বেশ লম্বা দাঁড়ের ছবি রয়েছে। কাজেই ভেলাকে ইচ্ছামতো যে-কোন দিকে পরিচালনা করা যাবে।

নাবিকদের আবাসনে কেটে গেল কয়েক সপ্তাহ। এখনও পর্যন্ত সিকাগো থেকে কোন খবর নেই—না অন্য কোন শহর থেকে, যেখানে আমি আমার মতবাদের নকল পাঠিয়েছি। কেউ তা চোখ বুলিয়েই দেখেনি। এক শনিবারে ওয়ালটার স্ট্রিটে জাহাজে তেল সাবান বাতিটাতি সরবরাহ করার দোকানে সোজাসুজি ঢুকে পড়লাম। সেখানে আমি প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজ চলাচলের গতিপথের নকশা-আঁকা একখানা মানচিত্র কিনে ফেললাম। দোকানী আমাকে 'ক্যাপ্টেন' বলে সসম্ভ্রমে আপ্যায়ন করল। আমি মানচিত্রখানা গুটিয়ে বগলদাবা করে শহরতলীর ট্রেনে চেপে ওসিনইংগের দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে এক তরুণ নরওয়ে-দম্পতির গৃহে সপ্তাহশেষের একটি দিন নিয়মিত কাটাতাম। গাঁয়ের ওদের বাড়িটি ভারি চমৎকার। গৃহের কর্তা একসময় জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল—এখন অফিসে কাজ করে। নিউইয়র্কের ফ্রেড অলসেন জাহাজ কম্পানীর অফিস-ম্যানেজার।

একটা ঠাণ্ডা সাঁতার কাটার পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। ভুলেই গেলাম শহরের কথা। উঠোনে গরম রোদে বসে ককটেল খাবার ব্যবস্থা করল আস্বগর্গ। আমি সঙ্গে-আনা মানচিত্রটা ঘাসের উপর বিছিয়ে উইল হেলমকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করার লোভ আর সম্বরণ করতে পারলাম না—'আচ্ছা বলো তো বাপু, ভেলায় চেপে পেরু থেকে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে প্রাণে বেঁচে যাওয়া সম্ভব, একথা বিশ্বাস কর কিনা?'

মানচিত্রের দিকে নয়, আমার দিকে তাকাল সে অবাক চোখে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইতিবাচক উত্তর দিল। এ উত্তর শুনে নিজেকে খুব হালকা মনে হল—যেন শার্টের ভিতরে রাখা একটা হাওয়া ভরতি বেলুনের হাওয়া বেরিয়ে যেতে হালকা বোধ করতে লাগলাম। উইল হেলমের কাছে নৌবিহার ও জাহাজ চালানো পেশাও বটে—আবার শখও বটে। আমার পরিকল্পনায় মুহূর্তে সে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘোষণা করল, এই আইডিয়াটা একটা পাগলের পাগলামির নামান্তর।

'কিন্তু এইমাত্র তুমিই তো বললে এটা সম্ভবপর,' আমি বাধা দিয়ে বললাম ওকে।

'ঠিকই বলেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনাও পুরোদস্তুর। তুমি নিজে তো কখনও বালসা-ভেলায় চাপোনি। হঠাৎ তোমার মাথায় কি করে খেলে গেল তুমি প্রশান্ত মহাসাগরে ভেলায় চেপে চলেছ। সম্ভবত এরকম একটা ঘটনা ঘটতেও পারে, আবার নাও ঘটতে পারে। পেরুর বুড়ো ইণ্ডিয়ানদের ভেলা তৈরি করার অভিজ্ঞতা বহু শতাব্দীর। হয়ত প্রতি দশটার মধ্যে একটা গন্তব্যে

পৌঁছেচে—বাকিরা সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে। তুমি বলছ, ইনকারা বিরাট বিরাট বালসা-ভেলায় সমুদ্র-বিহার করেছে। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, কাছের কোন ভেলা তাদের উদ্ধার করেছে। কিন্তু মাঝদরিয়ায় দুর্ঘটনা ঘটলে কে তোমায় উদ্ধার করবে? আপদকালীন সতর্কতা হিসেবে সঙ্গে রেডিও নিতে পার, কিন্তু তা হলেও হাজার হাজার মাইল দূরে সমুদ্র বক্ষে উত্তাল ঢেউয়ের মাঝখানে একটা ভেলাকে চিহ্নিত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। ঝড়ের সময় তরঙ্গের ঝাপটায় ভেলা থেকে ভেসে যেতে পার তুমি—সাহায্যকারীর করায়ত্ত হবার আগে অনেকবার জলে নাকানিচুবানি খেতে হবে তোমায়। তার বদলে এখানে কিছুদিন শান্তিতে কাটাও—ততদিন তোমার পাণ্ডুলিপি পড়ুক অন্যরা। লিখে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করো। তা যদি না পার, সবই পণ্ডশ্রম।'

'আমি আর এখানে অপেক্ষা করতে পারছি না। শীগগিরই আমার কাছে আর একটা পয়সাও অবশিষ্ট থাকবে না।'

'সেক্ষেত্রে তুমি আমার কাছে এসে থাকতে পার। তাছাড়া কপর্দকশূন্য নিঃসম্বল অবস্থায় তুমি কি ভাবে এত বড় একটা দুঃসাহসিক অভিযানে ভেসে পড়ার কথা ভাবতে পার?'

'পাণ্ডুলিপি পাঠের দ্বারা নয়—অভিযানের দ্বারাই লোককে উৎসাহিত করা সহজতর।'

'কিন্তু তাতে কি লাভ হবে তোমার?'

'আমার মতবাদের বিরুদ্ধে জোরালতম প্রতিকূলতা চূর্ণ করা। বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কিছুটা মনোযোগ অর্পণ করবে, সেকথা না হয় ছেড়েই দিলাম।'

'ধর, সবকিছু যদি বিলকুল ভণ্ডুল হয়ে যায়?'

'সেক্ষেত্রে কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারলাম না—ব্যর্থ হলাম।'

'অর্থাৎ তোমার মতবাদের ভরাডুবি। তাই নয় কি?'

'হয়ত তাই। তাহলেও তোমার কথা মতো প্রতি দশজনের মধ্যে একজনের অভিষ্ট সিদ্ধ হতে পারে।'

ছোটরা ক্রোকেট খেলতে বাইরে এসে জুটেছে। সেদিনের মতো আমাদের আলোচনার এইখানেই ইতি টেনে দিলাম।

পরের সপ্তাহে ফিরে এলাম আমি মানচিত্রটা বগলদাবা করে। যখন চলে আসি, দেখলাম মানচিত্রে পেরুর উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তুয়ামতু দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পেন্সিলের একটা লম্বা দাগ টানা রয়েছে। মতলবটা মাথা থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলব, সে-আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছে আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে ভেলার সম্ভাব্য গতিপথ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম।

'সাতানব্বুই দিন লাগবে,' বলল উইলহেলম, 'কিন্তু মনে রেখো বন্ধু, এটা একটা আনুমানিক হিসেব, আদর্শ আবহাওয়া হতে হবে, সবসময় সুন্দর ফুরফুরে বাতাস বইবে, কোন ঝুটঝামেলা ঘটবে না—ভেলা তোমার ধারণামতো গতিতে জল কেটে চলতে পারবে। এই অভিযানের জন্য চারটি মাস লাগবে—এর চেয়েও বেশি দিন লাগতে পারে ধরে নিয়ে সবরকম ব্যবস্থা করে অগ্রসর হতে হবে।'

'ঠিক আছে,' আশাবাদী কণ্ঠে বললাম আমি, 'অন্তত চারটে মাস সময় তো দাও। তবে ঐ সাতানব্বুই দিনের মধ্যেই অভিযান শেষ করে ফেলতে হবে।'

নাবিক-আবাসনের ছোট্ট ঘরটা ভারি আরামদায়ক ঠেকতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই সেখানে ফিরে এসেছি আমি। নকশাটা হাতে নিয়ে বিছনার ধারে বসে আছি। বিছনা ও আলমারি বাদ দিয়ে যে জায়গাটা পেলাম, মেপে ফেললাম। ভেলাটা এর চেয়ে বড় হতে হবে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শহর ছাড়িয়ে দূরের নক্ষত্রখচিত আকাশের যতটুকু দেখা যায়, দেখতে চেষ্টা করলাম—উঁচু দেয়ালঘেরা চত্বরের মাথার উপরের আকাশটুকু। ভেলার উপরে ছোট্ট একখানা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারলে মাথার উপরের সীমাহীন আকাশ ও অগণিত নক্ষত্রদের দেখতে পাব।

পশ্চিমদিকে সেন্ট্রাল পার্কের কাছাকাছি বাহাত্তর নম্বর রাস্তায় নিউইয়র্কের সব থেকে নিরিবিলি একটা ক্লাব আছে। ক্লাবের বাড়িটায় খুব ঝকঝকে পেতলের ছোট্ট একটা প্লেটের গায়ে লেখা আছে—অভিযাত্রীদের ক্লাব। পথচারীরা দেখলেই বুঝতে পারবে—ভিতরে যা কাজকর্ম হয় তা বিশেষ ধরনের—গতানুগতিক কোন ব্যাপারই নয়। ভিতরে ঢুকলে যেন প্যারাচুটে করে এক অভিনব জগতে নামা যায়—সে-জগত স্কাইস্ক্রেপার আর লক্ষ লক্ষ মটোর গাড়ি অধ্যুষিত জনবহুল নিউইয়র্ক থেকে সম্পূর্ণ সতন্ত্র জগত। ক্লাবের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে এমনি এক জগতে এসে পড়বে। দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র এমন এক পরিবেশে এসে পড়বে—যেখানে কোথাও সিংহ শিকারের দৃশ্য, কোথায় পর্বত অভিযান চলছে, কোথাও বা মেরু প্রান্তরের সীমাহীন বরফের রাজ্য। হিপোপটেমাস, হরিণ, শিকারোপযোগী রাইফেল, হাতির দাঁত, যুদ্ধ-দামামা বর্শা, ভারতীয় কার্পেট, নানামূর্তি, জাহাজের মডেল, পতাকা, ফটোগ্রাফ, মানচিত্র। ক্লাবের সদস্যগণ যখন মাঝখানে গোল হয়ে বসে খানাপিনা করে, আলোচনা করে বা অজানা দূর দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তৃতা শোনে, তাদের চারপাশে ঘিরে থাকে এই বিচিত্র পরিবেশ। মারকুয়েসাস দ্বীপে অভিযান চালানোর পর আমি এই ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। শহরে যখন থাকি আমি নবীন সদস্য হিসেবে এ সংঘের কোন বক্তৃতায় কদাচিৎ অনুপস্থিত হই। নভেম্বরের এক বর্ষাস্নাত সন্ধ্যায় ক্লাবে ঢুকে দেখি সেখানে এক অস্বাভাবিক উত্তেজিত পরিবেশ। মাঝখানে রয়েছে একটা ফেলিাস্লো রবারের ভেলা, নৌকোর উপযোগী খাবারদাবার ও সাজসরঞ্জাম,

-রবারের পোশাকআসাক, নিরাপত্তারক্ষক কামিজ, মেরু অঞ্চলে অভিযানের সাজ-সরঞ্জাম, ঢাকা-দেওয়া দেয়াল টেবিল, জল পরিস্রুত করার বেলুন এবং অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্তর। সদ্য নির্বাচিত সদস্য কর্নেল হাসকিন একটা বক্তৃতা দেবেন।' তিনি এয়ার মেটিরিয়াল কম্যাণ্ডের অধীন সাজসরঞ্জাম ল্যাবরাটরির অধিকর্তা। তিনি তাঁর নতুন সামরিক আবিষ্কারের ব্যবহারিক কার্যকারিতা প্রদর্শনও করবেন। তাঁর মতে ভবিষ্যতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অভিযানে এসব বিশেষ কাজে লাগবে।

ভাষনের পর তুমুল আলোচনার ও বাকবিতণ্ডার সূত্রপাত হল। সুপরিচিত ওলন্দাজ অভিযাত্রিক পিটার ফ্রেউচেন তাঁর বিরাট দাড়ি দুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে। লোকটি বেশ লম্বা, গাবদা-গোবদা চেহারা। এই নতুন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তাঁর কোন আস্থা নেই। গ্রীনল্যাণ্ড অভিযানের সময় এস্কিমোদের সুপ্রাচীন কেয়্যাক আর ইগলু ব্যবহার না করে রবারের নৌকো আর থলের তাঁবু ব্যবহার করতে গিয়ে মরতে মরতে কোনমতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। প্রথম তুষার-ঝঞ্ঝায় প্রায় জমে যেতে বসেছিলেন। কারণ তাঁবুর ধাতুর তৈরি বাঁধনগুলো জমে নিরেট হয়ে গিয়েছিল—যার ফলে তিনি তো তাঁবুর ভিতরেই ঢুকতে পারেননি। মাছ ধরতে গেলে বঁড়শি বায়ুভর্তি রবারের নৌকোর গায়ে বিঁধে যায়—রবার ফুটো হয়ে যাওয়ায় বাতাস বেরিয়ে নৌকো যায় ডুবে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো তাঁকে সুদ্ধ নিয়ে। তখন তিনি এক এস্কিমোর সাহায্যে কেয়্যাকে চড়ে তীরে পৌছোন। তাঁকে উদ্ধার করতেই কেয়্যাকটা পাঠানো হয়েছিল। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান নিয়ে এস্কিমোরা ঐদেশে থেকে বাঁচার উপযোগী যে-সব জিনিস তৈরি করেছে, আধুনিক কালের আবিষ্কর্তারা ল্যাবরাটরিতে বসে সেখানকার উপযোগী ও কার্যকরী কোন কিছুই চিন্তা করতে পারবে না। তাদের তৈরি সাজসরঞ্জাম বাস্তবক্ষেত্রে কোনই কাজে আসবে না।

আলোচনার হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটল কর্ণেলের বিস্ময়কর প্রস্তাবে। ক্লাবের সক্রিয় সদস্যদের যে-কেউ আবার যখন তুষার রাজ্যে অভিযানে যাবেন—তিনি তাঁর নতুন আবিষ্কৃত সরঞ্জামের যে-কোন একটি যা আজকে এখানে প্রদর্শত হল, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন—তবে একটি মাত্র শর্তে। শর্ত হল, ফিরে এসে ল্যাবরাটরিতে খবর দিতে হবে তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে।

সেদিন সবার শেষে আমি ক্লাব ত্যাগ করি। এই নতুন প্রতিটি সাজসরঞ্জাম আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। হঠাৎ সেগুলো আমার হাতের নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল আর চাওয়ামাত্রই সেগুলো পেতে পারি আমি। ঠিক এই রকমই চাই-ছিলাম আমি। যদি আমাদের ভেলা মাঝপথে ভেঙ্গে যায় আর কাছে অন্যকোন

সাহায্যকারী ভেলা না থাকে, তখন এই ধরনের সাজসরঞ্জামের সহায়তায় আমরা প্রাণ বাঁচাতে পারব—যদি-একান্ত প্রয়োজন হয়।

পরের দিন সকালে নাবিক-আবাসনে প্রাতরাশের টেবিলে বসে আছি, ঐসব যন্ত্রপাতির চিন্তা আমার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে। এমন সময় সুবেশ পরিহিত মল্লবীরের মতো চেহারা এক যুবক খাবারের ট্রে হাতে আমার টেবিলেই এসে বসল। আলাপচারী হলাম। কথায় কথায় প্রকাশ পেল, সে কোন নাবিকটাবিক নয়—বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ইনজিনিয়র—ট্রণ্ডহেইম থেকে আমেরিকায় এসেছে মেশিনের যন্ত্রাংশ কিনতে আর হিমায়ন করার কলাকৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। এখান থেকে খুব একটা দূরে থাকে না। নাবিক-আবাসনে নরওয়ের রান্না খাবার ভালো পাওয়া যায় বলে তাই খেতে হামেশাই আসে এখানে।

আমি কি কাজ করি জানতে চাইল সে। আমি তাকে সংক্ষেপে আমার পরিকল্পনার কথা জানালাম। এই সপ্তাহের শেষ অবধি এখানে অপেক্ষা করব আমি। এর মধ্যে আমার পাণ্ডুলিপির সদুত্তর না পেলে ভেলায় চেপে সমুদ্র-অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করব। একথা শুনে ছেলেটি বিশেষ কোন মন্তব্য করেনি। তবে বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়ে আমি যা বলছিলাম শুনছিল।

চারদিন পরে আবার আমরা একই ঘরে খাবার টেবিলে মিলিত হলাম।

'যাওয়া সম্বন্ধে কি সাব্যস্ত করলেন?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, আমি যাবই,' জবাবে বললাম আমি।

'কবে ?'

'যত শীগগির সম্ভব। আর বেশি দিন অপেক্ষা করলে কুমেরু অঞ্চল থেকে হাওয়া বইতে শুরু করবে—দ্বীপপুঞ্জেও ঝড়ো আবহাওয়া শুরু হয়ে যাবে। কয়েক মাসের মধ্যেই পেরু ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু তার আগে টাকা পয়সার ব্যবস্থা করা চাই। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে সুসংগঠিত করে হাতের মুঠোয় আনতে হবে তো।'

'কতজন লোক সঙ্গে যাবে ?'

'আমি ঠিক করেছি সব মিলিয়ে ছ-জন যাব। চব্বিশ ঘণ্টায় চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর হাত বদল করে দাঁড় বহা যাবে। ভেলায়ও একটা সামাজিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে।'

ছেলেটি মুহূর্তকাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কি একটা চিন্তা মনের মধ্যে তোলপাড় করছে—হঠাৎ সশব্দে বেশ জোরের সঙ্গেই ফেটে পড়ল।

'আমিও সঙ্গী হতে চাই—বিপদ যা আসে আসুক। আপনাকে বাতাস ঢেউ ও স্রোতের গতিবিধির সঠিক হিসেবনিকেশ করে অভিযানে নামতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি বিরাট বিস্তীর্ণ অজানা সমুদ্র অতিক্রম করতে চলেছেন—যা জাহাজ যাওয়া-আসার পথের বাইরে। এইরকম অভিযান পৃথিবীর জলভাগের বৈজ্ঞানিক বিবরণ ও

আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানেও সহায়তা করবে। আমিও তাপ প্রয়োগে গতি-বিস্তার ব্যবহারেরও সুযোগ পাবে।'

ছেলেটির সঙ্গে মৌখিক যা আলাপ পরিচয়—তার বেশি আর কিছুই জানি না। তবে এই আলাপের সূত্রে তার চরিত্রের অনেককিছু প্রকাশ পেয়েছে।

'বেশ তো! একসঙ্গে যাওয়া যাবে,' বললাম আমি।

ছেলেটির নাম হেরমান ওয়াটজিংগার। সেও তো আমার মতোই স্থলচর জীব। আনাড়ী নাবিক।

কয়েকদিন পরে হেরমানকে নিয়ে অভিযাত্রিক ক্লাবে গেলাম। মেরু অভিযাত্রী পিটার ফ্রেউচেনের সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ করলাম। ফ্রেউচেন এমন একজন লোক যিনি জনারণ্যে কখনও হারিয়ে যান না। এটা তাঁর একটি বিশেষ গুণ। বিরাট বপু—সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিনি যেন তুন্দ্রাঞ্চলের অগ্রদূত। তাঁকে ঘিরে একটা বিশেষ আবহাওয়ার চক্র—যেন তিনি একটা গ্রিজলি ভল্লুককে চালিত করে নিয়ে চলেছেন।

দেয়ালে টাঙানো একটা মানচিত্রের কাছে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনার কথা বললাম। শুনতে শুনতে তাঁর চোখদুটো পিরিচের মতো বড় হয়ে উঠল। কাঠের মেঝেতে জোরসে পা ঠুকলেন—কয়েকবার কোমরের বেল্ট আঁট করে বাঁধলেন।

'চুলোয় যাক! আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, খোকারা।'

বুড়ো গ্রীনল্যাণ্ড অভিযাত্রী আমাদের পাত্রগুলো বিয়ারে ভরতি করে গল্প জুড়ে দিলেন—বললেন, আদিম মানুষদের জলযানের উপর তাঁর অটুট আস্থা আছে। কি স্থলে কি সমুদ্রে, প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের অদ্ভুত ভাবে মানিয়ে নিতে পারে তারা। তিনি নিজেই তো ভেলায় চেপে সাইবেরিয়ার বড় বড় নদী পারাপার করেছেন। আবার আদিবাসীদের ভেলায় চাপিয়ে নিজে ভেলার পিছনে বসে তাদের আর্টিক সমুদ্রের তীর বরাবর ভেলা বেয়ে নিয়ে গেছেন। বলতে বলতে বার বার তিনি দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। ওঃ! ব্যাপারটা এক বিরাট মজার হবে!

ফ্রেউচেনের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের পরিকল্পনা দ্রুত তালে এগিয়ে চলল—বলা যায় বিপজ্জনক গতি নিয়ে। শীগগিরই আমাদের অভিযানের খবর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সংবাদপত্রে ছাপার হরফে দেখা দিল। আর তার পরদিনই সকালে আমার নাবিক-আবাসনের দরজায় ভীষণ করাঘাত হতে লাগল—টেলিফোনেও কে নাকি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। এর ফলশ্রুতি, সেই দিনই বিকেলে আমি আর হেরমান শহরের এক অভিজাত এলাকার বাড়ির সদর দরজার বেল টিপলাম। সুবেশ পরা এক তরুণ দরজা খুলে আমাদের ভিতরে ঢোকার আহ্বান জানাল। পায়ে পেটেণ্ট লেদারের

স্লিপার—নীল স্যুটের উপর একটা পাতলা সিল্কের গাউন চাপানো। তার পরিমণ্ডলে একটা স্নিগ্ধতার আমেজ—নাকের কাছে একটা রুমাল চাপা। একটু ঠাণ্ডা লেগেছে বলে ক্ষমা চেয়ে নিল। এই ছেলেটি গত যুদ্ধে বিমান চালানোর কৃতিত্বে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এই কমনীয় ভদ্র ছেলেটি ছাড়া সেই ঘরে খবরের কাগজের দুজন উৎসাহী সংবাদদাতাও ছিল—তারা অভিনব চিন্তার খবরের লোভে ছটফট করছিল। ওদের একজনকে দক্ষ সাংবাদিক হিসেবে আগেই চিনতাম।

হুয়িস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে গৃহস্বামী জানাল, সে আমাদের এই অভিযানের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। যদি আমরা অভিযান থেকে ফিরে এসে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখতে ও নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে রাজি থাকি, তাহলে অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা জোগাড় করে দিতেও রাজি আছে সে। শেষ পর্যন্ত আমরা একটা চুক্তিতে এসে পৌছলাম। অভিযাত্রিক ও যারা এ অভিযানে সাহায্য করবে তাদের মধ্যে একটা সফল চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হল। এবার আমাদের আর্থিক সমস্যারও সুরাহা হয়ে গেল। পৃষ্ঠপোষক সে-ভার নিয়েছে—আমাদের আর এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। হেরমান আর আমি তখুনি কাজে নেমে পড়লাম—ভেলা চালক ও সাজ সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে। ভেলাও তৈরি করতে হবে। প্রভঞ্জন ঋতু শুরু হবার আগেই আমাদের সকল প্রস্তুতি-পর্ব সমাধা ও অভিযান শুরু করতে হবে।

পরদিনই হেরমান চাকরিতে ইস্তফা দিল। এবার আমরা আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বৈমানিক সাজসরঞ্জামের সামরিক ল্যাবরেটরি থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আগে থেকেই পেয়েছি। যা-যা দরকার সবকিছুই সরবরাহ করবে তারা। আর অভিযাত্রী ক্লাবের সাহায্যের তো কথাই নেই। আমরা যে-ধরনের অভিযান চালাতে যাচ্ছি তার প্রতিটি সাজসরঞ্জাম খুঁটিনাটি পরীক্ষা করার তারাই তো আদর্শ সংস্থা। আরম্ভটা শুভই হল। আমাদের এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—চারজন লোক খুঁজে বের করা যারা আমাদের সঙ্গে এই অভিযানে যেতে ইচ্ছুক। আর এ কাজের পক্ষে উপযুক্ত রসদেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

যারা ভেলায় যাবে তাদের বাছাই করে নিতে হবে। তা নাহলে একমাস নিঃসঙ্গ সমুদ্রবিহারে বিপদ ও বিদ্রোহ শুরু হতে বাধ্য। নাবিকদের সাহায্যে ভেলা চালাতে চাই না আমি। তারা অবশ্য আমাদের চেয়ে একাজে বেশি ওস্তাদ নয়। অভিযান শেষে আবার এসব নিয়ে কথাও উঠতে পারে। পেরুর অভিজ্ঞ ভেলাওয়ালাদের চেয়ে অভিজ্ঞ নাবিক আমাদের মধ্যে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তবে এমন একজন লোক আমাদের দলে চাই যে দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ মাপার যন্ত্র ব্যবহারে ওয়াকিবহাল এবং আমাদের গতিপথের একটা নকশা লিপিবদ্ধ করতে পারবে। এটা পরে বৈজ্ঞানিক সংবাদ সরবরাহের পক্ষে খুবই কাজ দেবে।

'আমি একজন ভালো ছেলেকে জানি—সে শিল্পী, 'হেরমানকে বললাম আমি, 'বেশ লম্বাচওড়া দ.মাল ছেলে। খুব আমুদে—গীটার বাজাতেও জানে। নাবিক স্কুলে পড়েছে—রং তুলি নিয়ে বাড়িতে স্থায়ী হয়ে বসার আগে বার কয়েক পৃথিবী পরিক্রমাও করেছে। বালক বয়স থেকেই তার সঙ্গে আমার জানাশোনা। বাড়িতে থাকাকালীন তার সঙ্গে পাহাড়ে-পর্বতে ক্যাম্প করে কাটিয়েছি কতদিন। তাকেও আসার জন্য চিঠি দেব। সে নিশ্চয়ই আসবে।'

'শুনে তো ভালোই ঠেকছে,' বলল হেরমান, 'রেডিও নাড়াচাড়া করতে পারে এমন লোকও দরকার।'

'রেডিও?' আমি তো ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'রেডিও দিয়ে কি হবে? প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভেলায় রেডিয়োর স্থান বেমানান।'

'আদৌ নয়। নিরাপত্তার খাতিরেও এটা দরকার। যতক্ষণ না সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠাচ্ছি ততক্ষণ আমাদের মতবাদের সঙ্গে একটুও সংঘর্ষ বাধবে না। আবহাওয়া সম্বন্ধে নানারকম বিবরণ ও পর্যবেক্ষণের খবরও তো পাঠাতে হবে, কিন্তু ঝড়ের সংকেত পেয়ে আমাদের কোন লাভ হবে না, কারণ মহাসাগরের এ অংশের কোন তথ্য জানা নেই আর জানা থাকলেও ভেলায় তা কোন্ কাজে আসবে?'

ওর যুক্তিজালের চাপে আমার সমস্ত ওজর-আপত্তি ক্রমশ হাওয়া হয়ে গেল। বললাম আমি, 'সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল—আমারই ক্ষুদে সেটের সাহায্যে বহু দূরে রেডিয়োর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়। যুদ্ধের সময় আমি তো রেডিও বিভাগের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলাম। প্রত্যেকেই যে যার উপযুক্ত জায়গায় আছি। আমি নিশ্চয়ই ক্যুট হগল্যাণ্ড ও টরস্টেইন র‍্যাবিকে চিঠি লিখব।'

'আপনি তাদের চেনেন?'

'চিনি বইকি। ক্যুটের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে ইংল্যাণ্ডে। ১৯৪৪ সালে। জার্মানরা পারমাণবিক বোমা হস্তগত করার চেষ্টা করছিল। যারা প্যারাচুট অভিযানের সাহায্যে তাদের সে-চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল সে সেই দলের অন্যতম। এজন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে। ক্যুট ছিল রেডিও চালক। আমার সঙ্গে তার যখন দেখা হয়, সে তখন সদ্য নরওয়ে থেকে ফিরেছে। ওসলোর প্রসূতি-সদনের চিমনীতে রাখা গোপন রেডিও-সেটের সাহায্যে গেস্টাপোরা তাকে ধরে ফেলে। তার হদিস পেয়ে সমস্ত বাড়িটা জার্মান সৈন্যরা ঘিরে ধরে। প্রত্যেক দরজার সামনে মেশিনগান হাতে নিয়ে এক একজন সৈনিক মোতায়েন হল। গেস্টাপোদের যে মাথা, সে নিজে উঠোনে দাঁড়িয়ে। নাম ফেমার। ক্যুটকে নিচে নামিয়ে আনা হলে সে তাকে স্বয়ং অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু নিচে নেমে এল তার নিজের লোকেরাই। ক্যুট চিলে কোঠা থেকে সেলার পর্যন্ত পিস্তল হাতে লড়েছে—

তারপর হাসপাতালের পিছন দিক দিয়ে কেটে পড়েছে। হাসপাতালের দেয়াল টপকে হাওয়া। আশপাশ থেকে প্রচুর বুলেটের গুলি তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে কিন্তু প্রাণে মারতে পারেনি। একটা পুরানো ইংলিশ দুর্গ-বাড়িতে গোপনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। পরে নরওয়ের অধিকৃত এলাকায় ফিরে এসেছিল গোপন সংগঠন-বাহিনী গড়ে তুলতে। শতাধিক রেডিও মারফত খবরাখবর পাচারের গোপন ঘাঁটি ছিল অধিকৃত এলাকায়।

'আমার তখন সদ্য প্যারাচুট ব্যবহারের শিক্ষা সমাপ্ত। আমাদের পরিকল্পনা ছিল অসলোর কাছে নর্দমার্কে প্যারাচুটের সাহায্যে অবতরণ করা। সেই সময় রাশিয়ানরা আবার কারকেনস অঞ্চলে এসে পড়েছে। এই সময় স্কটল্যাণ্ড থেকে একটা ছোট নরওয়ে-বাহিনী ফিনমার্কে পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য—সমস্ত অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব রাশিয়ানদের হাত থেকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া। আমাকেও এই দলে পাঠানো হয়েছিল। এখানেই টরস্টিয়েনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়।

'তখন সেখানে সুমেরু অঞ্চলের শীত বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। নক্ষত্রখচিত আকাশে সুমেরু-আলোক বিস্ফোরণ হচ্চে। তাছাড়া দিনে-রাতে সবসময় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আমরা যখন ফিনমার্কের পুড়িয়ে-দেওয়া এলাকার ছাইয়ের স্তূপের কাছে এলাম পাহাড়ের এক ছোট্ট কুঁড়ে থেকে গুঁড়ি মেরে বের হয়ে এল এক হাসিখুশি মানুষ। শীতে জমে নীল হয়ে গেছে—আপাদমস্তক ফারে ঢাকা, মাথা ভরতি কোঁকড়ান সুন্দর চুল। চোখের মণিদুটো নীল। সেই হল টরস্টিয়েন র‍্যাবি। প্রথম ধাক্কায় সে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখানে বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। তারপর তাকে ট্রমসোর কাছকাছি নরওয়েতে গোপনে চালান করে দেওয়া হয়। ছোট্ট একটা বার্তা-প্রেরক যন্ত্র নিয়ে যুদ্ধ জাহাজ টিরপিট্জের আশে পাশে ঘাপটি মেরে থাকে। দীর্ঘ দশ মাস ধরে জাহাজে যা-যা ঘটেছে, গোপনে সে সব বার্তা পাঠিয়েছে ইংল্যাণ্ডে। জার্মান অফিসারের রেডিয়োর এয়ারইয়েলের সঙ্গে রাত্রে সে গোপনে তার প্রেরক যন্ত্রের যোগাযোগ করত। তার এই নিত্য সরবরাহ করা বার্তার উপর ভিত্তি করেই ব্রিটিশ বোমারু বিমান জার্মান যুদ্ধজাহাজটিকে ঘায়েল করে।

'টরস্টিয়েন সুইডেনে পালিয়ে যায়—সেখান থেকে আবার ইংল্যাণ্ডে। এরপর নতুন রেডিও সেট নিয়ে প্যারাসুটের সাহায্যে জার্মান বাহিনীর পশ্চাৎভাগে ফিনমার্কের জঙ্গলে অবতরণ করে। জার্মানরা পিছু হটে গেলে আবিষ্কার করল আমাদের সেনা-বাহিনীর পিছন দিকেই অবস্থান করছে সে। গোপন স্থান থেকে বের হয়ে এসে তার রেডিও-সেট নিয়ে তখন সে আমাদের সাহায্যে লেগে যায়। আমাদের প্রধান রেডিও-ষ্টেশান মাইনের সাহায্যে শত্রুরা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি জোর দিয়ে বলতে

পারি স্যুট ও টরস্টিয়েন বাড়িতে বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে। একটা কিছু করা চাই। কাঠের ভেলায় সমুদ্র অভিযানের খবরে খুশিই হবে তারা।'

'বেশ তো, তাদের আসতে চিঠি লিখে দিন,' বলল হেরমান।

নিছক খবর হিসেবে ছোট্ট একটা চিরকুট পাঠালাম এরিক, স্যুট ও টরস্টিয়েনের কাছে—কাউকেই আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম না।

'পেরু থেকে আগত লোকেরাই দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল—এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাঠের ভেলায় চেপে আমরা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করব। তোমারও যাবে কি? পেরু ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনরকম দায়-দায়িত্ব নিতে অপরাগ আমি। তবে এই অভিযানে তোমাদের যান্ত্রিক কুশলতা পরীক্ষা করার এক অপূর্ব সুযোগ পাবে। অবিলম্বে উত্তর চাই।'

পরের দিনই টরস্টিয়েনের কাছ থেকে নিচের টেলিগ্রামটি প্রথম এল—

'আসছি। টরস্টিয়েন।'

অন্য দুজনও এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। আমাদের দলের ষষ্ঠ সদস্যের জন্য লোক খোঁজা চলতে লাগল। কখনও একজনকে, কখনও আর একজনকে মনোনীত করছি, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই একটা-না-একটা বাধা দেখা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে আমি আর হেরমান রসদের দিকে মন দিলাম। লামার মাংস বা শুকনো কুমারা আলু খেতে চাই না। আমরা নিজেরাই এক সময় ইণ্ডিয়ান ছিলাম, সেরকমও কোন প্রমাণ দিতে চাই না। ইনকা-ভেলার গুণাগুণ ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এইসব ভেলা কতখানি সমুদ্রোপযোগী, কতটা ভার বহন করতে পারে, এইসব মালমশলা ও লোকজনদের নিয়ে পলভনেসিয়াতে যেতে সক্ষম কিনা—পরীক্ষা করে দেখা। আমাদের আগে যারা সেখানে গিয়েছিল, তারা ডাঙ্গায় শুকনো আলু, শুকনো মাংস খেতে অভ্যস্ত ছিল—কাজেই ভেলাতেও তারা ঐ খাবার খেয়ে থাকতে পারে। আমরা দেখতে চাই যখন সত্যিকার অভিযান সুরু হয়েছিল, তারা বাড়তি সমুদ্রের টাটকা মাছ, বৃষ্টির জল ধরে খেয়েছিল কিনা। এসবও অনুসন্ধান করে দেখতে চাই। আমরা অবশ্য রণক্ষেত্রে যে-ধরনের খাবার সরবরাহ করা হয় তাই সঙ্গে নেব। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে আমাদের।

ঠিক এই সময় একদিন ওয়াশিংটনে নরওয়ের সামরিক রাষ্ট্রদূতের সহযোগীর এক নবনিযুক্ত কর্মচারী এসে উপস্থিত। ফিনমার্কে আমি তার কম্পানীর দ্বিতীয় প্রধান ছিলাম। আমি চিনতাম তাকে—ছেলেটা ছিল যেন আগুনের গোলা—সব সময় আক্রমণোদ্যত। কোন সমস্যা দেখা দিলে দানবীয় শক্তি নিয়ে তার মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসত। বয়র্ণ রয়হোলট্ এইরকম এক অফুরন্ত জীবনী-শক্তিতে চলকে-

ওঠা মানুষ। অনবরত নতুন নতুন কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে না পারলে নিজেকে সম্পূর্ণ মৃত মনে করত সে। জড় পদার্থের মতো বেঁচে থেকে কি লাভ?

আমি তাকে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে চিঠি দিয়েছিলাম। আমেরিকান সামরিক বিভাগের সরবরাহ দপ্তরের কোন জান-পাচান লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বিমান-দপ্তরের ল্যাবরাটরিতে যেমন নতুন সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পরীক্ষা চলছে তেমনি রণক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নতুন রসদ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। হয়ত তার সুযোগ নিতে পারব।

দুদিন বাদে বয়র্ণ ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে জানাল, আমেরিকার সামরিক দপ্তরের বৈদেশিক বিভাগের সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছে—কি ব্যাপারে সাহায্য চাই তারা তার বিষদ বিবরণ জানতে চেয়েছে।

হেরমান আর আমি ওয়াশিংটনে যাবার প্রথম ট্রেনেই চেপে বসলাম।

সামরিক রাষ্ট্রদূতের অফিসেই বয়র্ণের দেখা পেলাম। সে বলল, 'আশা করছি সব ব্যবস্থাই সুষ্ঠুভাবে হয়ে যাবে। বৈদেশিক যোগাযোগ দপ্তরে আগামী কালই সংযোগ করতে পারব। অবশ্য কর্ণেলের কাছ থেকে একটা অনুমতিপত্র নিতে হবে।'

কর্ণেল হলেন নরওয়ের রাষ্ট্রদূত অটো মুন্থে-ক্যাস। ভদ্রলোক বেশ স্নিগ্ধ মেজাজের লোক। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা সব যখন শুনলেন, তিনি পরিচয়-পত্রই কেবল দিলেন না, আরও বেশি সাহায্য করার অনুকূল মেজাজ দেখালেন।

পরদিন সকালে আমরা যখন তাঁর কাছে পরিচয়-পত্র নিতে গেলাম, হঠাৎ তিনি টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, তিনি সঙ্গে গেলে সব থেকে ভালো হবে। কর্ণেলের গাড়ি করে পেন্টাগন প্রাসাদে সামরিক বিভাগের অফিসের দিকে আমরা রওনা দিলাম। কর্ণেল বয়র্ণ সামরিক পোশাকে গাড়ির সামনে বসে আর তাদের পিছনে হেরমান ও আমি। গাড়ির জানলার ভিতর দিয়ে বিরাট পেন্টাগন প্রাসাদের দিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। সামনের সমতল প্রান্তরের উপর কি অত্যুংগ মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। এই বিরাট বাড়িতে তিরিশ হাজার কর্মী কাজ করে —করিডরের দৈর্ঘ্য হবে ষোল মাইল। এই বিরাট প্রাসাদেই ভেলা-অভিযান নিয়ে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হবে। আগে বা পরে আর কখনও হেরমান বা আমার কাছে ছোট্ট ভেলা এত নৈরাশ্যজনক তুচ্ছ মনে হয়নি। কত যে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলাম-নামলাম, কত যে করিডর পার হলাম, তার ইয়ত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক যোগাযোগ দপ্তরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরেই বিরাট একটা মেহাগনি কাঠের টেবিলের ধারে এসে বসলাম। চারদিক ঘিরে নতুন ইউনিফর্ম-পরা লোকজন। বৈদেশিক দপ্তরের প্রধানই নিজে কথাবার্তা চালালেন। তিনিই সভার নেতৃত্ব দিলেন।

প্রশান্ত চেহারা, রুক্ষ কঠিন-দৃষ্টি অফিসার—টেবিলের শেষ প্রান্তে বেশ অনেকটা জায়গা দখল করে বসে আছেন। প্রথমটা তিনি ভেলা আর সামরিক সদর দপ্তরের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কর্নেল সুপরিচিত বাক্য-বিন্যাসে টেবিলের চারদিকে যে সব অফিসাররা বসে আছেন, তাঁদের উপর ঝড়ের গতিতে চোখ বুলিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে জয় করে নিজের পক্ষে টেনে আনলেন। সাজসরঞ্জাম ল্যাবরাটরির এয়ার মার্শাল কম্যাণ্ডারের লেখা চিঠিখানা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে পড়লেন তিনি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অধস্তন কর্মচারীদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিলেন—যথাসম্ভব আইনের গণ্ডী মেনে যেন আমাদের সম্যক সাহায্য করা হয়। তারপর আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন আলোচনা কক্ষ থেকে।

তিনি বের হয়ে যেতেই একজন ক্যাপ্টেন ছোকরা আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'বাজি রেখে বলতে পারি, যা চান আর পেতে একটুও অসুবিধে হবে না। ব্যাপারটায় একটা ছোটখাট সামরিক অভিযানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শান্তির সময় আমাদের দৈনন্দিন অফিসের ধরা-বাঁধা জীবনে একটু যেন পরিবর্তনের ঢেউ তুলেছে। যন্ত্রপাতি সুনির্দিষ্ট পন্থায় পরীক্ষা করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।'

সংযোগকারী অফিসার তখুনি কর্নেল লুইসের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন—সামরিক পরীক্ষাগারের ল্যাবরাটরিতেই তত্ত্বাধায়ক অফিসার-কম্যাণ্ডারের অফিসের ভিতরেই।'

কর্নেল লুইস একজন ভারি অমায়িক অফিসার। বিশেষ নামডাক আছে। বেশ খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তিনি তখুনি বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের ডেকে পাঠালেন। তাদের প্রত্যেকেরই আন্তরিকতা সন্দেহাতীত। তখুনি অসংখ্য যন্ত্র-পাতির নমুনা দেখাতে চাইলেন তাঁরা। যখন যে-সব যন্ত্রপাতির দরকার হতে পারে তাদের প্রত্যেকটির নাম একে একে বলে যেতে লাগলেন—আমাদের উর্বর মস্তিষ্কের অবাধ কল্পনাও তাতে হালে পানি পেল না। যুদ্ধক্ষেত্রের রসদ থেকে শুরু করে রোদে ঝলসানোর প্রতিষেধক ওষুধ, ছিটকে-আসা জল-নিরোধক ঘুমানোর ব্যাগ পর্যন্ত। এরপর তাঁরা আমাদের গবেষণাগারের সর্বত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। ছোট ছোট প্যাকেটে মোড়া বিশেষ ধরনের খাবার খেলাম, জলে-পড়ে-ভেজা দেশালাই জ্বালিয়ে দেখবার নতুন ধরনের প্রাইমা স্টোভ, জলের ছোট ছোট পিপে দেখলাম। দেখলাম বিশেষ ধরনের বুট, রান্নার যন্ত্রপাতি, জলে ডুববে না, ভাসবে এমন ছুরি অর্থাৎ এধরনের অভিযানের পক্ষে যা যা দরকার সব কিছু।

হেরম্যানের দিকে তাকালাম আমি। ও যেন ধনী মাসির সঙ্গে চকলেটের দোকানের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে ছোট ছেলের মতো মনে একটা উদগ্র লুব্ধ বাসনা

নিয়ে। কর্নেল সবার আগে চলেছেন—প্রতিটি জিনিষ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পরীক্ষান্তে কর্মচরারীরা কি কি জিনিস লাগবে এবং তাদের পরিমাণ কত হবে—একটা খাতায় টুকে নিল। আমার মনের অবস্থা তখন—যুদ্ধ জয় তো হয়েই গেছে। আমি তখন তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে দিগন্তের দিকে চোখ মেলে একান্ত নিরালায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে আশু কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার একটা তীব্র ইচ্ছা বোধ করছিলাম মনে মনে। হঠাৎ দীর্ঘদেহী কর্নেল বললেন, 'এবার ভিতরে গিয়ে প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। চাহিদা মতো জিনিস দেবার ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করছে।'

একথা শোনামাত্র বুক দমে গেল। আমার তো তখন একবারে মাটিতে বসে পড়ার মতো অবস্থা। আবার আমাদের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে বাগজাল বিস্তার করতে হবে। কে জানে প্রধান কর্মকর্তাটি কেমন মানুষ।

ছোটখাট মানুষটি। অত্যন্ত আগ্রহশীল। বসে আছেন লেখার টেবিলের পিছনে। ঘরে ঢোকামাত্র তিনি আমাদের তীক্ষ্ণ নীল চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন—তারপর বসতে অনুরোধ করলেন। কর্নেলকেই জিজ্ঞেস করলেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, এই ভদ্র লোকরা কি চান? কিন্তু আমার উপর থেকে তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও সরাননি।

ঝটপট উত্তর দিলেন লুইস— 'মাত্র এই সামান্য কয়েকটা জিনিস।' তিনি সংক্ষেপে আমাদের উদ্দেশ্যের একটা রূপ-রেখা তুলে ধরলেন। প্রধান ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন। একটা আঙুলও নড়ালেন না।

'এসবের পরিবর্তে এঁরা আমাদের কি দেবেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটুও যে প্রভাবান্বিত হয়েছেন মনে হল না।

'যে কঠোর বিরূপ পারিপার্শ্বিকের ভিতর দিয়ে এঁদের অভিযান চালাতে হবে তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি ও রসদের উৎকর্ষতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে। এঁরা এ বিষয়ে আলোকপাত করে অভিজ্ঞ মতামত দিতে পারবেন,' মন-ভেজানো গলায় বললেন লুইস।

লেখার টেবিলের পিছনে-বসা অত্যন্ত আগ্রহী ও আন্তরিক অফিসারটি এবার ধীরে ধীরে পিছনের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসলেন আরাম করে। তাঁর চোখ দুটি তখনও আমার উপর স্থির নিবদ্ধ। আমার তো তখন পুরু চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ারের অতলে তলিয়ে যাবার মতো অবস্থা। তিনি হিমেল কণ্ঠে বললেন, 'এসবের বিনিময়ে ওঁরা আমাদের কি যে দেবেন আমি তো তার কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা।'

ঘরে নিঃসীম নীরবতা নেমে এসেছে। কর্নেল লুইস আমার কলারে হাত বুলোতে লাগলেন। আমাদের দুজনের কারুর মুখেই কথা নেই।

'কিন্তু,' হঠাৎ প্রধান বলে উঠলেন। ওঁর চোখের কোনে একটা বিদ্যুতের

ঝিকিমিকি খেলে গেল। 'সাহস ও উদ্যম এক্ষেত্রে একান্ত দরকার। কর্ণেল, ওঁরা যা-যা চান দিয়ে দাও।'

যে-গাড়িটা আমাদের হোটেলে পৌছে দিল তার আসনে বসে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে লাগলাম—আমার তখন আনন্দে অর্ধমাতাল অবস্থা। হঠাৎ পাশে-বসা হেরমান খুক খুক করে হেসে উঠল আপন মনে—তারপরই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল।

'তোমার মাথার গোলমাল হয়নি তো?' উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলাম আমি।

'না—না,' নির্লজ্জের মতো হাসতে লাগল সে, 'আমি মনে মনে একটা হিসেব করছিলাম। আমাদের রসদের মধ্যে থাকছে ছয় শ চুরোশি বাক্স আনারস। আর আনারস খেতে আমি খুবই ভালোবাসি।'

এখনও হাজার রকম কাজ করবার আছে। আর সবই একই সঙ্গে করতে হবে—পেরুর উপকূলের কোন এক জায়গায় দুজন মানুষকে মালপত্র ভেলা নিয়ে জমায়েত হতে হবে। হাতে মাত্র তিন মাস সময়, অথচ আমাদের হাতে তো আলাদীনের প্রদীপ নেই।

আমরা প্লেনে চেপে নিউইয়র্কে চলে এলাম—সংযোগ অফিসারের পরিচয়-পত্র নিয়ে দেখা করলাম কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভেরের সঙ্গে। তিনি সমর-দপ্তরের ভৌগলিক গবেষণা-কমিটির সর্বপ্রধান। বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে হেরমান পেরে গেল বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি আর মাপজোখ করারও যন্ত্র।

তারপর প্লেনে চেপে গেলাম ওয়াশিংটনে ন্যাভাল হাইড্রোগ্র্যাফিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান নৌ-সেনাধিপতি গ্লোভারের সঙ্গে দেখা করতে। মানুষটি বড়ই সজ্জন। তিনি সমস্ত অফিসারদের ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার আর হেরমানের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর দেয়ালে টাঙানো প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এই তরুণ ভদ্রলোক দুটি আমাদের সর্বাধুনিক মানচিত্রের নির্ভুলতা পরীক্ষা করতে চান, এদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।'

গাড়ির চাকা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ইংরেজ কর্ণেল লুমসডেন ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ সামরিক মিশনের কার্যালয়ে একটা মন্ত্রণাসভা ডাকলেন—আমাদের ভবিষ্যত সমস্যা আর তার অনুকূল সমাধানের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতে। প্রচুর সদুপদেশ পেলাম। স্বদেশ থেকে তিনি উড়োজাহাজে করে কিছু যন্ত্রপাতি আনাবেন—এই ভেলা অভিযানে তাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য। ইংরেজ মেডিক্যাল অফিসার এক ধরনের হাঙর তাড়ানোর রহস্যময় গুঁড়ো আবিষ্কার করেছেন। তিনি তার কার্যকারিতা প্রচারের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। কোন হাঙর যদি ভেলার আশেপাশে ভয়ঙ্কর বেয়াড়াপনা শুরু করে তখন এই গুঁড়ো জলে ছড়িয়ে দিলে বাছাধন আর পালাবার পথ খুঁজে পাবে না—ল্যাজ তুলে মুহূর্তে চম্পট দেবে।

আমি অতি বিনয়ের সুরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কি এই গুঁড়োর উপর নির্ভর করতে পারি ?'

মুখে হাসি টেনে বললেন ইংরেজ ভদ্রলোক, 'আরে, পারা যায় কি না সেটাই তো আমরা পরীক্ষা করাতে চাই।'

সময় যখন অল্প, ট্রেন ছেড়ে প্লেনের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে, আর পা-গাড়ি ছেড়ে ট্যাকসি-গাড়ি নিতে হচ্ছে, আর এর ফলে আমাদের টাকার থলিও শুকনো পাতার মতো ঝুর ঝুর করে পড়তে লাগল। নরওয়ে ফেরার ফিরতি টিকিটের দামও খরচ হয়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করলাম, নিউইয়র্কে আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে সোজাসুজি টাকার জন্য হাত পাতলাম। কিন্তু বিস্ময়কর ও নিরুৎসাহজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হল। আমার অর্থনৈতিক ম্যানেজার জ্বরে শয্যাশায়ী—যতদিন না সে সেরে উঠছে তার সহকারী দুজন এক্ষেত্রে অসহায়। তারা আমাদের অর্থনৈতিক সাহায্যদানে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, কিন্তু সাময়িকভাবে কোন সাহায্য করতে পারছে না। অভিযান মুলতুবী রাখতে উপদেশ দিল—কিন্তু এ অনুরোধ অর্থহীন। নানা কাজের চাকা এখন ভীষণভাবে ঘূর্ণিত হচ্ছে—কি ভাবে এখন তাদের গতিরোধ করব। আমাদের এগিয়ে চলতেই হবে, থামা বা ব্রেক কষা অসম্ভব। আমার বন্ধু ও উৎসাহদাতারা সমস্ত সংঘটাকে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিল। আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি।

অতএব শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমরা পথে এসে দাঁড়ালাম।

'ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেবরুয়ারি—আর মাত্র তিন মাস হাতে আছে,' বলল হেরম্যান।

'মার্চেরও এক চিলতে,' বললাম আমি, 'আমাদের যাত্রা করতেই হবে।'

সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও একটা জিনিস দিনের মতো স্পষ্ট। আমাদের অভিযানের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। আমরা তো আর নায়গ্রা প্রপাতে ভিগবাজি-খাওয়া শূন্যপকেট দড়াবাজিকরের দলভুক্ত হতে চাই না, অথবা অমরা সতের দিন ধরে পতাকা-দণ্ডের উপর নিশ্চল বসে থাকতেও চাই না। এই একটা ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ একমত।

নরওয়ের মুদ্রা পেতে পারি। কিন্তু তাতে প্রশান্ত মহাসাগরের এ পারে আমাদের সমস্যার সুরাহা হবে না। কোন সংগঠনের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারি। কিন্তু যে-মতবাদ নিয়ে মতদ্বৈধতা বর্তমান, তার স্বপক্ষে কোন সাহায্যের আশা দুরাশামাত্র। অথচ সেটা প্রমাণ করবার জন্যই এই ভেলা-অভিযান। সংবাদপত্র বা পৃষ্ঠপোষকরা—কেউই সাহায্য দিতে এগিয়ে এল না। এমন কি ইনসিয়োরেন্স কম্পানীও নয়—তারা সবাই এই অভিযানকে আত্মঘাতী অভিযান বলে গণ্য করে। তবে যদি সুস্থ দেহে নিরাপদে ফিরে আসতে পারি, তখন না হয়ে ভেবে দেখা যাবে। সে অন্যকথা।

ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল—কয়েকদিন তো কোন আশার আলোই দেখতে পেলাম না। এই সময় কর্ণেল মুনথে-ক্যাস বিপদত্রাতা রূপে দেখা দিলেন।

'বৎসগণ দেখছি, বড়ই ঝামেলায় পড়েছ,' বললেন তিনি, 'কাজ শুরু করার খরচা হিসেবে এই চেকটা লাও। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ থেকে ফিরে এসে ফেরৎ দিলেই চলবে।'

তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে আরও কয়েকজন এগিয়ে এলেন। এইভাবে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে এত টাকা ধার পেয়ে গেলাম যে, কোন এজেণ্ট বা অন্য কারুর কাছ থেকে সাহায্য না পেলেও এই বিপদ-সমুদ্র পার হবার আর কোন প্রতিবন্ধক রইল না। এবার দক্ষিণ আমেরিকায় বিমানে উড়ে গিয়ে ভেলা তৈরির বিলিব্যবস্থা করতে পারব।

সেই প্রাচীন কালে পেরুভিয়ায় ভেলা তৈরি হত বালসা কাঠ দিয়ে। শুকনো অবস্থায় এই কাঠ কর্কের চেয়েও হালকা। বালসা গাছ পেরুতে জন্মায়—তাও আন্দিজ পর্বতমালা পেরিয়ে। কাজেই ইনকা-যুগেও সমুদ্রগামী লোকেদের উপকূল ভাগ ধরে ইকুয়াডোর পর্যন্ত যেতে হত। সেখানে বিরাট বিরাট বালসা কাঠ কেটে তারা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে এনে ডাঁই করত। আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব ঠিক করলাম।

ইনকা-যুগের তুলনায় এখন ভ্রমণ সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের আছে মটোর গাড়ি, উড়োজাহাজ—নানা ভ্রমণ-সংস্থা। তবে এ যুগেও ব্যাপারটা খুব সহজ নয়—সমস্যা আছে সীমান্তের। সীমান্তে জামায় পেতলের বোতাম-আঁটা সীমান্তরক্ষীদের মোকাবিলা করতে হবে। তারা সবসময় অপরিচিত বিদেশী লোকদের সন্দেহের চোখে দেখে, মালপত্তর লণ্ডভণ্ড করে—নানারকম ফর্মে সইসাবুদের ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ড হেনস্থা চালায়। এসব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে যারা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে তাদের ভাগ্যবান বলে গণ্য করা হয়। এই পেতলের তকমা-আঁটা সীমান্ত রক্ষীদের জন্য প্যাকিং বাকস, নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত সাজ-সরঞ্জাম ভরতি ট্রাঙ্ক নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, যতই না কেন আমরা টুপি খুলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্পেনীয় ভাষায় অতি বিনম্রভাবে ভিতরে ঢোকার অনুমতি চাই—তারপর ভেলায় চেপে সমুদ্র যাত্রা। আমাদের তো তখুনি জেলে পুরে ফেলা হবে।

'না না, তার আগে সরকারী অনুমতি-পত্র যোগাড় করতেই হবে,' বলল হেরমান।

সম্প্রতি ভেঙ্গে-দেওয়া সংস্থার ত্রয়ী বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের একজন সংবাদদাতা। সাহায্যের জন্য সে আমাদের গাড়ি করে সেখানে নিয়ে যেতে চাইল। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনের বিরাট হলঘরে এসে আমরা বিস্ময়ে

একেবারে হতবাক। সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে একজন কালো দাড়িওয়ালা রুশীর বক্তৃতা শুনছে নিঃশব্দে। পিছনের দেয়ালে শোভিত পৃথিবীর এক বিরাট মানচিত্র।

আমাদের বন্ধু সংবাদদাতা কোন এক সময়ে নিঃসাড়ে পেরুর, পরে ইকুয়াডোরেরও এক প্রতিনিধিকে পাকড়াও করল। পাশের একটি কক্ষে পুরু গঁদিআঁটা চেয়ারে বসে তাঁরা আমাদের সমুদ্র অতিক্রম করার পরিকল্পনার কথা শুনলেন বেশ মনোযোগ দিয়ে। তাঁদেরই দেশের অতীত সভ্যতার প্রতিভূ একদল লোক সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করেছিলেন—এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য। তাঁরা দুজনেই তাঁদের সরকারকে এই পরিকল্পনার কথা ওয়াকিবহাল করে সেদেশে গেলে আমাদের সবরকম সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। টিগভি লাই উপকক্ষ থেকে যাবার সময় যখন শুনলেন আমরা তাঁর দেশেরই লোক, তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন—কে একজন প্রস্তাবও করল ভেলা-অভিযানে তাঁরও আমাদের সঙ্গী হওয়া উচিত। কিন্তু স্থলেই তাঁকে অনেক তরঙ্গ-বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী ড. বেনজামিন কোহেন চিলির নাগরিক—নিজেই একজন সংঘের প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি পেরুর প্রেসিডেণ্টের কাছে আমাদের নামে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখে দিলেন। তিনি প্রেসিডেণ্টের একজন নিকট বন্ধু। আমরা হলঘরে এসে নরওয়ের অ্যামবাসাডরের সঙ্গেও দেখা করলাম। তিনি সেদিন থেকে আমাদের অভিযানের একজন অকৃত্রিম সমর্থকে পরিণত হলেন। ভদ্রলোকের নাম উইলহেল্‌ম ভন মুনথি। তিনি আমাদের বহু অমূল্য সাহায্য দান করেছেন।

দুখানা টিকিট কিনে আমরা তখুনি দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি জমালাম। যখন প্লেনের চারটে ইঞ্জিন বিরাট গর্জন করছিল, আমরা তখন হা-ক্লান্ত হয়ে নিজেদের আসনে বসে। মনে অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তা অবসানের সুখশান্তি। যাক, এতদিনে পরিকল্পিত অভিযানের প্রথম পর্ব সমাপ্ত। এবার সোজাসুজি অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আর কোন বাধা রইল না।

॥ ৩ ॥

নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিমান কাত হয়ে নিচে অবতরণ করতে লাগল—চারদিকের দুধের মতো সাদা মেঘ ভেদ করে। এতক্ষণ মেঘস্তর জ্বলন্ত সূর্যালোকে চোখ-ধাঁধানো তুষারের মতো পড়ে ছিল। এই পশমের মতো বাষ্পীয় মেঘ জানালায় লেগেছিল। এবার তা গলে গিয়ে মেঘের মতো মাথার উপরে ভেসে রইল। ক্রমশঃ নিচে দেখা দিল তরঙ্গায়িত বন-প্রদেশের সবুজ ছাদ। আমরা দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রী রাজ্য ইকুয়াডোরের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি। আমাদের বিমান গুয়েয়া কুইল বিমান বন্দরে অবতরণ করল।

গতকালের কোট ভেস্ট ওভার কোট কাঁধে ঝুলিয়ে আমরা বিমান থেকে বের হয়ে এলাম, ঢুকলাম একটি উষ্ণ কক্ষ। গ্রীষ্মমণ্ডলের উপযোগী পোশাকে দক্ষিনীরা কিচির মিচির করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। আমাদের শার্ট ভিজে কাগজের মতো গায়ে সেঁটে আছে। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশান অফিসাররা আমাদের আলিঙ্গন করে প্রায় কোলে করে এনে একটা গাড়িতে পৌছে দিলেন। গাড়িটা আমাদের শহরের সব থেকে ভালো হোটেলে নিয়ে এল। এটিই শহরের একমাত্র ভালো হোটেল। এখানে এসে আমরা দ্রুত স্নানাগারে ঢুকে ঠাণ্ডা জলের ঝাঁঝরির নিচে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। বালসা গাছের জন্মভূমিতে পৌছে গেছি আমরা। ভেলা তৈরি করতে আমাদের বালসা কাঠ কিনতে হবে।

প্রথম দিন কেটে গেল এখানকার আর্থিক লেনদেনের পদ্ধতি জানতে—বাড়তি স্পেনীয় ভাষাও শিখতে। পরের দিন আমরা গন্তব্যের পরিধি আরও বাড়িয়ে দিলাম। সত্যিকার তালগাছে হাত দিয়ে হেরমান আবাল্যের আকুতি নিবৃত্ত করল—আমি প্রচুর ফলের স্যালাড খেলাম। এবার বালসা কাঠের জন্য দরদস্তুর করা—কথাবার্তা চালানো।

দুর্ভাগ্যের বিষয়—একথা বলা যত সহজ করা তত কঠিন। বেশ প্রচুর পরিমাণে কাঠ কিনতে পারি, কিন্তু কাঠগুলো যে রকম বড় খণ্ডে কর্তিত অবস্থায় চাইছি সেভাবে পাচ্ছি না। উপকূল ভাগে একদা প্রচুর বালসা কাঠ পাওয়া যেত কিন্তু তে হি নো দিবসা গতা। গত যুদ্ধের সময় এই গাছ কেটে নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। হাজার হাজার গাছ ধূলিসাৎ করে জাহাজে চাপিয়ে বিমানপোতের কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ এই কাঠ হালকা ও বাষ্পপূর্ণ। এখন দেশের অভ্যন্তরে বনাঞ্চলে একমাত্র এই গাছ পাওয়া যেতে পারে।

'তাহলে সেখানে গিয়ে আমরা নিজেরাই এই গাছ কাটব,' বললাম আমরা।

'অসম্ভব,' জানিয়ে দিল সরকারী কর্মচারীরা, 'সবে বর্ষণ শুরু হয়েছে। বন্যার জল আর গভীর কাদার জন্য বনে ঢোকার পথ অতি দুর্গম। বালসা কাঠের যদি একান্তই প্রয়োজন, ছমাস বাদে আবার ইকুয়াডোরে আসবেন। তখন বৃষ্টিপাত বন্ধ হবে—পথঘাটও শুকিয়ে খটখটে হবে।'

মরিয়া হয়ে আমরা ইকুয়াডোরের বালসা-রাজা ডন গুস্টাভো ভন বাচওয়াল্ডের সঙ্গে দেখা করলাম। হেরমান ভেলার একটা নকশা খুলে দেখাল তাঁকে—কত লম্বা কাঠ লাগবে আমাদের জানাল। ছোট্ট বালসা-রাজা গভীর আগ্রহের সঙ্গে তখুনি টেলিফোন তুলে এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে কাঠের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। তক্তা, হালকা বোর্ড, ছোট ছোট কাঠের টুকরো প্রায় প্রত্যেক করাত-কলেই পাওয়া গেল। কিন্তু কোথাও কার্যোপযোগী দীর্ঘ কাঠের খণ্ড পাওয়া গেল না। মাত্র দুটো বড় কাঠের

খণ্ডের হদিস মিলল—যা শুকিয়ে একেবারে স্ফুলিঙ্গ হতে আগুন জ্বালাবার শুকনো দাহ্য পদার্থে পরিণত। এ রকম কাঠ ডন গুস্টাভোর কাঠ গুদামেই আছে। কিন্তু তাতে কোন কাজই হবে না। আমাদের খোঁজাখুঁজি ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

'আমার এক ভায়ের বিরাট বালসা কাঠের বন আছে,' আমাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ডন গুস্টাভো বললেন, 'ভায়ের নাম ডন ফেডিরিকো। কুয়েভেডোতে থাকে। উপরের দিকে এক জঙ্গলা শহর। তাকে ধরতে পারলে যা যা চান অবিলম্বে পেয়ে যাবেন। তবে বর্ষার পর তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এখন চেষ্টা করা বৃথা—সেখানে এখন অঝোর বর্ষা শুরু হয়ে গেছে।'

এই যদি গুস্টাভোরই কথা হয়, সারা ইকুয়াডোরে এমন কেউ নেই যে আমাদের আশা-ভরসা দিতে পারে। আমরা এখন গুয়ায় কুইলে আছি—যেখানে ভেলা তৈরির কাঠ নেই। আমরা নিজেরাও কোথাও গিয়ে কাঠ কাটতে পারব না। সে-আশা সুদূরপরাহত। অন্তত কয়েকমাস তো অপেক্ষা করতেই হবে। তাহলে তো অত্যন্ত দেরি হয়ে যাবে।

'হাতে যে আর একটুও সময় নেই,' বলল হেরমান।

'কিন্তু বালসা কাঠ তো চাই-ই,' বললাম আমি, 'যেমন যেমন বর্ণনা আছে সেই মতো ভেলা তৈরি করতেই হবে। তা যদি না পারি, বেঁচে ফিরে আসার সম্ভাবনাও দূরস্ত।'

হোটেলে একটা ছোট স্কুলের ম্যাপ পেলাম—তাতে সবুজ বন বাদাড়, বাদামী পাহাড় আর তাদের ঘিরে লাল রঙের জনবসতি আঁকা। সেই মানচিত্র থেকে দেখলাম, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে সুদূর আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত একটানা বনভূমি চলে গেছে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এই উপকূল ভাগ থেকে দুর্ভেদ্য বন ভেদ করে বালসাদের নিবাসভূমি কুয়েভেডোতে যাওয়া এক রকম অসম্ভব। কিন্তু যদি আমরা তুষারাবৃত আন্দিজ পর্বতমালার দিক থেকে স্থলভাগের অভ্যন্তর অঞ্চল হয়ে সোজাসুজি বালসা-কাঠের বনে যেতে চেষ্টা করি? এটাই একমাত্র সম্ভাবনার পথ—মনে হল।

বিমানক্ষেত্রে একটা মালবাহী বিমান ছিল—এই বিমান আমাদের কুইটোতে নিয়ে যেতে রাজি। কুইটো হল এই অদ্ভুত রাজ্যের রাজধানী। সমুদ্র সমতল থেকে এই আন্দিজ উপত্যকা তিনশ হাজার ফীট উঁচুতে। প্যাকিং বাকস আর আসবাবপত্রের ফাঁক দিয়ে আমরা সবুজ বনজঙ্গল ও রুপালী নদীর আভাস চকিতে দেখতে পাচ্ছিলাম। একসময় আমরা হারিয়ে গেলাম মেঘের জালে। আবার যখন মেঘের স্তর ভেদ করে বের হয়ে এলাম, সীমাহীন কুণ্ডলায়িত বাষ্পের সমুদ্রে নিচু প্রান্তরভূমি হারিয়ে গেলেও আমাদের সামনে ভেসে উঠল শুষ্ক পার্বত্যাঞ্চল কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে,

নিরাভরণ পর্বতের চূড়োগুলো—দেখলাম উজ্জল নীল আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে আছে। যেন অদৃশ্য সুতোর রেলপথ ধরে আমাদের বিমান পাহাড়ের পাশ দিয়ে উপরে উঠে যেতে লাগল—একসময় পাশে দেখতে পেলাম ঝলমলে তুষার অঞ্চল। আমাদের বিমান পাহাড়ের ভিতর দিয়ে উড়ে বসন্তসবুজ পার্বত্য মালভূমির উপর দিয়ে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য অস্বাভাবিক রাজধানীর কাছে অবতরণ করল।

কুইটোর এক লাখ পঁচাত্তর হাজার পার্বত্য ইণ্ডিয়ানদের বেশির ভাগই নির্ভেজাল—অবশ্য তাদের মধ্যে দোআঁশলারাও আছে। কলম্বস বা আমাদের জাতির লোকেদের আমেরিকাকে জানার অনেক অনেক আগে থেকেই তাদের পূর্বপুরুষদের এটাই ছিল রাজধানী। শহরে আছে অগুনতি প্রাচীন মঠ—মঠে অমূল্য শিল্পকলার নিদর্শন। এ ছাড়াও আছে অপূর্বদর্শন অদ্ভুত অদ্ভুত সুউচ্চ সৌধমালা। সেগুলো তৈরি হয়েছে স্পেনীয়দের সময়। সে-তুলনায় ইণ্ডিয়ানদের বাড়িঘর অনেক নিচু কাঠামোর—রোদে পোড়া ইঁটের তৈরি। মাটির দেওয়ালের পাশ দিয়ে অসংখ্য সরু সরু গলি এদিক ওদিক বেরিয়ে গেছে অর্থাৎ যাকে বলে গলির গোলকধাঁধা। এইসব অলিগলিতে পর্বতবাসী ইণ্ডিয়ানরা ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। গায়ে লাল ছাপওয়ালা আলখাল্লার পোশাক—মাথায় ঘরে তৈরি টুপি। কেউ কেউ গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে বাজারে যাচ্ছে—কেউ বা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে গুঁড়িমেরে বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে রোদ পোহাচ্ছে। দুচারটে বাষ্পীয় শকটও আনাগোনা করছে। গাড়িতে স্পেনীয় রক্ত দেহে অভিজাতরা বসে। গাড়িগুলোকে নির্দিষ্ট গতিবেগে অনর্গল হর্ন বাজিয়ে কোনমতে কাচ্চাবাচ্চা, গাধা আর খালি-পা ইণ্ডিয়ানদের জটলা ভেদ করে এগুতে হচ্ছে। এই সুউচ্চ মালভূমিতে বাতাস স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। চারপাশের পাহাড় যেন এই পথেরই অঙ্গ বলে ভ্রম হয়—চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে ভিন্ন জগতের এক ছবি।

আমাদের মালবাহী বিমানের চালকের নাম জর্জ। তার একটা উপনামও আছে—'পাগলাটে ওড়নবাজ।' কুইটোতে যেসব স্পেনীয়রা বসতি স্থাপন করেছে সে তাদেরই একজন। সে আমাদের একটা পুরানো মজাদার হোটেলে নিয়ে এসে তুলল। তারপর ঢুঁড়তে বের হল নিজে। কখনও কখনও আমরাও তার সঙ্গে থাকতুম। যখন সে একাই টহল মেরে বেড়াত, সে আমাদের জন্য পাহাড়ের উপর দিয়ে বা বন পেরিয়ে কুয়েভেডোতে যাবার গাড়ির খোঁজ করতে লাগল। কাফেতে সেদিন আমরা সবাই জড়ো হয়েছি। জর্জ একের পর এক তার ঝোলা থেকে খারাপ খারাপ খবর বের করতে লাগল। কুয়েভেডো যাওয়ার পরিকল্পনা যেন সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলি আমরা। পাহাড় ডিঙিয়ে কোন মানুষ বা গাড়ি আমাদের সেখানে নিয়ে যাবে না—বিশেষ করে বনের ভিতর দিয়ে। মুষল ধারায় ধারাপাত শুরু হয়ে গেছে—

যদি কোথাও কাদায় আটকে পড়ি যে-কোন মুহূর্তে খুন হয়ে যাওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়! এই তো গেল বছর একদল আমেরিকান ইনজিনিয়র ইকুয়াডোরের পূর্বাঞ্চলে আদিবাসীদের বিষাক্ত তীরে নিহত হয়েছে। সেখানে এখনও অনেক আদিবাসী ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে শিকার করে।

'তাদের কেউ কেউ আবার নরমুণ্ড-শিকারী,' হেলাফেলা গলায় বলল জর্জ। কিন্তু হেরমান অবিচলিত। সে তখন লাল মদ আর গরুর মাংস সাঁটতে ব্যস্ত।

'ভাবছেন আমি হয়ত বাড়িয়ে বলছি,' চাপা গলায় মন্তব্য কাটে জর্জ। যদিও দণ্ডনীয় তাহলেও এদেশে এমন লোক আছে যারা নরমুণ্ড থেকে জীবিকা অর্জন করে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। আজও পর্যন্ত বনে নরমুণ্ড শিকারীরা অন্য গোষ্ঠীর লোকদের মুণ্ড ছেদন করে বেড়ায়। ডাণ্ডা মেরে শত্রুর মাথা ফাটিয়ে খুলিটা খুলে নেয়, শূন্য মাথার চামড়ার মধ্যে গরম বালি ভর্তি করে ফেলে, মাথাটা শুকিয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। তখন মাথাটা বেড়ালের মাথার চেয়ে বড় হবে না। এক সময় শত্রুর এই রকম কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাওয়া মাথা বহুমূল্য বিজয় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গণ্য হত। এখন এসব দুষ্প্রাপ্য কালোবাজারের জিনিস হিসেবে গণ্য। দোআঁশলা দালালরা তাদের সংগ্রহ করে উপকূলভাগে নিয়ে গিয়ে ভ্রমণকারীদের কাছে চড়া দামে বেচে।

জর্জ বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে। ও তো জানে না আজই একজন মালবাহকের ঘরে আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই রকম এক একটা মাথা স্থানীয় হাজার মুদ্রার বিনিময়ে বেচতে চেয়েছিল। আজকাল এগুলো আবার প্রায়ই ভেজাল হয়। বানরের মাথা মানুষের মাথা বলে কেনাবেচা চলে। তবে আমাদের যা দেখানো হয়েছিল সেগুলো খাঁটি মাল—মানুষের মুণ্ডুই। আসল আদিবাসী কোন মানুষের—চেহারার কোনরকম বিকৃতি হয়নি। একটি নারী ও পুরুষের মাথা—আকারে কমলালেবুর মতো। মাথার কালো লম্বা চুল ও চোখের পাতা তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। জর্জের সতর্কতায় আমি তো বেশ ঘাবড়ে গেলাম। তা হলেও পাহাড়ে পশ্চিম দিকে এখনও নরমুণ্ড-শিকারীরা আছে, একথায় সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

জর্জ তা শুনে মুখটা কালো করে গম্ভীর গলায় বলল, 'কেউ তো জোর করে কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ আপনার বন্ধু যদি অদৃশ্য হয়ে যান, পরে তাঁর মাথাটা বাজারে বিক্রীর জন্যে এলে, কি বলবেন তখন? একবার আমার এক বন্ধুর কপালে এরকমটা ঘটেছিল।' আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে রইল জর্জ। আস্তে আস্তে মাংস চিবোতে চিবোতে বলল হেরমান—'ঘটনাটা খুলে বলো।' গল্পটা হেরমান বেশ রসিয়ে উপভোগ করছিল।

আমি কাঁটাটা প্লেটের একপাশে সাবধানে রাখলাম। জর্জ পুরো ঘটনাটা সাবধানে বলতে লাগল। জর্জ আর তার বউ বনের একটা ঝাঁড়িতে থাকত। তারা মাটি ধুয়ে সোনা সংগ্রহ করত—অন্যের সংগ্রহও কিনে নিত। তাদের একজন স্থানীয় আদিবাসী বন্ধু ছিল, যে নিয়মিত সোনার কনা সরবরাহ করত। একদিন সেই বন্ধুটি নিহত হয় বনে। জর্জ খুনীকে খুঁজে বের করে এবং গুলী করবে বলে ভয় দেখায়। যারা এই রকম ছোট হয়ে যাওয়া নরমুণ্ডু বিক্রী করে, খুনীও তাদের একজন। একটি শর্তে তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হল—যদি সে বন্ধুর মাথাটি দিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বন্ধুর মাথাটি বের করে দিল। দেখল, বন্ধুর মাথাটার কোন পরিবর্তন হয়নি, শুধু যা আকারে ছোট হয়ে গেছে। দেখে ভারি বিচলিত হল সে। মুণ্ডুটা তার বউয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। সে তো দেখামাত্র জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

জর্জ তখন মুণ্ডুটা তার ট্রাঙ্কে লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু বনের আবহাওয়া অত্যন্ত স্যাঁতস্যেঁতে—কয়েকদিনের মধ্যেই মাথায় সবুজ শ্যাওলা জমে গেল। কাজেই মাঝে-মধ্যে মুণ্ডুটা ট্রাঙ্ক থেকে বের করে রোদে শুকোতে দিতে হচ্ছিল। জর্জের বউ যত বার মুণ্ডুটা দেখত, অজ্ঞান হয়ে পড়ত। কাপড় শুকোবার দড়িতে চুলে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত মুণ্ডুটা। একদিন একটা ইঁদুর কোনমতে ট্রাঙ্কে ঢুকে মুণ্ডুটা কেটে কুটে একেবারে নষ্ট করে দেয়। দেখে জর্জের মনে বড় ব্যথা লাগে। তাই বিমানক্ষেত্রের একপাশে একটা ছোট্ট গর্ত করে অনুষ্ঠান সহকারে কবর দেওয়া হয় মুণ্ডুটা। যাই হোক, এ তো সত্যিকার মানুষের একটা মুণ্ডু! উপসংহারে মন্তব্য করল জর্জ।

'চমৎকার খাওয়া হল!' আলোচনার মোড় ঘোরাতে বললাম আমি।

অন্ধকারে যখন বাড়ি ফিরছিলাম কেমন একটা বিশ্রী অনুভূতি হতে লাগল আমার। হেরমানের মাথার টুপিটা ওর কান পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে। ও অবশ্য পাহাড় থেকে আসা ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে টুপিটা টেনে কান ঢেকে দিয়েছে।

পরের দিন সকালে আমরা কনসাল জেনারেল মি. ব্রাইন ও তাঁর বউএর সঙ্গে গল্প করছিলাম একটা ইউকিলিপটাস গাছের নিচে বসে। শহরের বাইরে বাগান-বাড়িটা। ব্রাইন আদৌ মনে করেন না আমাদের পরিকল্পিত কুয়েভেডো যাবার পথে মারাত্মক কোন অঘটন ঘটবে—আমাদের মাথার আকারের কোন অদল-বদল হবে। তবে ওপথে চোর-ডাকাতের বড্ডই উপদ্রব। তিনি কাগজের কাটিং পড়ে শোনালেন। বর্ষা কেটে গেলে, শুকনো দিন এলেই সেনাদল পাঠান হবে—জায়গাটাকে চোর-ডাকাত মুক্ত করতে। জায়গাটা কুয়েভেডোর আশেপাশেই। কাজেই এখন সেখানে যাওয়া পাগলামির নামান্তর। কোন গাড়ি বা পথপ্রদর্শক পাওয়ার সম্ভাবনা দুরন্ত। তাঁর সঙ্গে যখন গল্প হচ্ছিল এমন সময় আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সামরিক সহযোগীর অফিসের একটা জিপকে ছুটে চলে যেতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় একটা

মতলব বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমরা আমেরিকান দূতাবাসে গেলাম—সঙ্গে কনসাল জেনারেলও ছিলেন। সামরিক সহযোগীর সঙ্গে দেখাও হল। খাকি পোশাকপরা ছিমছাম হালকা মেজাজের এক তরুণ—পায়ে ঘোড়ার চামড়ার বুট। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কিসের আশায় আমরা আন্দিজের চূড়োয় এসেছি অথচ স্থানীয় কাগজে প্রকাশিত আমাদের এখন ভেলায় চেপে সমুদ্র যাত্রার কথা।

তাঁকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললাম সব কথা। ভেলার কাঠ এখনও কুয়েভেডোর বনে সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আর আমরা এই মহাদেশের ছাদে এসে পৌছেছি কিন্তু কাঠের নাগাল পাচ্ছি না। মিলিটারী সহযোগীকে অনুরোধ করলাম (১) হয় আমাদের একটা বিমান ও দুটো প্যারাচুট ধার দিন, (২) নয়ত যে বনের পথঘাট চেনে, এমন একজন পথপ্রদর্শক ও জিপের ব্যবস্থা করুন।

আমাদের কথা শুনে ভদ্রলোক প্রথমে চুপচাপ বসে রইলেন—মুখে রা নেই। তারপর মাথাটা হতাশ ভাবে নাড়িয়ে মুখে হাসি টেনে বললেন, আমরা যখন তাঁকে তৃতীয় আর কোন প্রস্তাব দেইনি, দ্বিতীয় প্রস্তাবটাই মেনে নিচ্ছেন তিনি!

পরের দিন। সকাল সবে সোয়া পাঁচটা। একটা জিপ আমাদের হোটেলে ঢোকবার দরজায় এসে দাঁড়াল। ইনজিনিয়রদের ক্যাপ্টেন জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন। ভদ্রলোক ইকুয়াডোরের বাসিন্দা। তিনি আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। পথে কাদা থাক বা না থাক আমাদের কুয়েভেডো পৌছে দিতেই হবে—এই তাঁর উপর নির্দেশ। জিপ ভরতি গ্যাসোলিনের পাত্র। কারণ যে-পথে যেতে হবে, সে-পথে গ্যাসোলিনের পাম্প থাকা তো দূরের কথা, কোন ট্রাকের চাকার দাগও দেখতে পাব না। ক্যাপ্টেন বন্ধুটির নাম আগুরর্তো অ্যালেকসিস অ্যালভারেজ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত। ছুরি ছোরা আগ্নেয়াস্ত্র—কোন কিছুর অভাব নেই। চোর-ডাকাতের উপদ্রপের কথা শুনেছেন তিনিও। আমরা এসেছি সমুদ্র উপকূল থেকে কাঠ কেনবার কাঁচা পয়সা পকেটে নিয়ে নিরীহ সাধারণ ব্যবসাদারের পোশাকে। আমাদের সাজসরঞ্জাম বলতে এক ব্যাগ টিনে ভরতি খাবার, তাড়াহুড়ো করে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ক্যামেরা কিনে ফেলা হল আর একজোড়া খাকি ব্রিচেস, যা সহজে ছিঁড়বে না। এ ছাড়াও কনসাল জেনারেল তাঁর রিভলভার ও একগাদা গুলিও জোর করে গছিয়ে দিলেন—পথে যে-কোন বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করার জন্য। জনবিরল গলিপথ দিয়ে শোঁ-শোঁ গর্জন তুলে এগিয়ে চলল জিপ। তখনও চাঁদের মরা আলো সাদা রংকরা মাটির দেয়ালে একটা বিবর্ণ আভার সৃষ্টি করছে। এইভাবে আমরা মুক্ত প্রান্তরে এসে পৌছলাম। তারপর দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বালিপথ ধরে এগিয়ে চলল আমাদের জিপ মাথা-ঝিমঝিম-করা গতিতে।

পাহাড়ী পথে যেতে বেশ চমৎকার লাগছিল। পাহাড়ী গাঁ ল্যাটাকুংগাতে পৌছে

গেলাম। আদিবাসীদের বাড়িগুলোর কোন জানলা নেই। একটা সাদা রংকরা গীর্জার চারপাশে বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘিরে আছে। গীর্জার বাগানে অসংখ্য নারকেল গাছ। এবার আমরা একটা খচ্চরদের যাওয়া-আসার পথ ধরলাম। তরঙ্গায়িত সে-পথ এঁকে বেঁকে পাহাড় ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলে গেছে আন্দিজ পর্বতমালার দিকে। এমন একটা জগতে এসে পৌছলাম স্বপ্নেও যার কল্পনা করতে পারিনি। এটা আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের একান্ত নিজস্ব জগত। সূর্যের পূব দিকে এবং চাঁদের পশ্চিমে—স্থান ও কালের সীমারেখা পেরিয়ে অবস্থিত। এতখানি পথ এলাম—না দেখলাম একটা গাড়ি বা গাড়ির চাকার দাগ। পথ চলতি লোক বলতে খালি পা মেষপালকের দল। গায়ে উজ্জ্বল রমণীয় রংয়ের পঙ্কোস। তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দৃঢ়পা মর্যাদাপূর্ণ লামার দল। এলোমেলো চলেছে। মাঝে মাঝে কোন পরিবারের সকলেই পথে বেরিয়ে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে পরিবারের যে মাথা অর্থাৎ স্বামী খচ্চরের পিঠে চড়ে সবার আগে আগে যায়। আর তার বউ ছোট্ট খাট মানুষটি—খচ্চরের পিছনে পায়ে হেঁটে চলে। যত টুপি আছে সব মাথায় চাপিয়ে দেয় আর পিঠে বাঁধা থলেতে থাকে সবচেয়ে ছোট খোকাটি। পথ চলার সময় সারাক্ষণ আঙুল সক্রিয় থাকে অর্থাৎ উল বোনে। গাধা আর খচ্চররা মন্থর গতিতে পিছন পিছন আসে—পিঠে ডালপালা আর হাঁড়ি কুড়ি বোঝাই।

যতই এগিয়ে চলি স্পানিশজানা ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যাও বিরল হতে থাকে। ক্রমশঃ ওদের সঙ্গে বাতচিত চালাবার ক্ষমতাও আমাদের সীমিত হয়ে আসতে লাগল। এখানে-ওখানে পাহাড়ের গায়ে এক একগুচ্ছ কুটীর দেখতে পাওয়া যায়। মাটিলেপা কুটীরের সংখ্যাও আবার বিরল হয়ে আসছে। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু শুকনো ঘাস পাতা ডালপালায় তৈরি কুটীর আর রোদে পোড়া লোলচর্ম মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় এরা যেন মাটি-মায়ের হাতে গড়া মানুষ। ভুঁই ফুঁড়ে উঠেছে। সূর্যের আলোয় তপ্ত আন্দিজ পাহাড়ের শিলাগাত্রে রুটি সেঁকা অবস্থা। তারা দুরারোহ পর্বত-পার্শ্ব, ভৃগুমূলে ঢালুভাবে অবস্থিত পাথরের স্তূপ ও পাহাড়ী চারণভূমির সমগোত্রীয়। পাহাড়ী ঘাসের মতোই স্বাভাবিক। প্রকৃতির সৃষ্টি। নিজস্ব সম্পদ বলতে যা আছে, অতি তুচ্ছ। আকারে তারা বেঁটেখাটো। কিন্তু এই পাহাড়ী মানুষেরা বনের পশুদের মতোই অদ্ভুত শক্তিধর। কষ্টসহিষ্ণু—আদিম মানুষদের মতোই শিশুসুলভ। কথা বলার চেয়ে প্রাণ খুলে হাসতে ভালোবাসে। তুষারের মতো সাদা দাঁত—চোখে মুখে স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য-দীপ্তি। এ এমন জায়গা যেখানে কোন সাদা মানুষের একটা পাই পয়সাও খোয়া যায়নি—উপায়ও করেনি কেউ একটা পাই। পথের নিশানা বা দিক-চিহ্ন কিছু নেই। যদি কোন টিনের কৌটো বা একফালি কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, অমনি কেউ না কেউ কুড়িয়ে নেবে তাদের—গৃহস্থালির হয়ত কাজে লাগবে।

রোদে-পোড়া ঢাল বেয়ে আমরা কখনও উপরে উঠছি আবার নেমে আসছি। উপত্যকায় মরুপ্রান্তরের বালি, ফণীমনসার গাছের ছড়াছড়ি কিন্তু কোন ঝোপঝাড় গাছ গাছালির চিহ্নমাত্র নেই। শেষ পর্যন্ত আমাদের গাড়ি এসে পৌছল সবথেকে উঁচু চূড়োর কাছাকাছি। তুষারে ঢাকা। আর বাতাসের কামড়ও এত তীক্ষ্ণ যে রক্ত জমাট হয়ে যাবার মতো অবস্থা। গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হল যাতে না ঠাণ্ডায় জমে যাই। জঙ্গলের সেই আতপ্ত আবহাওয়ার জন্য মন ক্ষুদিত হয়ে উঠেছে—যখন শুধু শার্ট গায় দিয়ে থাকব। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে উপলব্যথিত দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এলাম। ঘাসে গা-ঢাকা শৈলশিরা। কোথায় পরবর্তী পথের নিশানা? আমরা পশ্চিম শৈল-দেয়ালের কাছে এসেছি। আন্দিজ পর্বতমালা খাড়া নিচের দিকে নেমে গেছে। নড়বড়ে শৈল পাটাতন, শৈলশিরা, গভীর গিরিসঙ্কটের ছড়াছড়ি। এর ভিতর দিয়ে খচ্চরদের আনাগোনার পথ। বন্ধু আগুর্তোর ওঁর সমস্ত দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত আছি—স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে বসে আছে সে—খাড়া ও উঁচু গিরিচূড়ার কাছে আসতেই মাথাসুদ্ধ গলাটা বাইরে বের করে একবার চারদিক দেখে নিচ্ছে। হঠাৎ দমকা হাওয়ার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। আমরা আন্দিজ পর্বতমালার সব থেকে বাইরের চুড়োয় এসে পৌছে গেছি। এর পর পাহাড়টা কতকগুলো খাড়া ও উঁচু পর্বত চূড়ায় বিভক্ত হয়ে সোজা নিচের অরণ্যানীর দিকে নেমে গেছে—আমরা যেখানে আছি সেখানে থেকে বার হাজার ফুট নিচে এক অন্তহীন রসাতলের দিকে নেমে গেছে। কিন্তু অরণ্যসমুদ্রের মাথা ঝিমঝিম-করা হতবুদ্ধিকর দৃশ্যে প্রতারিত হলাম। কারণ ধারের কাছে পৌছতেই দেখি ডাইনীর সুবৃহৎ কটাহ থেকে উত্থিত বাষ্পের মতো ঘূর্ণায়মান ঘন মেঘের তীরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এখন আমাদের গাড়ি বিনা বাধায় দ্রুত নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল। একটু বেসামাল হলেই পাশের অতলস্পর্শী খাদে পড়ে মৃত্যু অনিবার্য। বাতাস কখনও আদ্র, কখনও বা বেশ উত্তপ্ত। এ ছাড়াও নিচের বনভূমি থেকে স্নানাগারের বিপজ্জনক উষ্ম বাষ্পের মতো ভারী বাতাস উঠে আসছে উপরে।

এর পর শুরু হল বৃষ্টি। প্রথমে ঝিরঝিরে—তারপর সবেগে, ড্রামপেটানোর কাঠির মতো জোরে আঘাত করতে লাগল জিপের গায়ে। আমরা যেন পিছনের শুষ্ক পাহাড়ী উপত্যকা থেকে জলধারার মতো ভেসে এলাম আর-এক জগতে, যেখানে নুড়িপাথর কাঠকুটো মেশানো মাটির ঢাল বেশ নরম। ঘাস আর শ্যাওলার জাজিম পাতা। লতাপাতার বেড়াজাল মাঝে মাঝে বিরাট সবুজ ছাতার আকার নিয়ে পাহাড়ের গা থেকে ঝুলছে দেখা যায়। গা থেকে টিপ টিপ করে জল ঝরছে। এইবার দেখা দিতে লাগল গাছগাছালি—বনভূমির দুর্বল সীমান্ত প্রহরী। গাছের ডালে দাড়ি গোঁফের মতো শ্যাওলার আস্তীন। লতানে গাছ গা বেয়ে উঠেছে—ঝুলছে ঝালরের মতো।

চারদিকেই গব-গব আর ছপ-ছপ শব্দ। ঢাল আর তেমন গড়ানে নয়, ঘন বন সবুজ বনস্পতির পাহারাদার নিয়ে দ্রুততর ঘিরে ধরছে চারদিক থেকে। গ্রাস করতে আসছে আমাদের জিপকে। জমে-থাকা জল কাদা ভরতি মাটি থেকে গাড়ির চাকার চাপে ছিটকে আসছে। বাতাস আর্দ্র অথচ গরম—উদ্ভিজ্জের বিচিত্র গন্ধে ভারী।

আমরা যখন পাহাড়ের টিলার উপর নারকেলের পাতার ছাউনি-দেওয়া এক থোকা কুটীরের কাছে এসে পৌছলাম, তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। টিপ টিপ করে পড়া গরম জলের মধ্যে আমরা জিপ থেকে নেমে একটা শুকনো ছাদের নিচে আশ্রয় নিলাম। কুটীরে ঢুকতেই সঙ্গে সঙ্গে মাছির ঝাঁকের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল—কিন্তু পরের দিনের জল প্লাবনে তারা ডুবে গেল। কলা আর নানা ফলে জিপ বোঝাই করে আমরা বন জঙ্গলের মধ্যদিয়ে চলেছি ঢালুর দিকে। নিচে আরও নিচে। আমাদের তো ধারণা হয়েছিল আমরা অনেকক্ষণ সমতলে পৌছে গেছি। এবার কাদার দাপট বেড়ে গেল, কিন্তু আমাদের গতিরোধ করতে পারল না। চোর-ডাকাতরা যে কোথায় কোন্ অদৃশ্য অন্তরালে গা ঢাকা দিয়ে আছে, জানি না।

এমন সময় বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এক প্রশস্ত নদী-প্রবাহ আমাদের জিপের গতিরোধ করল। কর্দম ও ঘোলা জলের নদী। কাদায় কামড়ে ধরেছে জিপ। না পারছি যেতে নদীর উজানে, না পারছি যেতে ভাঁটির দিকে নদীর তীর ধরে। কাছেই খোলামেলা জায়গায় লতাপাতার ছাউনি দেওয়া একটা কুঁড়ে ঘর। কয়েকজন দোআঁশলা আদিবাসী একটা জাগুয়ারের গায়ের চামড়া টানটান করে দেয়ালের গায়ে রোদে শুকোতে দিচ্ছে। আশেপাশে কুকুর আর মুরগিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোকোয়ার বীচি উঠোনে ছড়ানো। কতকগুলো মুরগি সেই ডাঁইকরা বীচির মাথায় চেপে বীচিগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে মজা উপভোগ করছিল। শেষপর্যন্ত জিপটা যখন লাফাতে লাফাতে সেখানে এসে থামল, জায়গাটা যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ স্পেনীয় ভাষা বলতে পারে। ওদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম এ জায়গাটার নাম রাইও প্যালেনকিউ—কুয়েভেডো এর ঠিক উলটো দিকে। নদীর উপর কোন সাঁকো নেই। নদী বেশ গভীর ও খরস্রোতা। তবে তারা আমাদের ও জিপটা ভেলায় পার করে দিতে পারে। নদীর ঘাটে বাঁধা আছে সেই অদ্ভুত জলযানটা। আমাদের হাতের মতো মোটা বাঁকানো কাঠ, উদ্ভিদের আঁশের দড়ি ও বাঁশ দিয়ে বাঁধা হালকা ভেলা জাতীয় যান। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে আমাদের জিপটার দ্বিগুণ হবে। জিপের চাকার নিচে তক্তা পেতে এবং প্রাণটা হাতের মুঠোয় ধরে কোন মতে এসে ভেলায় চেপে বসলাম—ভেলাটা কাদা জলে দেবে গেল। কিন্তু জিপ, আমাদের ও চারজন অর্ধ উলঙ্গ চকলেট রংয়ের আদিবাসীর ভার অক্লেশে বহন করল—ডুবে গেল না। লম্বা লগি ঠেলে আমরা ভেসে পড়লাম।

'বালসা কাঠের ভেলা ?' আমি ও হেরমান একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম বিস্ময়ের সুরে। চারজনই মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, বালসা কাঠ।' অতি অশ্রদ্ধার সঙ্গে কাঠের গায়ে লাথি হাঁকড়াল লোকটা।

ভেলাটা স্রোতের টানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীরা লগির সাহায্যে ভেলাটাকে কোনাকুনি ভাবে অপর পাড়ে নিয়ে লাগাল। এখানে নদীর জল অপেক্ষাকৃত শান্ত। বালসা গাছের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়—বালসা ভেলায় চড়াও এই প্রথম। ভেলাটাকে অনেক দূর পর্যন্ত তীরের উপর টেনে তোলা হল—আমরা বিজয় গর্বে মটোরে কুয়েভেডো পৌছলাম। দু সারি আলকাতরা লেপা কাঠের বাড়ির পর বাড়ি—নারকেলের পাতার ছাউনি-দেওয়া চালের উপর দুটো নিশ্চল শকুন বসে। বাড়ির সারির মাঝখান দিয়ে রাস্তা। এই হল সমস্ত জায়গাটার চেহারা। আমাদের দেখে লোকগুলো হাতে যা ছিল ফেলে দিয়ে ছুটে এল। কালো ও বাদামী রংয়ের ছেলে বুড়ো কাচাবাচ্চা দরজা জানলা খুলে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। জিপটা দেখতেও অনেকে ছুট লাগাল। মুখে কথার তুবড়ি ফুটছে। ভয় ধরানো চেহারা। কেউ জিপের উপর উঠে বসল, কেউ তলায় ঢুকে গেল—কেউ বা চারদিক ঘিরে দাপাদাপি করতে লাগল। আমরা আমাদের যা কিছু পার্থিব সম্পদ আছে সবলে আঁকড়ে ধরে রইলাম। আগার্তো মরিয়া হয়ে জিপের স্টিয়ারিং ঘুরোতে চেষ্টা করতে লাগল। জিপের একটা চাকা ফুটো হয়ে গেল—একপাশে কাত হয়ে পড়ল জিপটা। আমরা কুয়েভেডোয় পৌছেছি—এই অত্যুৎসাহী সংবর্দ্ধনার অত্যাচার সইতেই হবে বইকি।

ডন ফেডিরিকোর বালসা গাছের বাগান আর একটু দূরে নদীর ভাঁটির দিকে। জিপটা আগার্তো, হেরমান ও আমাকে নিয়ে লাফাতে লাফাতে দু'পাশের আমগাছের সারির ভিতর দিয়ে একটা উঠোনে এসে পৌছল। এক শীর্ণকায় বনবাসী এগিয়ে এল ছুটতে ছুটতে—সঙ্গে তার ভাগনে অ্যাংগেলো। এই ছেলেটিও থাকে তার সঙ্গে এই বন্য পরিবেশে। ডন গুস্তাভোর দেওয়া বার্তা শোনালাম তাকে, জিপটা একলা পড়ে রইল উঠোনে। আবার নতুন করে শুরু হয়ে গেল ধারাবর্ষণ। ডন ফেডিরিকোর বাড়িতে রীতিমতো ভোজ খাওয়া হল। একটা বড় উনানের উপর কচি শুয়োরের ও মুরগির মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেকের প্লেটে স্তূপাকার স্থানীয় ফল। খেতে খেতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানালাম তাকে। বাইরে অবিরাম জল ঝরছে। বাতাসের ঝাপটায় ভেসে আসছে ফুলের ও মাটির গন্ধ জাল-দেওয়া জানলা ভেদ করে। আমাদের বক্তব্য শুনে ফেডিরিকো কিশোরের মতো প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল। ছোটবেলা থেকেই সে বালসা কাঠের ভেলার কথা শুনে এসেছে। পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। সমুদ্রের উপকূলে থাকত তখন। পেরু থেকে আদিবাসীরা বড় বড় ভেলায় চেপে সমুদ্র পথে মাল বেচতে আসত, গুয়েয়াকুইল-এ। সেই ভেলার মাঝখানে বাঁশের ছাউনি

দেওয়া ঘরে টনটন শুকনো মাছ থাকত—আর থাকত বউ ছেলেমেয়ে কুকুর-মুরগিরাও। তারা যে বড় বড় বালসা কাঠের কাণ্ড ব্যবহার করত, এই বৃষ্টি-বাদলে তা পাওয়া বেশ দুষ্কর হবে। যা বৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে বালসা গাছ জন্মায় এই কাদাজল ভেঙ্গে সেখানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব—এমন কি ঘোড়ার পিঠে চড়েও নয়। অবশ্য ডন যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। বাংলোর কাছাকাছি বনেও কিছু কিছু বালসা গাছ থাকতে পারে। আর আমাদের তো অনেক গাছের দরকার নেই।

বিকেলের দিকে বৃষ্টিপড়া সাময়িক বন্ধ হল। আমরাও বাংলোর চারপাশে ঢুঁড়তে বের হলাম। ডন ফেডিরিকো দেখলাম নারকেলের মালাই করে সবরকম বুনো অর্কিড গাছের চারা ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে। দুষ্প্রাপ্য এইসব উদ্ভিদ থেকে অপূর্ব গন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হেরমান নিচু হয়ে একটার পাতায় নাক লাগিয়ে গন্ধ শুঁকছিল এমন সময় একটা চকচকে লাউডগা সাপ তার মাথার উপরের পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। চোখের পলকে অ্যাংগেলোর হাতের চাবুক চমকে উঠল। সাপটা মাটিতে পড়ে গিয়ে গা মোচড়াতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে কাঁটাযুক্ত লাঠি দিয়ে সাপটার গলা মাটিতে চেপে ধরে গুঁড়িয়ে দিল সে।

'যমদূত,' বলল অ্যাংগেলো—দুটো বাঁকানো বিষদাঁত দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল কি বোঝাতে চায় সে।

এরপর এমন হল যে আমরা প্রত্যেক পাতার আড়ালেই বিষাক্ত সাপের বিভীষিকা দেখতে লাগলাম। ঘরে ফিরে এলাম। একটা কাঠিতে মরা সাপটাকে ঝুলিয়ে অ্যাংগেলো আমাদের পিছনে আসতে লাগল। হেরমান সাপটার চামড়া ছাড়াতে বসে গেল। ডন বিষাক্ত সাপ আর অজগর সম্বন্ধে নানা সম্ভব-অসম্ভব গল্প বলতে লাগল। তারা যেমন মোটা তেমনি লম্বা। হঠাৎ আমাদের নজর আকৃষ্ট হল দেয়ালের গায়ে গলদা চিংড়ির মতো বিরাট দুটো কাঁকড়া বিছের ছায়ার দিকে। তারা পরস্পরের দিকে তেড়ে গেল—মেতে উঠল জীবন-মরণ সংগ্রামে। সাঁড়াশির মতো তাদের দাঁড়া দুটো আক্রমণোদ্যত। পিছনের লেজটা উঁচু হয়ে উঠেছে পিঠের উপর। লেজেতে প্রস্তুত রয়েছে বিষের থলি। শত্রুর দেহে ঢেলে দেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায়। সে এক বীভৎস দৃশ্য। তেলের বাতিটা সরাতে দেখলাম অতি সাধারণ দুটো কাঁকড়া বিছে—একটা আঙুলের চেয়ে বড় হবে না। অথচ কি বিরাট অতি-প্রাকৃত ভৌতিক ছায়া পড়েছিল দেয়ালের গায়ে।

ডন ফেডিরিকো হাসতে হাসতে বলল, 'লড়ালড়ি করুক ওরা। একটা আর একটাকে মেরে ফেলবে। বিজয়ী বীর থাকুক এ ঘরে আরশুলার পালকে তাড়াতে। তবে শোয়ার আগে মশারীটা বিছনার নিচে ভালো করে গুঁজে দেবেন যাতে না ভিতরে ঢুকতে পারে। পোশাক-আশাক পরবার আগে বেশ ঝেড়েঝুড়ে নেবেন। ব্যস্, আর

কোন ভয় নেই। কতবার কাঁকড়াবিছার কামড় খেয়েছি কিন্তু মরিনি,' হাসতে হাসতে মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিল।

রাতে বেশ গভীর ঘুম হল। তবে যতবারই বাদুড় বা কৃকলাসের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গেছে, ভেবেছি বিষাক্ত কোন প্রাণী আমার বালিসের কাছাকাছি কোথাও আঁচড়া-আঁচড়ি করছে।

পরের দিন আমরা খুব ভোরে বের হয়ে গেলাম বালসা গাছের খোঁজে।

'জামাটামা ঝেড়ে নিয়েছেন তো?' বলল আগার্তো। বলতে না বলতেই তার জামার আস্তিন থেকে একটা কাঁকড়া বিছে মাটিতে পড়ে ছুটে দেয়ালের একটা গর্তে ঢুকে পড়ল।

সূর্য উঠলে ডন ফেডিরিকো তার লোকজনদের নানান দিকে পাঠাল। তারা ঘোড়ায় চেপে দেখতে গেল, রাস্তার কাছাকাছি কোথাও বালসা গাছ আছে কিনা। আমাদের দলে ছিলাম আমি, হেরমান আর ডন ফেডিরিকো। একটা ফাঁকা জায়গায় এলাম আমরা—ডন জানত এখানটায় বিরাট এক বালসা বনস্পতি আছে—আশে-পাশের গাছের মাথার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। গুঁড়ির বের তিন ফুট। পলিনেশীয় পদ্ধতিতে গাছটা স্পর্শ করার আগে তার নামকরণ করলাম কু। কু আমেরিকার পলিনেশীয়দের এক প্রাচীন দেবতার নাম। তারপর আমরা বালসা গাছের গুঁড়িতে কুড়ুল চালালাম। বন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কুড়ুলের আঘাতে। কিন্তু রসাল বালসা গাছ কাটা ভোঁতা দা দিয়ে কর্ক কাটার সামিল। আমাদের প্রতিটি আঘাত প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। কয়েকবার আঘাত করার পর হেরমান এগিয়ে এল আমাকে বিশ্রাম দিতে। এইভাবে কিছুক্ষণ পর পর হাত বদল করতে লাগলাম। কাঠের কুচি ছিটকে পড়তে লাগল এদিক ওদিক আর আমাদের গা বেয়ে ঘামের ধারাবর্ষণ নামল। একেই তো বনের মধ্যে বেশ গরম!

বেলা গড়িয়ে গেল—তবুও কু মোরগের মতো তখনও এক পায়ে দাঁড়িয়ে। কুড়ুলের প্রতিটি আঘাতে কাঁপছে থর থরিয়ে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে টলমল করতে করতে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল পাশের গাছপালার উপর। দৈত্যকায় বনস্পতির পতনে তার চাপে ছোট ছোট গাছ গাছালিও ভেঙ্গে এসে পড়ল মাটিতে। ডালপালা ছাঁটাই করে আমরা কাণ্ডের ছাল ছাড়াতে লাগলাম এঁকে বেঁকে কেটে—অনেকটা আদিবাসীদের কায়দায়। হঠাৎ হেরমান কুড়ুল ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল বাতাসে—অনেকটা পলিনেশীয়দের মতো রণনৃত্যের ভঙ্গিতে। হাত দুটো পায়ে চেপে ধরা। তার ট্রাউজারের ভিতর থেকে কাঁকড়াবিছের মতো বড় একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে বের হয়ে এল। চকচক করছে। লেজের ডগায় হুল। মাথাটা গলদার চিংড়ির মতো বড়। মাটিতে পা দিয়ে থেঁতলানো অসম্ভব।

'কঙ্গো,' খেদের সঙ্গে বলল ডন, 'এরা কাঁকড়া বিছের চেয়েও জঘন্য। তবে সুস্থ লোকের পক্ষে মারাত্মক নয়।'

হেরমান কয়েকদিন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রইল। কিন্তু তাই বলে ঘোড়ার পিঠে চেপে বালসার খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে একটুও পিছপা হল না। মাঝেমাঝেই কোথাও না কোথাও গাছ ভেঙ্গে পড়ার দমাস শব্দ শুনতে পাচ্ছি অহল্যা বনভূমিতে। সে-শব্দ শুনে খুশিতে মাথা দোলাত লাগল ডন। ঐ শব্দের অর্থই হল কোন দোআঁশলা আদিবাসী ভেলার জন্য গাছ কেটে ভূমিসাৎ করেছে। কয়েকদিনের মধ্যে কু-এর সঙ্গে যোগ হল কেন, কামা, ইলো মাউরি, রা, রঙ্গি, পাপা, টারাঙ্গা, কুরা, কুকারা, হিটি—বারটা বিরাট বালসা বনস্পতি। প্রত্যেকটিরই কোন না কোন পলিনেশীয় উপকথার বীর পুংগবের নামে নামকরণ করা হয়েছে। পেরু থেকে এরা সবাই টিকির সঙ্গে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল। গাছের কাণ্ডগুলো রসে চকচক করছে। প্রথমে তাদের ঘোড়ার সাহায্যে ও পরে ডন ফেডিরিকোর ট্র্যাকটরের সাহায্যে বাংলোর সামনে নদীর তীরে এনে জমা করা হল।

এর রসাল কাণ্ডগুলো কিন্তু কর্কের মতো হালকা নয়। প্রতিটি কাণ্ডের ওজন হবে প্রায় এক টন। তারা কেমন জলে ভেসে থাকে দেখবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত। একটার পর একটা গড়িয়ে এনে তীরের একেবারে ধারে পর পর সাজিয়ে রাখা হল। লতানে গাছ দিয়ে একটা শক্ত দড়ি পাকিয়ে কাণ্ডগুলো আঁট করে বাঁধলাম যাতে না তারা স্রোতের টানে ভাঁটির দিকে ভেসে চলে যায়। তারপর এক এক করে জলে ফেলতে লাগলাম। ঝপাং করে শব্দ উঠল। ঘুরপাক খেয়ে ভাসতে লাগল জলে—যতটা জলের তলায় ঠিক ততটা জলে উপরে ভাসমান। আমরা কাণ্ডের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে গেলাম কিন্তু কোন হেরফের হল না। বনে গাছ থেকে যে লতাগুলো (তাদের বলে লিয়ানা) ঝোলে তাদের পাকিয়ে শক্ত করে বেঁধে দুটো সাময়িক ভেলা করা হল। একটা ভেলা আর একটাকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর দুটো ভেলাই বাঁশ আর লিয়ানায় বোঝাই করলাম যা পরে লাগবে। আমি আর হেরমান ভেলায় চাপলাম—সঙ্গে রইল দুজন দোআঁশলা। আমরা তাদের ভাষা বুঝি না—তারাও বোঝে না আমাদের ভাষা।

ভেলার দড়ি কেটে দিতেই উদ্দাম জলস্রোতের কবলে পড়ে ভেলা তীব্র গতিতে ছুটে চলল ভাঁটির দিকে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বাংলোর সামনে নদীর ধার ঘেঁষে সুজন বন্ধুরা দাঁড়িয়ে—হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। তারপর আমরা কলা-পাতায় ঢাকা ছোট্ট ছাউনিতে ঢুকে পড়লাম গুঁড়ি মেরে। ভেলা চালানোর ভার দুজন বাদামী রংয়ের নিপুণ ভেলা চালকের উপর। তাদের একজন বসেছে সামনের দিকে আর একজন পিছনে। দুজনের হাতেই বিরাট বৈঠা। তারা তীব্রগতি

স্রোতধারার মধ্যে নিরুদ্বেগ চিত্তে বসে আছে। ভেলাটা নাচতে নাচতে এঁকে বেঁকে চলেছে নিমজ্জিত গাছপালা আর বালুময় তীরের মাঝখান দিয়ে।

নদীর দু-তীরে বনভূমি দাঁড়িয়ে—নিরেট নিশ্ছিদ্র দেয়ালের মতো। যেতে যেতে দেখলাম—তোতা, বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের কত রকম পাখি ঘন পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। দু-একবার কুমীরও দেখলাম ডাঙ্গা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাদা-জলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর যাকে দেখলাম তাকে দানবের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। ইগুয়ানা বা দানবীয় কৃকলাস। কুমীরদের মতোই বড়—পিঠের উপর ঝালরের মতো খাঁজকাটা চামড়া সাজান। এদের গলাটা কুমীরের তুলনায় বড়। নদীর পাড়ে ঝিমুচ্ছিল—যেন সেই প্রাগৈতিহাসিক দিন থেকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পাশ দিয়ে ভেলা চলে গেল—একটুও নড়ল না। দাঁড়ী ইংগিতে জানাল—আমরা যেন গুলিটুলি না চালাই। কিছুক্ষণ পরে তিন ফুট একটা ইগুয়ানার বাচ্চা দেখলাম। গাছের একটা ডাল ঝুঁকে এসে পড়েছে জলের উপর। আমাদের ভেলাটা তার তলা দিয়ে যেতে দেখে সেটা ডালটার উপর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। নিরাপদ স্থানে পৌছতেই দৌড়ানো বন্ধ করে থেমে গেল। ঝকঝক করছে গা—নীল ও সবুজের চিকচিকানি। আমাদের দিকে সাপের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল অপলক চোখে। আমাদের ভেলা তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। এর পর একটা ফার্নগাছ ভরতি টিলা দেখতে পেলাম। তার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে—হ্যাঁ, বৃহত্তম একটা ইগুয়ানা। বুক পিঠ উঁচিয়ে আকাশের পটভূমিকায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক কালো পশ্চাৎপটে আঁকা পাথরে খোদাই করা একটা চীনা ড্রাগন। পিঠে চামড়ার ঝালর। টিলাটার নিচ দিয়ে অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরে আমরা যখন চলে যাচ্ছিলাম, মাথাটা একবার ঘুরিয়েও দেখল না। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বনে।

ভাঁটির দিকে আরও কিছুটা যেতে ধোঁয়ার গন্ধ এসে নাকে ঝাপটা মারল। ঐ তো দেখা যাচ্ছে নদীর ধারে খড়ের ছাউনি দেওয়া কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। ভেলায় চড়া লোকদের দিকে ক্রূর দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তারা। আদিবাসী নিগ্রো আর স্পেনীয়দের রক্তের অনমুকূল মিশ্রণ। তাদের নৌকোগুলো তীরের উপর টেনে তোলা। মস্ত বড় গাছের গুঁড়ি কুঁদিয়ে তৈরি করা শালতি বা ক্যানু।

খাওয়ার সময় হলে আমরা সঙ্গী দুজনকে ভেলা বাওয়া থেকে অব্যাহতি দিলাম। ভিজে মাটি দিয়ে তৈরি উনুনের স্বল্প আগুনে তারা মাছ ও রুটিফল ভাজল। সিদ্ধ ডিম, মুরগির মাংস ও নানা ফলফলাড়িও খাবারের মেনুতে স্থান পেল। ভেলা নিজেই ভেসে চলেছে বনের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে—বেশ তীব্র গতিতেই। যদি এখন জল উঠে ভেলা প্লাবিত করে দেয় আমরা কি করতে পারি? বৃষ্টির বেগ যত বাড়তে থাকে স্রোতের বেগও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল নদীর বুকে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কর্ণবিদারী অর্কেস্ট্রা। টোড. কোলা ব্যাঙ, ঝিঁঝিঁ পোকা ও মশারা নানা স্বরে শব্দের জল-তরঙ্গ বাজাতে লাগল। মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে বন-বিড়ালের কর্কশ ডাকও ভেসে আসছে। নিশাচরদের তাড়নায় ভয়ার্ত পাখিরা ডানা মেলে ভেসে পড়ছে বাতাসে। দু একবার দূরে আদিবাসীদের কুঁড়ের আলো সরে গেল চোখের সামনে দিয়ে। সুউচ্চ কণ্ঠের চেঁচামেচি ও কুকুরের ডাকও শুনতে পেলাম যেতে যেতে। কিন্তু তারাভরা আকাশের নিচে আমরা কটি প্রাণী চুপচাপ বসে আছি আর কানে ভেসে আসছে অবিশ্রাম অর্কেস্ট্রা। চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। শেষপর্যন্ত ক্লান্তি ও বৃষ্টি তাড়িত হয়ে ভেলার উপর পাতার ছাউনি-দেওয়া ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ঘুমোতে হবে এবার—হলস্টারে আলগা করে রাখা রইল রিভলভার।

যতই নদীর ভাঁটির দিকে এগোচ্ছি, কুঁড়ের সংখ্যাও ততই বাড়ছে—বাড়ছে আবাদী জমির পরিমাণও। ক্রমে গ্রামের পর গ্রাম দেখা যেতে লাগল, নদীর ধারে ঘাটে বড় বড় লগির সঙ্গে নানা আকারের শালতিও বাঁধা আছে। মাঝে মাঝে কলা বোঝাই বালসা কাঠের ভেলাও দেখতে পাচ্ছি। বাজারে বেচতে নিয়ে যাওয়া হবে।

যখন প্যালেনকিউ এসে রাইও গুয়েয়াসের সঙ্গে মিলিত হল, জল এত উঁচু হয়ে উঠতে লাগল যে ভিনসেস ও গুয়েয়াকুইলের মধ্যে স্টীমারগুলো খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে উপকূল ঘেঁষে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। সময় এখন অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা দু'জনে তাই একটা বাষ্প চালিত স্টীমারের ঝুলন্ত বাঙ্কে চেপে বসলাম। বাদামী বন্ধু দুজন যেমন চলেছে, বালসা কাঠ নিয়ে ভেলা চালিয়ে আসবে পরে।

গুয়েয়াকুইলে এসে হেরমান ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। হেরমান গুয়েয়াসের মুখে অপেক্ষা করবে। ভেলা এলে থামাবে, উপকূল ধরে চলাচলকারী স্টীমারে কাঠগুলো চাপিয়ে পেরুতে নিয়ে যাবে। সেখানে প্রাচীনকালে আদিবাসীরা যে-ভাবে ভেলা তৈরি করেছিল, তার বিশ্বস্ত অনুকরণে ভেলা তৈরি করাবে। আমি বিমানে চেপে পেরুর রাজধানী লিমাতে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে আগে ভাগে একটা সুযোগ্য স্থান নির্বাচিত করে রাখব যেখানে ঐ ভেলা তৈরি করা হবে।

বেশ উঁচু দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ধরে বিমানটি উড়ে চলেছে। অনেক নিচে একদিকে পেরুর শৈলময় পর্বতমালা, আর একদিকে সমুদ্রের অথৈ জল থৈ-থৈ করছে। এখান থেকেই আমরা ভেলায় চেপে সমুদ্র পাড়ি দেব। বিমানে উঁচু থেকে দেখলে সমুদ্রকে সীমাহীন মনে হয়। সমুদ্র ও আকাশ একাকার হয়ে গেছে। কোথায় কোন্ দিকে দিক্-চক্রবাল বোঝা যায় না। পশ্চিমে দূরে—কত দূরে কে জানে! আমার কেমন মনে হল সেই অদৃষ্টপূর্ব দিগন্তই শুধু নয়, এই ধরনের অনেক সমুদ্র-দিগন্ত পেরিয়ে যা পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিকার করে আছে, তবেআমরা স্থলভাগে—

পলিনেশিয়ায় পৌছতে পারব। কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি আমার কল্পনাকে কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করলাম—আমরা যেন নিচের এই অসীম নীল সমুদ্রে বিন্দুর মতো ভেলায় ভেসে চলেছি। কিন্তু তাড়াতাড়ি মন থেকে এই কল্পনাটা তাড়িয়ে দিলাম। কারণ প্যারাচুট নিয়ে কোনমতে ঝাঁপ দেবার আগে প্লেনের মধ্যে এইরকম নানা দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে মনে।

লিমা পৌছেই আমি মটোরে চেপে ক্যালাও বন্দরে গেলাম একটা সুবিধে মতো জায়গার খোঁজ করতে—যেখানে ভেলাটা তৈরি করা হবে। পৌছে দেখি, জাহাজ, ক্রেন ও গুদামঘরে সারা বন্দরের কুঁচকিকণ্ঠা অবস্থা। কাস্টম কর্মচারীদের অফিস আর শেডে ঠাসাঠাসি। অদূরে সমুদ্র-উপকূলে জায়গা থাকলেও সেখানে আবার স্নানার্থীদের এমন ভিড় যে আমরা পিছন ফিরলেই অনুসন্ধিৎসু লোকেরা ভেলা নিয়ে টানাটানি করবে—এটা-ওটা নাড়ানাড়ি করে সবকিছু তছনচ করে দেবে। ক্যালাও এখন পেরুর একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী। লোকসংখ্যা সত্তর লক্ষ। সাদা ও বাদামী উভয় বর্ণের লোক আছে এখানে। পেরুর ভেলা তৈরির দিন বিগত। ইকুয়াডোরের তুলনায় এখানকার অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। একটি মাত্র সম্ভাবনার কথা আমার মনে ধরল। উঁচু কংক্রিটের দেয়াল-ঘেরা নৌবাহিনীর পোতাশ্রয়ে ঢুকে পড়া। এখানে সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী লোহার ফটকের ভিতরে পাহারা রত। তারা ভীতিসঞ্চারী সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ে মারতে লাগল আমার দিকে আর ভরঘুরে লোকেদের দিকে যারা অলসভাবে ঘোরাফেরা করছে গেটের বাইরে। একবার ভিতরে ঢুকতে পারলে সবদিক থেকে নিরাপত্তা।

ওয়াশিংটনে পেরুর নৌদপ্তরের সহকারী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেছি—তাঁর পরিচয় পত্রও আছে আমার কাছে। আমি পরদিনই নৌবাহিনীর নির্বাহী আধিকারিকের কাছে পত্রসহ গেলাম। নৌ-অধিকর্তা ম্যানুয়েল নিয়েতোর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলাম। তিনি সকালের দিকে মন্ত্রীপরিষদের সাজানো গোছানো রাজকীয় ড্রয়িংরুমে দেখা করলেন। কক্ষটির চারদিক সোনালী কাজ-করা আয়না সজ্জিত। আমি যেতেই কিছুক্ষণ পরে দেখা দিলেন। পুরোপুরি ইউনিফর্ম পরা। ছোটখাট মানুষ, চওড়া বুক। নেপোলিয়ানের মতো মুখে কাঠিন্য। কথাবার্তা সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত। কেন এসেছি জানতে চাইলেন, আমিও বললাম, কেন এসেছি। নৌবাহিনীর বন্দর এলাকায় ভেলা তৈরির অনুমতি চাই।

আমার কথা শুনে মন্ত্রীমহোদয় অস্বস্তিকর ভাবে টেবিলে আঙুল দিয়ে আঘাত করতে করতে বললেন, 'যুবক, তুমি সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে জানালা গলে এসেছ। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু আদেশটা আনতে হবে বিদেশ মন্ত্রকের কাছ থেকে। নৌ এলাকায় কোন বিদেশীকে ঢুকতে ও আমাদের ডক

ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। বিদেশমন্ত্রকের কাছে লিখিত অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। সাফল্য কামনা করি।'

আমি মনশ্চক্ষুতে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম—অসীম নীলিমায় কাগজপত্র যেন উড়ে পালাচ্ছে—মিলিয়ে যাচ্ছে। কন্-টিকির নিষ্করুণ রূঢ় দিনগুলিকে ধন্যবাদ—যখন এই ধরনের আবেদন-নিবেদন ও অনুমতি পত্রের বালাই ছিল না।

বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সোজাসুজি সাক্ষাৎ করা দুরূহ ব্যাপার। পেরুতে নরওয়ের কোন স্থায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধির অফিস নেই। আমার সাহায্যকারী বন্ধু কনসাল জেনারেল বয়ারের দৌড় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপদেষ্টাদের কাছে আমার আবেদন পৌঁছে দেওয়া, তার অধিক কিছু করবার কোন ক্ষমতা নেই। ভয় হল এখানেই বুঝি খতম হয়ে যাবে আমাদের সকল চেষ্টা। প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রেসিডেণ্টের কাছে লেখা ড. কোহেনের লেখা চিঠি হয়ত এক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে ভাবলাম। কাজেই তাঁর সহকারী সেনাপতি মারফত পেরুর প্রেসিডেণ্ট ডন জোজে বুস্তামান্ত ই রিভেরোর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করলাম। দু-দিন পরে বেলা বারটায় রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হবার নির্দেশ এল।

লিমা আধুনিক কালের শহর। লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ। শৈলময় পর্বতের সানুদেশে সবুজ সমতল প্রান্তরে অবস্থিত। স্থাপত্যের দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর সুন্দরতম শহরের অন্যতম। অত্যাধুনিক ক্যালিফোর্নিয়া বা রিভিয়েরার সঙ্গেও তুলনা করা চলে—অবশ্য কিছুটা স্পেনীয় স্থাপত্যের মিশেল আছে। স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও লিমায় আছে সুন্দর সুন্দর ফুলের ও শাকসবজির বাগান। প্রেসিডেণ্টের রাজপ্রাসাদ শহরের মাঝখানে অবস্থিত—বিশেষভাবে অস্ত্রসজ্জিত রক্ষীবাহিনী সুরক্ষিত। তাদের পোশাকের জাঁকজমকও বেশ উল্লেখ্য। প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রঙ্গমঞ্চের পর্দায় ছাড়া প্রেসিডেণ্টকে চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। কাঁধে বেল্ট ঝোলানো—বেল্টে পরপর গুলি সাজানো সশস্ত্র সৈন্যরা আমাকে উপরে নিয়ে গেল। দীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করে শেষপ্রান্তে এলাম আমরা। সেখানে তিনজন বেসামরিক অফিসার আমার নাম নথিভুক্ত করল। তারপর বিরাট ওক কাঠের দরজা দিয়ে আমাকে একটা কক্ষে নিয়ে গেল। কক্ষে বিরাট একটা টেবিলের সামনে কয়েক সারি চেয়ার পাতা। সাদা পোশাকপরা একজন আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি চেয়ারে বসতে বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে বিরাট একটা দরজা উন্মুক্ত হল। আর-একটি অপেক্ষাকৃত সুন্দরতর কক্ষে নীত হলাম। সেখানে একজন মর্যাদাসম্পন্ন সাদা ইউনিফর্মপরা লোক আমার দিকে এগিয়ে এল।

'প্রেসিডেণ্ট,' ভাবলাম আমি—সামলে নিলাম নিজেকে। কিন্তু না। সোনার ধার বসানো ইউনিফর্মপরা মানুষটি একটা প্রাচীন সোজাপিঠ চেয়ারে আমাকে বসতে

বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। চেয়ারের ধারে কোনমতে দেহ ঠেকিয়ে সবে বসেছি—এক মিনিটও কাটেনি, এমন সময় আর একটা দরজা খুলে গেল, একজন পরিচারক অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে আর একটা সুসজ্জিত বিরাট কক্ষে নিয়ে গেল। এ কক্ষের সবকিছুই গিল্‌টি-করা—আসবাবপত্রও গিল্‌টি-করা। পরিচারকটি যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ-ই অদৃশ্য হয়ে গেল। একলা বসে আছি আমি পুরানো একটা সোফার উপর। সামনে শূন্য ঘরের সারি—দরজা খোলা প্রত্যেকটির। চারদিক নীরব নিঝুম। কয়েক ঘর পিছনে কে যেন খুব সন্তর্পণে কাশছে। তারপর শুনতে পেলাম মাপা পা ফেলে কে আসছে এগিয়ে এদিক পানে। আমি লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালাম। ইউনিফর্মপরা বিশেষ কর্তৃত্বব্যঞ্জক এক পুরুষের মুখোমুখি হলাম। না, ইনি প্রেসিডেণ্ট নন। তিনি যা বললেন, তা থেকে বুঝতে পারলাম প্রেসিডেণ্ট আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত, আলোচনা-সভা শেষ হলেই দেখা করবেন।

দশ মিনিট পরে ধীর পদক্ষেপে আবার ঘরের নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল। এবার যিনি এলেন তার কাঁধে সোনার চাপরাশ ও লেস আঁটা। আমি ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম তাঁকে। তিনিও প্রতি নমস্কার জানিয়ে আমাকে নিয়ে কয়েকটা কক্ষ অতিক্রম করে পুরু কার্পেট-মোড়া মেঝে মাড়িয়ে একটি ছোট্ট কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে কেটে পড়লেন। ঘরে একটি চামড়া মোড়া চেয়ার ও সোফা। সাদা স্যুট পরা একজন লোক এলেন। এবার কোথায় যেতে হবে কে জানে! তার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলাম নিজেকে। কিন্তু তিনি আমায় অন্য কোথাও নিয়ে গেলেন না। শুধু অমায়িক সংবর্দ্ধনা জানিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তবে ইনিই প্রেসিডেণ্ট ডন জোজে বুস্তামান্ত ই রিভেরো।

আমি যা স্পেনীয় ভাষা জানি, প্রেসিডেণ্ট তাঁর দ্বিগুণ ইংরেজি জানেন। পরস্পরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পর তিনি আমকে ইংগিতে বসতে বললেন। আমাদের যতটুকু ভাষাজ্ঞানের পুঁজি সব নিঃশেষিত। এবার আবার ইংগিতের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু তা দিয়ে ভেলা বানানোর প্রতিশ্রুতি আদায় করা যাবে না। এইটুকু বুঝতে পারলাম আমি যা বলছি প্রেসিডেণ্ট তার কিছুই অনুধাবন করতে পারছেন না। আমার চেয়ে তিনিই সেটা বেশি হৃদয়ঙ্গম করলেন। এক পলকের জন্য অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে এলেন বিমানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। বিমানমন্ত্রী জেনারেল রেভারেডো—ইউনিফর্ম পরা। ভীষণ ব্যায়াম পরিপুষ্ট দেহ। চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন—বাচনভঙ্গি আমেরিকানদের মতো।

ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমি ক্ষমা চাইলাম। বিমানক্ষেত্র নয়—নৌ-পোতাশ্রয়ে প্রবেশের অনুমতিপ্রার্থী আমি। একথা শুনে জেনারেল হেসে ফেললেন। দোভাষীর

কাজ করার জন্য তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে মাত্র। আস্তে আস্তে আমাদের মতবাদ প্রেসিডেণ্টকে জ্ঞাপন করা হল। তিনি একাগ্র মন নিয়ে সব কথা শুনলেন—জেনারেলের মারফত মাঝেমাঝে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবান ছুঁড়তে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, পেরু থেকেই যদি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথম যাওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, পেরুরও এই অভিযানে স্বার্থ আছে বই কি! কিভাবে সাহায্য করতে পারেন জানালে বাধিত হবেন তিনি।

নৌ-ঘাঁটির এলাকায় ভেলা তৈরি করার অনুমতি পেশ করলাম—সেইসঙ্গে নৌ-ঘাঁটির কারখানার সহযোগিতাও কাম্য—যন্ত্রপাতি জমা রাখার জায়গা, ড্রাই-ডক ব্যবহার ও ভেলা তৈরি করতে নৌ-ঘাঁটির লোকজনদের সাহায্যও চাই। যখন আমরা যাত্রা করব, কোন জলযান ভেলাটাকে উপকূল থেকে সাগরে টেনে নিয়ে যেতেও সাহায্য করবে।

'কি চাইছেন উনি?' সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেণ্ট। আমিও বুঝতে পারলাম।

'বিশেষ কিছু নয়!' জবাবে বললেন রেভারেডো আমার দিকে তাকিয়ে। তাঁর চোখের কোণে আলোর ঝিকিমিকি। খুশি হয়ে সম্মতি প্রদান করলেন প্রেসিডেণ্ট।

এই সাক্ষাৎকার শেষ হবার আগেই রেভারেডো প্রতিশ্রুতি দিলেন—বিদেশ মন্ত্রী প্রেসিডেণ্টের ব্যক্তিগত অনুমতি পত্র পেয়ে যাবেন—নৌ-দপ্তরের মন্ত্রীকেও আমাদের প্রয়োজন মাফিক সবরকম সাহায্য প্রদান করার-নির্দেশও যথারীতি দিয়ে দেওয়া হবে।

'ভগবান আপনাদের রক্ষা করুণ,' হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন জেনারেল। এই সময় সহকারী সেনাপতি ভিতরে ঢুকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসে অপেক্ষমান এক দুতের হাতে সমর্পণ করলেন।

সেইদিন লিমার সংবাদপত্রে নরওয়ের ভেলা-অভিযান সম্পর্কে এক প্যারাগ্রাফ লেখা ছাপা হল। অভিযান শুরু হবে পেরু থেকে। সেই সঙ্গে আর একটি খবরও ছাপা হয়েছে কাগজে। আমাজন এলাকায় জংলী আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি সুইস ও স্পেনীয় যুগ্ম অভিযানও সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। আমাজন অভিযানের দুজন সুইশ সদস্য শালতি চেপে নদী পথে পেরু এসেছেন। তাঁরা সদ্য লিমা পৌছেচেন। তাঁদের একজন হলেন উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেণ্ট ডানিয়েলসন। তিনি এখন পেরুর পার্বত্য এলাকার উপজাতিদের সম্বন্ধে গবেষণা-অনুসন্ধান চালাতে কৃত সংকল্প। আমি কাগজের সেই প্যারাগ্রাফটুকু কেটে রেখে দিলাম। হোটেলে বসে কোথায় ভেলা তৈরি হবে তার জায়গা সম্পর্কে খবর দিয়ে হেরমানকে চিঠি লিখছিলাম এমন সময় দরজায় করাঘাত হল। বাধা পড়ল চিঠি লেখায়। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন একজন লম্বা রোদেপোড়া লোক। পরনে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী পোশাক।

তিনি মাথার সাদা হেলমেটটা খুলে ফেললেন। দেখে মনে হল যেন তাঁর জলন্ত লাল দাড়ি মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে। চুলেরও একই অবস্থা। তাই চুল পাতলা। ভদ্রলোক সোজা বন থেকে আসছেন। কিন্তু তাঁর স্থান কলেজের বক্তৃতামঞ্চ।

'বেণ্ট ডানিয়েলসন'—মনে মনে ভাবলাম আমি। আর তিনিও ঠিক তখুনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার নাম বেণ্ট ডানিয়েলসন!'

'নিশ্চয়ই উনি ভেলা-অভিযানের কথা শুনেছেন,' ভাবলাম আমি। তাঁকে বসতে অনুরোধ করলাম।

'সদ্য আপনাদের ভেলা অভিযানের কথা কাগজে পড়েছি,' বললেন তিনি।

'উনি একজন জাতিতত্ত্ব-বিশারদ—নিশ্চয়ই আমাদের থিয়েরীকে নস্যাৎ করতে এসেছেন!' ভাবলাম আমি।

'আমি এসেছি জানতে—আমাকেও আপনাদের ভেলা-অভিযানের সঙ্গী করতে রাজি আছেন কি না,' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আমিও এই প্রব্রজন-থিয়োরী সম্বন্ধে কৌতূহলী।'

ভদ্রলোক একজন বৈজ্ঞানিক। সদ্য গভীর বন থেকে প্রত্যাগত। এর বেশি ভদ্রলোক সম্বন্ধ আমি আর কিছুই জানি না। পাঁচ জন নরওয়েবাসীর সঙ্গে একজন সুইস ভদ্রলোক ভেলা-অভিযানে যেতে সাহসী হলে তাঁর তো খুঁতখুঁত করার কিছুই থাকতে পারে না! বিপুল শ্মশ্রুও তাঁর মনের অগাধ প্রশান্তি ও প্রফুল্লতাকে লুকোতে পারে নি।

ছ জন ভেলা অভিযাত্রীর একটি স্থান শূন্য ছিল। বেণ্ট সেই ষষ্ঠ অভিযাত্রী পদে ব্রতী হলেন। একমাত্র তিনিই আমাদের মধ্যে স্পেনীয় ভাষায় কথা বলতে পারেন।

আবার কয়েকদিন পরে আমি যখন যাত্রীবাহী বিমানে চড়ে সমুদ্র উপকূল হয়ে উত্তরাভিমুখে উড়ে যাচ্ছিলাম, নিচের সীমাহীন নীল সমুদ্রের দিকে শ্রদ্ধান্বিত চোখে তাকিয়ে রইলাম। মহাকাশের নিচে নীলাম্বুরাশি ঝুলছে পর্দার মতো। ভেসে চলেছে। শীগগিরই আমরা ছ জন জীবাণুর মতো বস্তাবন্দী হয়ে ঐ সীমাহীন জল-রাশিতে ভাসতে ভাসতে যাব—দেখাবে ঠিক একটা কালো ফুটকির মতো। আমরা কিছুদিনের জন্য জনহীন একটা নিরালা পৃথিবীর অংশ হব—যেখানে পরস্পরের কাছ থেকে দু এক পা আগুপিছু থাকব মাত্র। এই একটু যা হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারব। হেরমান ইকুয়াডোরে কাঠের জন্য অপেক্ষা করছে। ন্যুট হোগল্যাণ্ড আর টরস্টেইন রাবি সবে আকাশ পথে নিউইয়র্কে এসে পৌছেচে। এরিক হিসেলবার্গ অসলো থেকে পানামাগামী জাহাজে চড়ে বসেছে। আর আমি নিজে আকাশ মার্গে ওয়াশিংটন অভিমুখে উড়ে চলেছি। বেণ্ট লিমার একটা হোটেলে অবস্থান করছেন। তিনি তো যাত্রার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায় আছেন।

কারুর সঙ্গেই আগে থেকে জানপাচান নেই। মানসিকতার দিক থেকেও প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা চরিত্রের মানুষ। এই পরিস্থিতিতে সবাই মিলে কয়েক সপ্তাহ ভেলায় কাটালে এবং যার যা বলবার আছে শুনে শুনে ক্লান্ত হওয়া উচিত। কিন্তু ছজন লোক যখন ভেলায় চড়ে অসীম সমুদ্রে অজানার সন্ধানে ভাসতে ভাসতে যাবে মাসের পর মাস, তখন যদি এদের কারুর মনের আকাশে কোন মেঘ সঞ্চার হয়, তা ঝড়ো মেঘ, নিম্নচাপ বা মেঘলা আবহাওয়ার চেয়ে ঢের ঢের বেশি মারাত্মক হবে! এসব ক্ষেত্রে হাসি মস্করা লাইফ বেল্টের মতোই মহা মূল্যবান।

আমি যখন ওয়াশিংটনে ফিরে এলাম, তখনও সেখানে শীতের তীব্রতা প্রচণ্ড—তুষার-ঝরা হিমেল ফেবরুয়ারি। বয়র্ন রেডিও সমস্যার মোকাবিলা করেছে দক্ষতার সঙ্গে। ভেলা থেকে প্রেরিত প্রতিটি খবরাখবর আমেরিকার রেডিও শ্রোতাদের শোনার ব্যবস্থাদি করা সম্পূর্ণ। ন্থুট আর টরস্টেইন সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থাদি পাকা করতে ব্যস্ত। সংবাদ প্রেরিত হবে, আংশিক এই কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ট্র্যানসমিটারের সাহায্যে আর বাকি আংশিকের জন্য যুদ্ধের সময় অন্তর্ঘাত কাজে ব্যবহৃত গোপন সেটের সহায়তা নেওয়া হবে। পরিকল্পনা রূপায়িত করতে এই রকম ছোট বড় কত যে হাজার হাজার জিনিসের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

ফাইলে কাগজের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। ফ্রেঞ্চ, স্পেনীয়, ইংরেজি ও নরওয়েজীয় ভাষায় সাদা হলদে ও নীল কাগজে লেখা সামরিক বেসামরিক নানা দলিল। বর্তমান ব্যবহারিক যুগেও একটা ভেলা-অভিযানের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ করতে কাগজের কারখানাকে কাগজ তৈরি করতে একটা ফার গাছের পুরো অর্ধেকটা খরচ করতে হল। আইন-কানুন নিয়ম-পদ্ধতির বেড়াজালে প্রতি মুহূর্তে বাঁধা পড়তে হচ্ছে আর এই জট ছাড়তে প্রয়াসেরও অন্ত নেই।

একদিন টাইপরাইটারের উপর ঝুঁকে হতাশ স্বরে সখেদে মন্তব্য করল ন্থুট—'এই চিঠি চালাচালি করতে কুড়ি পাউণ্ড কাগজ খয়রাতি করতে হল।'

'না, ছাব্বিশ পাউণ্ড—আমি ওজন করে দেখেছি,' নীরস গলায় কথাটা ছুঁড়ে দিল টরস্টেইন।

মায়ের বোধ হয় সেদিনকার প্রস্তুতি-পর্বের নাটকীয় অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল—তাই তিনি শুধু লিখলেন, 'তোমরা সবাই ভেলায় নিরাপদে থাকবে ঈশ্বরের কাছে আমার এই একটিমাত্র প্রার্থনা।'

একদিন লিমা থেকে একটা জরুরী টেলিগ্রাম পেলাম। হেরমান পিছুহটা ঢেউয়ের কবলে পড়ে তীরে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিশ্রীভাবে আহত হয়েছে। ঘাড়ের হাড় গ্রন্থিচ্যুত। লিমার হাসপাতালে আছে।

টরস্টেইনকে তখুনি বিমানযোগে লিমায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে গেল জার্ড ভোল্ড—যুদ্ধে নরওয়েজীয় অন্তর্ঘাতী প্যারাচুট বাহিনীর লণ্ডনের জনপ্রিয় সেক্রেটারী। ওয়াশিংটনে এখন তিনি আমাদের নানা ভাবে সাহায্য করছিলেন। তারা গিয়ে দেখল হেরমানের অবস্থা ভালোর দিকে। তাকে মাথায় চামড়ার স্ট্র্যাপ বেঁধে আধ ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ডাক্তাররা তার অ্যাটলাস ভারটিব্রাকে বেঁকিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েছে। এক্স-রে থেকে জানা গেল—গলার সব থেকে উঁচু হাড়ে চির খেয়েছে। চমৎকার স্বাস্থ্যের জন্য এ যাত্রা বেঁচে গেছে হেরমান। শীগগিরই ফিরে এল ডকে। চেহারাটা সবজে নীল মেরে গেছে। বাতগ্রস্ত। ঘাড় নট নড়নচড়ন। ডকে বালসা কাঠ এনে জড়ো করা হয়েছে—ভেলা তৈরির কাজও শুরু। কয়েক সপ্তাহ ডাক্তারের খোদ হেফাজতে থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে এ অভিযানে যেতে পারবে কিনা সে-সন্দেহও দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহ তার মনে মুহূর্তের জন্যও রেখাপাত করেনি। পরিকল্পনার আদি পর্বেই প্রশান্ত মহাসাগরের হাতে এই নির্দয় নির্যাতন—নির্মম ব্যবহার!

পানামা থেকে এরিক, ওয়াশিংটন থেকে নুট ও আমি বিমানযোগে পৌঁছে গেছি। লিমাতে সবাই উপস্থিত। এখান থেকে হবে যাত্রার শুভারম্ভ!

নৌ-পোতাশ্রয়ে কুয়েভেডো বন থেকে আনা বিরাট বিরাট বালসা গাছের কাণ্ড পড়ে আছে। সত্যিই এক করুণ দৃশ্য। সদ্য কাটা হলদে গাছের কাণ্ড, হলদে বাঁশ, নল খাগড়া, সবুজ কলার স্তূপ—ভেলা তৈরির মালমশলা। আর দুপাশে রয়েছে ধূসর ভয়-জাগানো ডুবো জাহাজ আর ডেস্ট্রয়ারের সারি। আর রয়েছি আমরা ছ-জন—উত্তরের সাদাচামড়া মানুষ ও কুড়িজন বাদামী রংয়ের পেরুর নাবিক যাদের শিরায় প্রবাহিত ইনকা রক্ত-স্রোত। তারা কুড়ুল চালাচ্ছে, দীর্ঘ ম্যাচেট ছুরি ও দড়াদড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া ও টানাটানি করছে। নীল আর সোনালী ইউনিফর্ম পরা ফিটফাট নৌ-অফিসাররা হামেশাই আসা-যাওয়া করছেন, বিস্মিত চোখে দেখছেন এইসব ফ্যাকাশে লোকজনদের কাজ কারবার, অদ্ভুত অদ্ভুত উদ্ভিজ্জ পদার্থ। নৌ-পোতাশ্রয়ে হঠাৎ-ই এসবের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছে।

শতাধিক বছর পরে ক্যালাও উপসাগরে এই প্রথম আবার একবার ভেলা তৈরি হচ্ছে। ইনকা-উপকথা থেকে জানা যায় কন-টিকির অন্তর্হিত জাতি-গোষ্ঠীদের কাছ থেকেই ইনকাদের পূর্বপুরুষরা ভেলা করে সমুদ্রবিহারের কথা জানতে পারে। বর্তমান উপজাতিদের পক্ষে আজকাল এই ধরনের ভেলা তৈরি করা নিষিদ্ধ। আমাদের জাতির লোকেরাই এই নিষেধ-আদেশ জারি করেছে। এই ধরনের ভেলা-বিহারে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। ইনকাদের বংশধররাও যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে শিখেছে। আমাদের মতোই তাদের ট্রাউজারে ভাঁজ পড়ে—নৌ-জাহাজ থেকে গোল্লা

ছুঁড়ে তারা এখন নিরাপত্তা বজায় রাখতে জানে। বাঁশ ও ভেলা আদিম অতীতের ঘটনা। এখানেও জীবন-স্রোত ভিন্নমুখী চলেছে বর্ম ও ইস্পাতের দিকে।

সর্বাধুনিক পোতাশ্রয়ের অপূর্ব সুযোগ-সুবিধে হাতের মুঠোয়। বেন্ট দোভাষীর কাজ করছেন—হেরমান নির্মাতাদের প্রধান। পোতাশ্রয়ের ছুতোর ও কামারশালার সাহায্য নাগালের মধ্যে—আমাদের জিনিসপত্র ও সাজসরঞ্জাম জড়ো করে রাখার পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে, আর পেয়েছি ছোট্ট ভাসমান জেটীর সুযোগ-সুবিধা। ভেলা তৈরি শুরু হলে এখান থেকেই ভেলার কাঠ জলে নামানো হতে লাগল।

সব থেকে মোটা কাণ্ডের নটা কাঠ বেছে নেওয়া হল—ভেলা তৈরির পক্ষে এই যথেষ্ট। কাঠের গায়ে গভীর গর্ত কেটে পর পর সাজিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল যাতে না কোন একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ভেলা তৈরি করতে একটাও গজাল পেরেক বা ইস্পাতের দড়ি ব্যবহার করা হয়নি। নটা কাণ্ডকে প্রথমে পাশাপাশি জলের উপর নামিয়ে ভাসমান অবস্থায় সাজিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হল। সবথেকে লম্বা কাঠটি হল দৈর্ঘ্যে পঁয়তাল্লিশ ফুট। এটা রইল মাঝখানে—দু-দিকেই অনেকখানি বেরিয়ে থাকল। এর দুপাশে পাশাপাশি ছোট কাঠগুলো স্থাপন করা হল সুসমঞ্জস ভাবে। ভেলার প্রস্থ দাঁড়াল তিরিশ ফুট। ভেলার সম্মুখভাগ দেখাতে লাগল ভোঁতা লাঙ্গলের মতো। ভেলার পিছন দিকের কাঠ সমান্তরাল ভাবে কেটে দেওয়া হল—শুধু মাঝখানের তিনটে কাঠ বাদ দিয়ে। কাঠ তিনটে বেরিয়ে রইল আর তার উপর বেশ মোটা একটা বালসা কাঠের খণ্ড বসিয়ে দেওয়া হল আড়াআড়ি ভাবে। ভেলার দাঁড় আটকে রাখার গোঁজের ব্যবস্থা করা হল এখানে। নটা বালসা কাঠ পাশাপাশি বসিয়ে দেড় ইঞ্চি মোটা শনের রশি দিয়ে খুব আঁট করে বেঁধে এদের উপর হালকা বালসাকাঠের খণ্ড আড়াআড়ি ভাবে পাতা হল তিন ফুট অন্তর অন্তর। তাদেরও খুব শক্ত করে বাঁধা হল দড়ি দিয়ে।

ভেলার কাজ সম্পূর্ণ। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দড়িতে তিনশ জায়গা বেঁধে গিঁট দেওয়া হল। বেশ গলদঘর্মের কাজ। বাঁশের বাখারি পেতে পাটাতন তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বাখারিও শক্ত করে বাঁধা। বাঁশের সরু কঞ্চি ফালিফালি করে কেটে বিনুনী পাকিয়ে চাটাই তৈরি করে পাটাতনের উপর পেতে দেওয়া হল। ভেলার প্রায় মাঝামাঝি কিন্তু দাঁড়ের কাছাকাছি একটা বাঁশের কেবিন বা ছই-ও তৈরি করলাম। কেবিনের চারপাশে বাখারির বেড়া দিয়ে বেড়ার গায়ে বাঁশের চাটাই এঁটে দেওয়া হয়েছে। ছাদও তৈরি হল বাঁশের বাখারির উপর চাটাই পেতে—চাটাইয়ের উপর কলার পাতা একটার উপর আর-একটা এইভাবে বিছিয়ে দেওয়া হল টাইলের মতো। বাকি রইল কেবিনের সামনে দুটো মাস্তুল খাড়া করানো—লোহার মতো শক্ত গড়ান গাছের কাঠ থেকে তৈরি হল মাস্তুল। মাস্তুলের মাথা দুটো টেনে কাছাকাছি এনে

আড়াআড়িভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। দুদিকে দুটো বাঁশের লগার সঙ্গে কাপড় বেঁধে আয়তাকার পাল তৈরি করে মাস্তুলের গায়েও ঝুলিয়ে দিলাম।

যে নটা বালসা কাঠ আমাদের সমুদ্র পেরুতে সাহায্য করবে তার অগ্রভাগ ছুঁচালো করা হয়েছে অনেকটা নৌকোর গলুইয়ের মতো। এর ফলে জল কেটে যাওয়া সহজ হবে। জল ছিটকানো বন্ধ করার জন্য নৌকোর সামনের দিকে তক্তাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

ভেলার যেসব জায়গায় দুটো কাঠের মাঝখানে ফাঁক থেকে গেছে, সেই রকম পাঁচটা জায়গায় খাড়া করে ফার কাঠের তক্তা ঢুকিয়ে দিলাম। তক্তার ধারগুলো ভেলার জলের তলায় এখানে-ওখানে পাঁচ ফুট মতো বেরিয়ে রইল পায়ার মতো। তক্তাগুলো এক ইঞ্চি পুরু আর দু ফুট প্রশস্ত। এগুলো দড়ি ও কীলকের সাহায্যে ঐভাবে :অটুট থাকার ব্যবস্থা করা হল। এরা যেন ভেলার দ্বিতীয় প্রস্থ তলি বা সেণ্টার বোর্ডের কাজ করবে। এই কীলক লাগানো তলির সাহায্যে ভেলার গতিও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ইনকাদের সময়ে বহু আগে থেকেই ভেলার তলায় এই ধরনের তলির ব্যবস্থা থাকত—যাতে না ভেলা স্রোত ও বাতাসের টানে পাশাপাশি ভেসে যেতে পারে। ভেলার চারদিকে আমরা কোন রেলিং বা অন্য কোন প্রকার রক্ষামূলক প্রাচীরের ব্যবস্থা করিনি। তবে দুপাশেই পৈঠার মতো সরু ও লম্বা বালসা কাঠ পেতে দেওয়া হয়েছে যাতে না চলতে ফিরতে আচমকা পা ফস্কে জলে পড়ে যাই।

পেরু ও ইকুয়াডোরে ভেলার যে-বর্ণনা পাওয়া গেছে হুবহু তার নকল করা হয়েছে—শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। সেটি হল ভেলার সামনে জল ছিটকানো আটকাবার তক্তার ব্যবস্থা। পরে কার্যক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ অকেজো প্রমাণিত হয়েছে। ভেলা তৈরি শেষ হবার পর ভেলার উপরের ব্যবস্থাদি আমরা নিজেদের খুশিমতো সাজালাম। এর দ্বারা ভেলার গতি বা কার্যকারিতার কোন হেরফের বা ব্যাঘাত ঘটবে না। আমরা জানি আগামী দিনগুলোতে এই ভেলাই হবে আমাদের একমাত্র জগত। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন এই ভেলায় কাটবে, সামান্যতম জিনিসও তখন অসামান্য গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেবে।

ভেলার ডেকের উপর যত বেশি বৈচিত্র্য আনা যায় আমরা তার একটুও কার্পণ্য করলাম না। শুধু কেবিনের সামনেটুকু ছাড়া সমস্ত ভেলা জুড়ে আমরা বাঁশের পাটাতন বিছাইনি। ভেলার সামনের দিকে ডান পাশের অংশেও বাঁশের বাখারির পাটাতন বিছানো হয়েছিল। কেবিনের বাঁ দিকে বাক্সের উপর বাক্স চাপিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মাঝখান দিয়ে যাওয়া আসার সরু একফালি জায়গা রেখে অন্যান্য সাজ সরঞ্জামও ডাঁই করে রাখা হল। কেবিনের সামনে ও পিছন দিকে ভেলার বেশ কিছুটা অংশের উপর কোন পাটাতন বিছানো হয়নি। আগুন

শীর্ষে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করলাম। স্থলভাগ যখন কাছে আসবে এখানে বসে তাকিয়ে দেখবার জন্য নয়। সমুদ্র বক্ষে যখন ভাসব তখন মাঝে মাঝে এই প্ল্যাটফর্মে উঠে বিভিন্ন কোন থেকে সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই আসল উদ্দেশ্য।

ভেলা তার নির্দিষ্ট রূপ নিতে শুরু করেছে। অবস্থান করছে যুদ্ধ জাহাজের মাঝখানে। আশে পাশে সোনালী ও পাকা বাঁশের সারি! সবুজ পাতার শোভা। সেই সময় একদিন নৌ-দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় স্বয়ং সরেজমিনে তদারক করতে এলেন। ভেলার ব্যাপারে আমাদের গর্বের শেষ নেই। আধুনিক যুগের বিরাট নৌবহরের মধ্যে ইনকা যুগের নির্ভীক স্মৃতির স্মারক এই ভেলা। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় দেখে শুনে যেন ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। আমাকে নৌ-অফিসে তলব করে পাঠালেন। 'পোতাশ্রয়ে আমরা যে জলযান তৈরি করেছি তার সঙ্গে নৌ-দপ্তরের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, তারা সব রকম দায়িত্বমুক্ত—এই রকম হলফনামা কাগজে সই করে দিতে হল। আর পোতাশ্রয়ের অধিকর্তার কাছেও এই মর্মে কাগজে সই করে দিলাম, যখন আমরা মালপত্র ও লোকজন নিয়ে ভেলায় চড়ে পোতাশ্রয় ছেড়ে যাব, তা হবে সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বে। যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে তার পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের বর্তাবে—নৌ-দপ্তরের উপর কোন মতেই নয়।'

এর পর নৌযান সম্বন্ধে বহু বিদেশী ও কূটনীতিবিদকে পোতাশ্রয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হল—ভেলাটিকে দেখবার জন্য। তাঁরা কেউই কোন আশার বাণী শোনালেন না। কয়েকদিন পরে বৃহৎশক্তিবর্গের একজন বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর অফিসে।

'আপনার বাপ-মা বেঁচে আছেন?' যেতেই আমাকে প্রশ্ন করলেন তিনি। বেঁচে আছেন শুনে সোজা আমার চোখে চোখ রেখে বললেন তিনি নিচু গলায়—'আপনার মৃত্যু খবর পেয়ে বাবা-মা খুব দুঃখ পাবেন!'

সময় থাকতে এই অভিযান পরিত্যাগ করতে তিনি বন্ধু হিসেবে অনুরোধ করছেন আমায়। একজন নৌ-সেনাপতি ভেলাটা পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাঁর মতে আমরা কেউই জীবন্ত বেঁচে ফিরে আসতে পারব না। প্রথমত ভেলার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের মাপ ভুল। এত ছোট জলযান যে বিপুল সমুদ্রে টুপ করে ডুবে যাবে। আবার এর দৈর্ঘ্য এমন যে পর পর দুটো বিরাট ঢেউ একে শূন্যে ছুঁড়ে দেবে। আর ভেলায় এত মাল পত্তর ও লোকজন চাপালে হালকা ও ভঙ্গুর বালসা কাঠ সে-ভার সইতে পারবে না—মচাৎ করে ভেঙ্গে যাবে। এখানকার সব থেকে বড় বালসা কাঠের রপ্তানীকারক তাঁকে জানিয়েছে, সছিদ্র বালসা কাঠ সমুদ্রে কিছু দূর যেতে না যেতেই জলসিক্ত হয়ে ডুবে যাবে।

কথাটা শুনতে খারাপ লাগল। কিন্তু আমরা আমাদের লক্ষ্য-বিন্দু থেকে এক

চুলও সরে আসব না বুঝতে পেরে তিনি একখানা বাইবেল উপহার দিলেন সঙ্গে নিয়ে যেতে এই অভিযানে। বিশেষজ্ঞরা যাঁরা ভেলা দেখলেন, তাঁরাই নাক সিঁটকোলেন। কারুর কাছ থেকে ছিটে-ফোঁটা উৎসাহ পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। তীব্র বাতাস বা ঝড়-ঝঞ্ঝা আমাদের ভেলা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এই নিচু জলযানকে মুহূর্তে ধ্বংস করে দেবে, অসহায়ের মতো আমরা সমুদ্র আর ঝড়ের তাণ্ডবে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে যাব অতল সমুদ্রে সলিল সমাধি লাভ করতে। এমন কি সমুদ্র যখন শান্ত থাকবে, ছোট ছোট ঢেউরা যখন ক্রীড়াচঞ্চল হবে, তখনও আমরা অনবরত লোনা জলে সিক্ত হব, লোনা জল ভেলার উপর দিয়ে বয়ে যাবে, পা থেকে চামড়া খুলে নেবে—ভেলার উপরের সব কিছু নষ্ট করে দেবে। বিশেষজ্ঞরা যা-যা বলেছেন আর প্রত্যেকেই ভেলা নির্মাণে যত রকম ভুলচুক হয়েছে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন—সে-সব এক জায়গায় জড়ো করলে দেখা যাবে—ভেলায় এমন এক টুকরো দড়ি, দড়ির গিঁট, কাঠ মাপজোক এমন কিছু নেই যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটেনি এবং আমাদের সলিল সমাধি না ঘটিয়ে ছাড়বে না। কতদিন ভেলাটা টিকে থাকবে তাই নিয়ে এখন বাজি ধরা চলছে। একজন বাচাল নৌ-সহদূত তো ঘোষণাই করল, আমরা যদি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে অভিযাত্রীদের প্রত্যেককে যত দিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন, যত হুইস্কি খেতে চাইবেন নিখরচায় তিনি তাঁদের সরবরাহ করবেন।

সব থেকে খারাপ ঘটনা হল : একটি নরওয়ের জাহাজ পোতাশ্রয়ে এলে জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন ও তার জনা দুই ঘাগী নাবিককে সঙ্গে করে আমাদের জেটীতে নিয়ে এলাম। তাদের বাস্তব প্রতিক্রিয়া জানতে আমরা অত্যন্ত কৌতূহলী। তাদের অভিমত এই জবরজংগ জলযান পালের কোন সুযোগ নিতে পারবে না আর ক্যাপ্টেন বললেন, হুমবল্ড স্রোত অতিক্রম করতে এই ভেলার অন্তত বছর দুই নিশ্চয়ই লাগবে। তাদের মন্তব্য অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক। জাহাজের নৌকো পতাকা প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক সর্দার-মাঝি আমাদের ভেলার দড়িদড়া দেখে অবজ্ঞায় মাথা নাড়ল। ঘাবড়াবার কিছু নেই। এক পক্ষও কাটবে না। সমুদ্রের তরঙ্গের তাড়নায় বিরাট বিরাট বালসা কাঠগুলো অনবরত উপরে উঠবে আবার নিচে নামবে আর কাঠগুলোর গায়ে গায়ে ঘষাঘষি চলবে। কাজেই দড়িদড়া ছিঁড়তে একদণ্ডও সময় লাগবে না। যদি শিকলি বা তারের দড়ি ব্যবহার না করি, ভেলা অভিযান যেন এখনই গুটিয়ে নেওয়া হয়।

এই সব দুরূহ অকাট্য সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেওয়া কঠিন। যদি এদের কারুর মন্তব্য সঠিক হয়ে থাকে, আমাদের তাহলে বাঁচারও কোন উপায় নেই। আমি যা করতে যাচ্ছি সে-সম্বন্ধে আমার নির্ভুল ধারণা আছে তো? বার বার নিজেকে এই

প্রশ্ন করতে লাগলাম। সমালোচকদের প্রতিটি সতর্ক বাণীর জবাব দেবার ক্ষমতা আমার নেই,—কারণ আমি নাবিক নই। কিন্তু আমার হাতে একটি মাত্র তুরুপের তাশ আছে যার উপর এই অভিযানের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন সভ্যতার মশাল পেরু থেকে জ্বালিয়ে সেই দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল, তখন ভেলা ছাড়া অন্যকোন জলযানের অস্তিত্বও ছিল না সমুদ্র উপকূলে। যদি পাঁচশ খ্রীস্টাব্দে কন-টিকি বালসা কাঠের ভেলায় করে গিয়ে থাকেন, সেই বালসা কাঠের ভেলা আজ আমাদের বিমুখ করবে না—দড়িদড়াও নয়। এই হল আমার চরম সিদ্ধান্ত। হেরমান ও বেণ্ট আমার এ মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। বিশেষজ্ঞরা আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে বিলাপ করলেও সঙ্গীরা কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটা হাসিমুখেই নিয়েছে—লিমায় তাদের দিন কাটছে বিপুল সমারোহে। একদিন সন্ধ্যেবেলা টরস্টেইন এক উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন পেশ করল, সমুদ্রের স্রোত ঠিক দিকে প্রবাহমান আছে তো! আমরা সিনামা দেখতে গিয়েছিলাম। সেই ছবিতে ডরোথি লেমুর একটি রমণীয় প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে খড়ের তৈরি স্কার্ট পরে সেখানকার এক দঙ্গল মেয়ের সঙ্গে তালবীথির মধ্যে উদ্দাম নৃত্য করছিল।

'ওখানেই তো যাব আমরা!' বলল টরস্টেইন, 'তুমি তো আশা দিয়েছে, কিন্তু সমুদ্রে স্রোত যদি আমাদের সঙ্গে বেইমানি করে, আর আমরা যদি সেখানে পৌছতে না পারি, তাহলে ভারি দুঃখের হবে!'

আমাদের যাত্রার দিন আগত প্রায়। আমরা পাশপোর্ট অফিসে গেলাম এদেশ ত্যাগ করার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে। বেণ্ট দোভাষী হিসেবে সারির প্রথমে দাঁড়িয়ে।

'আপনার নাম?' বেণ্টের বিপুল শ্মশ্রুসম্ভার দেখে ছোট্টখাট একজন করণিক চশমার ভিতর দিয়ে তাঁর দিকে সন্দিহান দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করল।

'বেণ্ট এমেরিক ডানিয়েলসন।'

টাইপরাইটারে বড়সড় একটা কাগজ পরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল সে, 'কোন্ নৌকোয় চেপে পেরু এসেছেন?'

'নৌকোয় আসিনি—এসেছি ক্যাহু (শালতি) চেপে,' নরম স্বভাব ছেলেটির দিকে ঝুঁকে বললেন তিনি।

বেণ্টের জবাব শুনে ছেলেটি বিস্ময়ে বোবা বনে গেছে—ফর্মে সে ক্যাহু কথাটা ঝটপট টাইপ করে ফেলল।

'কোন জাহাজে চেপে পেরু থেকে যাবেন?'

'দেখুন,' আবার তিনি অমায়িক কণ্ঠে বললেন, 'জাহাজে যাব না—যাব ভেলায় চেপে।'

'খোশগল্প করছেন!' ছেলেটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল। মেশিন থেকে টাইপের

কাগজটা খুলে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলল, 'আপনি কি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবেন ?'

*　　*　　*

যাত্রার কয়েকদিন আগে রসদ, মালপত্র, পানীয় জল ও নানা সাজসরঞ্জাম এনে ভেলার উপর জড়ো করা হল। ছ-জন লোকের চারমাসের খোরাকি নেওয়া হয়েছে ছোট ছোট পিজ বোর্ডের বাক্সে—সামরিক রসদ। হেরমান পীচ গলিয়ে প্রত্যেক বাক্সের গায়ে লেবেল লিখে দিয়েছে। বাক্সের গায়ে বালি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে না একটা বাক্স আর-একটা বাক্সের গায়ে লেগে যায়। ভেলার পাটাতনের উপর সবকিছু ঘেঁষাঘেঁষি করে সাজিয়ে রাখলাম। যে নটা কাঠ আড়াআড়ি পেতে ভেলাটাকে মজবুত করা হয়েছে তাদের ফাঁকে ফাঁকে যে জায়গা পাওয়া গেল সেখানে বাক্সগুলো সাজিয়ে রাখা হল।

উঁচু পাহাড়ের স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ঝরণার জল ছাপান্নটা ছোট ছোট পাত্রে ভরে নিলাম। দু'শ পঁচাত্তর গ্যালন পানীয় জল। ঐ আড়াআড়ি পাতা কাঠের মাঝখানে তাদেরও শক্ত করে বেঁধে রাখলাম। কারণ সমুদ্রের জল অনবরত ছিটকে এসে পড়বে, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বাকি সাজসরঞ্জাম এবং সেই সঙ্গে ফলমূল নারকেল বোঝাই ঝুড়িগুলো বাঁশের পাটাতনের উপর সাজিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম।

নুট ও টরস্টেইন বাঁশের কেবিনের একটা কোন রেডিয়োর জন্য দখল করল। আর আমরা একটা কোনে আড়াআড়ি পাতা কাঠের ফাঁকে আটটা বাক্স শক্ত করে বেঁধে রাখলাম। দুটো বাক্সে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও ফিলিম ভরা আর বাকি ছটা বাক্স ছজনের। যে যার বাক্সে নিজের খুশি মতো যত ইচ্ছে জিনিসপত্র নিতে পারে—কোন বাধানিষেধ নেই। এরিক সঙ্গে এনেছে কয়েক দিস্তা ড্রয়িং-পেপার আর গিটার। ওর বাক্সটা এত ঠাসা জিনিসে যে মোজা রাখতে হল টরস্টেইনের বাক্সে। চারজন নাবিকের দরকার হল বেন্টের জিনিসপত্র ভেলায় নিয়ে যেতে। তিনি সঙ্গে নিয়েছেন একমাত্র বই। ভিয়াত্তরটা সমাজতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ক বই বাক্সে পুরেছেন। আমরা বাক্সের উপর শরের কাঠির মাদুর ও খড়ের তৈরি তোশক বিছিয়ে দিলাম। এবার যাত্রার সব ব্যবস্থা সাঙ্গ।

প্রথমে ভেলাটাকে নৌ-এলাকা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসা হল। পোতাশ্রয়ে কয়েকবার বৈঠা চালিয়ে দেখলাম মালপত্র সমানভাবে সর্বত্র রাখা হয়েছে কি না। ভেলাটাকে তখন ক্যালাও ইয়ট-ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হল—ভেলার একটা নামকরণ করতে হবে। নামকরণের দিন বন্ধুবান্ধব ও যারা এ ব্যাপারে উৎসাহী তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হল উপস্থিত থাকতে।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭। নরওয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল। আর যে-যে বিদেশী রাজ্য এই অভিযানের ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য করেছে তাদের প্রত্যেকের পতাকা মাস্তুলের দুপাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

জেটীতে লোকে লোকারণ্য। সবাই এই অদ্ভুত জলযানের নামকরণ উৎসব দেখতে সমবেত। এই বিচিত্র বর্ণ ও চেহারার সমাবেশ দেখে এমন ভাবনা অনেকর মনেই দানা বাঁধল যে এদেরই পূর্বপুরুষরা সুদূর অতীতে একদিন বালসা কাঠের ভেলায় চেপে সমুদ্রের উপকূলে ভেসে বেড়াত। এই দলে আছেন স্পেনীয়দের বংশধর—এ ছাড়াও আছে যুক্তরাজ্য গ্রেটব্রিটেন ফ্রান্স চীন আর্জেন্টিনা ও কিউবার রাষ্ট্রদূত, প্রশান্ত মহাসাগরের ব্রিটিশ কলোনীর গভর্ণর, সুইডেন ও বেলজিয়মের মন্ত্রী, ছোট্ট নরওয়ের কলোনীর আমাদের বন্ধুবান্ধবরা আর তাদের নেতা কনসাল জেনারেল ভার। তা ছাড়াও আছে—বহু সাংবাদিক। মুভি ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ হচ্ছে। একটি মাত্র জিনিসের অভাব দেখা যাচ্ছে। তা হল ঢাকী ও পেতলের বাদ্যযন্ত্রের বাদক সম্প্রদায়।

একটা বিষয় জলের মতো পরিষ্কার—উপসাগরের বাইরে ভেলা যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায়, আমরা বরং বালসা কাঠে ভাসতে ভাসতে পলিনেশিয়ায় যাব, কিন্তু এখানে আবার কখনই ফিরে আসব না। কদাচ না।

এই অভিযানের সেক্রেটারী ও প্রধান ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী জার্ড ভল্ড নারকেলের জল ছিটিয়ে ভেলার নামকরণ করবে। প্রস্তর যুগের রীতিনীতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকলেও কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য এটা ঘটেছে। কারণ শ্যাম্পেনের বোতল টরস্টেইনের নিজস্ব বাক্সের তলায় রয়ে গেছে। স্পেনীয় ও ইংরেজি ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হল—ইনকাদের স্বনামখ্যাত অগ্রদূত—যিনি দেবতা রূপে পূজিত, যিনি পেরু থেকে হঠাৎ পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হয়ে যান, আবার আবির্ভূত হন পলিনেশিয়ায় পনের শ বছর আগে, সেই মহান পুরুষ কন-টিকির নামানুসারে জার্ড ভেলার নামকরণ করলেন কন-টিকি। জার্ডভল্ড এমন জোরে ভেলার অগ্রভাগে নারকেলটা আঘাত করলেন (আগেই ভাঙা ছিল নারকেলটা) যে, যারা আশেপাশে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের চুলে অল্পবিস্তর জল ও শাঁসের টুকরো লাগল।

ভেলার পালের বাঁশ দুটো মাস্তুলের মাথায় তুলে ঝাঁকিয়ে পালটা খুলে ফেলা হল। পালের কাপড়ের মাঝখানে কন-টিকির শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানি আঁকা। এঁকেছে আমাদের শিল্পী এরিক। বিধ্বস্ত নগরী টিয়াহুনাকোয় লালপাথরে খোদাইকরা সূর্য-দেবতার যে-মূর্তি আছে, হুবহু তার নকল।

'আরে এ তো সেনর ডানিয়েলসন!' জেটীর কর্মীদের নেতা পালে-আঁকা শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানি দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

একখানা কাগজে আঁকা কন-টিকির ছবি দেখার পর থেকে সে বেণ্টকেই 'বেণ্ট সেনর কন-টিকি' বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখন সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। বেণ্টের আসল নাম ডানিয়েলসন।

যাত্রা করার আগে জনতা আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাল। অভিনন্দন-সভায় স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন। এর পর আমরা পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়। একেবারে পাহাড়ের অন্তঃপুরে ঢুকে গেলাম। শেষবারের মতো পর্বত ভৃগুমূলে পাথর স্তূপের দিকে তাকিয়ে রইলাম অপলক চোখে। এবার ভেসে পড়ব অসীম সমুদ্রে।

যখন সমুদ্র উপকূলে ভেলার কাজকর্ম হচ্ছিল আমরা লিমার বাইরে নারিকেল কুঞ্জবেষ্টিত একটা বোর্ডিং হাউসে থাকতাম। বিমানমন্ত্রকের গাড়ি করে ক্যালাও-এ আসা-যাওয়া করতাম। গাড়ির চালক একজন বেসরকারী লোক। জার্ডই তাকে যোগাড় করে দিয়েছিলেন। তাকে আমরা অনুরোধ করলাম একদিনের মধ্যে আমাদের পাহাড় থেকে ঘুরিয়ে আনতে। বালিময় রাস্তা। ইনকাদের সময়ে কাটা খালের পাশ দিয়ে ভেলার মাস্তুল থেকে বার হাজার ফুট মাথা-ঝিমঝিম-করা উচ্চতায় পৌছলাম। এখান থেকে বুভুক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে গিলতে লাগলাম—পাহাড়, শিলাখণ্ড আর সবুজ ঘাস। বিরাট আন্দিজ পর্বতমালা সামনে প্রসারিত। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা ও গভীর শান্তি বিরাজিত। আমরা সেই শান্তির মহাসমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেলাম। নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলাম—এই মাটি পাথরের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা। তাই পাল তুলে ভেসে পড়ব সমুদ্রে। সমুদ্রকে জানতে—বুঝতে।

॥ ৪ ॥

কন-টিকিকে যেদিন সমুদ্রে ভাসান হল ক্যালও বন্দরে সেদিন বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। নৌ-মন্ত্রীর নির্দেশ—জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়ার শক্তিশালী বাষ্পীয় পোত (টাগ) গার্ডিয়ান রিওস উপকূলভাগের জলযানের ভিড় কাটিয়ে উপমহাসাগর থেকে ভেলাটাকে পাহারা দিয়ে টেনে এনে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌছে দেবে।

এসব জায়গায় এক সময় আমেরিকার আদিবাসীরা ভেলায় চেপে মাছ ধরত। খবরের কাগজে যাত্রার সংবাদ বড় বড় কালো ও রক্তাক্ষরের শিরোনামায় ছাপা হয়েছে। তাই ২৮শে এপ্রিল সকাল থেকেই জেটীতে জনসমাগম হতে শুরু করেছে।

যাত্রার অন্তিম মুহূর্তে আমাদের ছ-জনের ভেলার পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে থাকার কথা। আমি এসে দেখি একমাত্র হেরমান ভেলার পাহারায় আছে। আমি ইচ্ছে করেই দূরে গাড়ি থামিয়ে সমস্ত বাঁধটা হাঁটতে হাঁটতে আসছি। শেষ বারের

মতো পা দুটো চালনা করে নিলাম। কে জানে জীবনে আর সে-সুযোগ কোনদিন ঘটবে কিনা। আমি লাফিয়ে ভেলার পাটাতনের উপর উঠে পড়লাম। চারদিকে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে কলা ও নানা ফলের বস্তা। বস্তাগুলো শেষ মুহূর্তে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ভেলায়। সবগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে বেঁধে রাখলাম। এই ফলফলাড়ির স্তূপের মধ্যে হেরমান বসে। হাল ছাড়া অসহায় অবস্থা। হাতে খাঁচা—খাঁচায় একটা তোতা পাখি। লিমার এক প্রিয় বন্ধু বিদায়কালে এই উপহারটি দিয়েছে তাকে। আমায় বলল হেরমান, 'খাঁচাটা দেখিস, আমি ডাঙ্গায় নেমে শেষ বারের মতো এক বোতল বীয়ার খেয়ে আসি। টাগ আসতে এখনও কয়েক ঘণ্টা দেরি আছে।'

হেরমান ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতেই জনতা আমাকে দেখিয়ে হাত নাড়তে লাগল। এমন সময় মোহনার মুখে তীব্র গতিতে গার্ডিয়ান রিওস এসে উপস্থিত হল। সামনেই মাস্তলের জটলা। সেই মাস্তুলের অরণ্য কাটিয়ে ভেলার কাছে আসা অসম্ভব তার পক্ষে, কাজেই দূরেই নোঙর ফেলতে হল। মস্ত বড় একটা মটোর বোট পাঠিয়ে দেওয়া হল ভেলাটাকে জাহাজের ভিড়ের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে আসতে। মটোর বোটে নাবিক, অফিসার, ফটোগ্রাফার আর মুভি ক্যামারায় গাদাগাদি। আদেশ জারির সঙ্গে সঙ্গে লম্বা একটা কাছি দিয়ে ভেলার সম্মুখভাগটা বেঁধে ফেলা হল। বেজে উঠল ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ।

'একটু অপেক্ষা করুণ,' তোতাপাখি হাতে হতাশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'বড্ড তাড়াহুড়ো করছেন। অভিযাত্রীরা এখনও এসে পৌছোয়নি।' শহরের দিকে হাত দেখিয়ে আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু হায়! কেউই বুঝতে পারল না আমার কথা। অফিসাররা অমায়িক হাসি হেসে দর্শনীয় ভঙ্গিতে ভেলার গলায় দড়ির মালা পরিয়ে দিল। আমি দড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। হাত নেড়ে আকারে ইংগিতে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলাম। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে তোতাটা ঠোঁট দিয়ে খাঁচা ভাঙতে চেষ্টা করল—দরজা আটকানোর কাঠিটা ঠোঁট দিয়ে তুলে ফেলতে সচেষ্ট হল। আমি সচেতন হতেই দেখি পাখিটা বাঁশের পাটাতনের উপর মনের আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে। আমি পাখিটাকে ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পাখিটা স্পেনীয় ভাষায় কর্কশ প্রতিবাদ জানিয়ে কলার স্তূপের উপর গিয়ে বসল। নাবিকরা সামনের দিকে দড়ি ছুঁড়ে মারছিল। তাদের দিকে চোখ রেখে আমি পাখিটাকে ধরবার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। পাখিটা কর্কশ চিৎকার করে কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা কোনায় আস্তানা নিয়েছে। আমিও কেবিনে ঢুকে খপ করে তার একটা পা চেপে ধরলাম। পাখিটা ডানা ঝটপটিয়ে আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল।

আমি বাইরে এসে পাখিটাকে আবার খাঁচায় বন্দী করে ফেললাম। ইত্যবসরে ডাঙ্গার নাবিকরা ভেলার নোঙর বাঁধার দড়ি কেটে দিয়েছে। যখন সমুদ্রের ঢেউ এসে বাঁধের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল আবার ফিরে যাচ্ছিল সমুদ্রের বুকে প্রতি-সরনকারী স্রোতের টানে, আমরা অসহায়ের মতো নাচছিলাম। হতাশা কবলিত হয়ে আমি একটা বৈঠা বাগিয়ে বিরাট একটা ঢেউয়ের আক্রমন ঠেকাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথাই। ভেলাটা জেটীর কাঠের স্তূপের গায়ে আছড়ে পড়ল। মটোর বোটটা সচল হয়ে উঠল—একটা ঝাঁকুনি খেয়ে কন-টিকি শুরু করল তার দীর্ঘ সমুদ্র-অভিসার।

ভেলায় আমার একমাত্র সঙ্গী হল স্পেনীয় ভাষাভাষী একটি তোতা। তোতাটা বিষন্ন চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে দেখছে খাঁচার ভিতর থেকে। তীরে সমবেত জনতা সহর্ষে চিৎকার করে উঠল—হাত নাড়তে লাগল। পেরু থেকে এই নাটকীয় যাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি মুভি ক্যামেরায় ধরতে আলোকচিত্র গ্রহণকারীরা উৎসাহের আতিশয্যে এমন লাফালাফি শুরু করল যে সমুদ্রে পড়ে যায় আর কি! আমি হতাশ দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি আমার সঙ্গীদের খোঁজে কিন্তু কারুরই পাত্তা নেই। এসে পৌঁছলাম গার্ডিয়ান রিওসের কাছে। বাষ্পের গর্জন শুরু হয়েছে—যে কোন মুহূর্তে নোঙর তুলে যাত্রা করবে। আমি চোখের পলকে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম ডেকেতে এমন হৈ চৈ বাধিয়ে তুললাম যে যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ হল। একখানা বাষ্পীয় নৌকো চলে গেল জেটীতে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। ফিরে এল এক দল সুন্দরী স্পেনীয় তরুণীকে নিয়ে কিন্তু তাদের দলে কন-টিকির একজনও হারানো অভিযাত্রী নেই। ব্যাপারটা মন্দের ভালো—কিন্তু আমার সমস্যা মিটল না। ভেলাটাকে ঘিরে ধরল সুন্দরীর দল আর নৌকোটা আবার ফিরে গেল অভিযাত্রীদের খোঁজে।

ইতিমধ্যে এরিক আর বেণ্ট হাঁটতে হাঁটতে জেটীতে এসে উপস্থিত। তাদের হাত ভর্তি বই আর এটা-ওটা টুকিটাকি। জনতা ঘরমুখো। তাদের সঙ্গে পথে দেখা। পুলিস বেষ্টনীর কাছে এলে একজন সহৃদয় পুলিস অফিসার বললেন, 'আর কোথায় যাবেন—দেখবার কিছু নেই।' বেণ্ট সিগার সুদ্ধ হাতের আঙুল দুলিয়ে জানালেন তাঁকে, তাঁরা দর্শক নন, ভেলার অভিযাত্রী।

'একথা বলে লাভ নেই,' একটু প্রশ্রয়ের সুরে বললেন অফিসারটি, 'এক ঘণ্টা আগে কন-টিকি যাত্রা করে গেছে।'

'অসম্ভব!' একটা পার্সেল দেখিয়ে বলল এরিক, 'এই লণ্ঠন রয়েছে আমার কাছে।'

'এ হল ভেলা-চালক', বললেন বেণ্ট, 'আমি হলাম তত্ত্বাবধায়ক।'

তাঁরা জোর করে ভিতরে ঢুকে গেলেন। কিন্তু ভেলা সত্যিই চলে গেছে। তাঁরা

মরিয়া হয়ে বাঁধের উপর পায়চারি করতে লাগলেন—এমন সময় বাকিদের সঙ্গে দেখা। তারাও অদৃশ্য-হওয়া ভেলার খোঁজে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময় জলযানটিকে আসতে দেখে তাতে চড়ে বসল সবাই। শেষ পর্যন্ত আমরা ছ-জন একত্রিত হতে পারলাম। গার্ডিয়ান রিওস আমাদের সমুদ্রে টেনে নিয়ে চলেছে, ভেলার চারপাশে জলরাশি ফেনায়িত হয়ে উঠছে।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় অবশেষে যাত্রা করলাম আমরা। পরের দিন সকালে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা উপকূলগামী জাহাজের ভিড় এড়িয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছলাম গার্ডিয়ান রিওস কিছুতেই আমাদের একা ছেড়ে দিল না। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমরা বাঁধ-এলাকা পেরিয়ে এলাম। প্রধান সমুদ্রে সবে ঢুকেছি—যে-সব জলযান আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল তারা একে একে ফিরে গেল। শুধু কয়েকটা বড় ইয়ট তখনও সঙ্গে এল একেবারে উপসাগরের মুখ পর্যন্ত,—দেখতে আমাদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়ায়।

কন-টিকি টাগের পিছন পিছন আসছে দড়ি-বাঁধা ক্রুদ্ধ পুরুষ ছাগলের মতো। টাগটা এগিয়ে চলেছে দরিয়ার দিকে। সমুদ্রের জল ভেলার পাটাতনের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা খুব সুবিধের ঠেকছে না। আমরা যেমন প্রত্যাশা করেছিলাম সে-তুলনায় সমুদ্র অনেক শান্ত। উপসাগরের মাঝামাঝি আসতে যে-কাছি দিয়ে বেঁধে ভেলা টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল ফটাস করে। আমাদের দিকের কাছির শেষ খণ্ডটা জলে ডুবে গেল পরম নিশ্চিন্তে। টাগটা বাষ্প উদ্‌গিরণ করতে করতে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। আমরা ভেলার পাশে শুয়ে হাত বাড়িয়ে টাগের দড়ির শেষ খণ্ডটা ধরতে চেষ্টা করতে লাগলাম। ইয়টরা এগিয়ে গেল টাগটা থামাতে। জামাকাপড় ধোয়ার গামলার মতো বড় বড় কাঁটাওয়ালা জেলীমাছ ভেলার দুপাশ দিয়ে ছিটকে বের হয়ে যাচ্ছে। ভেলাটানার কাছির সারা গা কাঁটাভরা হড়হড়ে জেলীর মতো পদার্থে মাখামাখি করে দিচ্ছে। ভেলাটা যে-দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা তার বিপরীত দিকে ভেলার পাশে উবু হয়ে শুয়ে জলে হাত ডুবিয়ে হাত আন্দোলিত করতে লাগলাম। এক সময় হড়হড়ে কাছিটা হাতের মুঠোয় পেয়ে গলাম। ভেলাটা যথারীতি গড়িয়ে চলেছে পিছনে। আমরা সমুদ্রে মাথা ডুবিয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের মাথার উপর দিয়ে বিরাট বিরাট জেলীমাছ আর লোনা জল বয়ে যেতে লাগল। মাথাটা জল থেকে তুলে থু-থু করে মুখ থেকে লোনা জল ফেলে দিলাম। আর মাথার চুল থেকে জবন্ত জেলীমাছের রোঁয়া টেনে টেনে বার করতে লাগলাম। টাগটা আবার কাছে এগিয়ে এল। কাছির শেষ প্রান্ত উঁচু হয়ে উঠল—ছুঁড়ে দিলেই হয়!

আমরা যখন দড়িটা টাগের পাটাতনের উপর ছুঁড়ে দিতে উদ্যত, হঠাৎ তরঙ্গের

তাড়নায় আমরা ভেলাসুদ্ধ টাগের পিছনের প্রক্ষিপ্ত অংশের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। জলের চাপে টাগের গায়ে চিড়েচেপটা হবার মতো সংকট ঘনিয়ে উঠল। আমরা হাতের সবকিছু ফেলে বাঁশের লগি ও বৈঠার সাহায্যে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রাণপন লড়তে লাগলাম। একটু দেরি হলে আর বাঁচার কোন আশা নেই। কিন্তু যথোপযুক্ত নিরাপদ অবস্থায় আসতেই পারলাম না—আমরা পাশাপাশি দুই তরঙ্গের খাদে পড়ে গেলাম। মাথার উপরের লোহার ছাদের নাগালই পেলাম না। এমন সময় জল ফুলে উঠতেই গার্ডিয়ান রিওসের পিছনের অংশটা জলেতে সম্পূর্ণ বসে গেল। যদি সেই সময় জলের টানে পড়তাম ভেলাসুদ্ধ আমরা সবাই টাগের তলায় চলে গিয়ে ছাতুছাতু হয়ে যেতাম। টাগের ডেকের উপর ভয়ার্ত লোকজনদের ছুটোছুটি চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। অবশেষে চালকযন্ত্র ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ভেলার পাশাপাশি সমস্তরালে চলে এল—বেঁচে গেলাম আমরা। টাগের প্রতিসরণকারী স্রোতের টান থেকে অব্যাহতি পেলাম। টাগের গায়ে ভেলার অগ্রভাগের জোর ঠোকাঠুকি হয়েছে দু-চারবার। এই ধাক্কায় অগ্রাংশ একটু থেঁতলে গেল। কিন্তু এই আঘাতজনিত ক্রটিটুকু সামলে আবার স্বাভাবিক চেহারা ক্রমশ ফিরে পেল বালসা কাঠ।

'কোন কিছুর মুখপাত বিশ্রীভাবে শুরু হলে তার পরিণতি সুষ্ঠুভাবেই শেষ হবে,' বলল হেরমান, 'এই টেনে নিয়ে যাওয়া পর্বটা শেষ হত যদি তো বাঁচতাম! ঝাঁকুনি খেতে খেতে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে!'

রাতভোর এই টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলল। আরও কয়েকবার ছোটখাট ঝাঁকুনিও খেয়েছি। ইয়টরা বহুক্ষণ আগেই বিদায় নিয়ে জেটীর দিকে চলে গেছে। পিছনে উপকূলের আলোর বর্তিকা অদৃশ্য। মাঝেমাঝে চলমান জাহাজের আলোক চক্ষু জলজল করে উঠছে রাতের অন্ধকারে। টেনে নিয়ে যাওয়া দড়ির উপর নজর রেখেছি আমরা পালা করে। আর তারই ফাঁকে ঘুমিয়ে নিয়েছি। পরের দিন ভোরের আলো ফুটে উঠলে দেখা গেল পেরুর উপকূলভাগ গাঢ় কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু সামনে পশ্চিম দিকে অপূর্ব নীল আকাশ ঝকঝক করছে। সমুদ্র শান্ত। একের পর এক তরঙ্গের মালা উঁচু হয়ে আসছে। তরঙ্গের চূড়োয় ফেনার মুকুট। পোশাক-আশাক কাঠ যা কিছুতেই হাত দিচ্ছি শিশিরে সিক্ত দেখা গেল। কনকনে ঠাণ্ডা। যদিও বার ডিগ্রী দক্ষিণে আমরা।

আমরা এখন হমবল্ড স্রোতের আওতায় এসে গেছি। এই স্রোতধারায় জলরাশি আসে কুমেরু অঞ্চল থেকে—চলে উত্তর দিকে পেরুর উপকূল ভাগ হয়ে—তারপর পশ্চিমদিকে ঠিক নিরক্ষরেখার নিচ দিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে যায়। ঠিক এখানেই পিজারো, জারেট প্রমুখ স্পেনীয়রা সর্বপ্রথম ইনকাদের বড় বড় ভেলা দেখতে পেয়েছিল। ভেলায়

চড়ে হুমবল্ড স্রোতে ভেসে পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল সমুদ্রের অভ্যন্তরে চলে আসত টানি অর্থাৎ ম্যাকরেল জাতীয় অতি বৃহদাকার সামুদ্রিক মাছ ও ডলফিন প্রভৃতি শিকার করতে। সারাদিন বাতাস উপকূলের দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে—সন্ধ্যার দিকে বায়ুর গতির পরিবর্তন হল। উপকূলের দিকে প্রবাহিত হতে লাগল বায়ু। দরকার হলে ভেলাকে উপকূলমুখো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

সকালের আলোয় দেখলাম ভেলার কাছেই টাগটা ভাসছে। টাগের সম্মুখভাগ থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমরা আমাদের ছোট রবারের ডিঙিটা জলে ভাসালাম। দেখাচ্ছিল ঠিক ফুটবলের মতো। ডিঙিতে চাপলাম আমি, এরিক আর বেন্ট। ডিঙিটা নাচতে নাচতে এসে গার্ডিয়ান রিওসের গায়ে লাগল—আমরা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে টাগের ডেকে উঠে এলাম। বেন্ট দোভাষীর কাজ করবেন। মানচিত্রে আমাদের অবস্থান ঠিক কোথায় দেখান হল। ক্যালাও বন্দর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আছি। চলেছি উত্তর-পশ্চিম বায়ুকোণের দিকে। প্রথম কয়েকটা রাত আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে—তা না হলে উপকূলগামী জাহাজের কবলে পড়ে ডুবে যেতে পারে ভেলা। আর কিছুদূর গেলে কোন জাহাজের দেখা মিলবে না। কারণ আমরা যে-পথ ধরে যাব, সে-পথে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন জাহাজ চলাচল করে না।

আমরা টাগের প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমরা যখন দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে লাগলাম অনেকেরই বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করতে লাগল আমাদের। রবারের ডিঙি ভাসতে ভাসতে কন-টিকির কাছে এল। এবার টেনে আনার দড়ি খুলে ফেলা হল। অসীম সমুদ্রে ভেলা সম্পূর্ণ একলা পড়ে গেল। গার্ডিয়ান রিওসের ডেকে রেলিং ধরে পঁয়ত্রিশ জন লোক হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাতে লাগল, যতক্ষণ না আমরা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেলাম। টাগের কোন চিহ্ন আর নজরে পড়ছে না। কন-টিকির উপরও ছজন লোক বাক্সের উপর বসে ফেলে-আসা টাগের দিকে তাকিয়ে থেকেছে যতক্ষণ দেখতে পেয়েছে তাদের। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দিগন্তের দিকে মিলিয়ে গেল। আমরা পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিলাম—এবার নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম।

'বিদায়! বিদায়!' সর্বপ্রথম কথা বলল টরস্টেইন, 'বৎসগণ, এবার আমাদের ভেলার ইঞ্জিন চালু করতে হবে!'

সবাই হেসে উঠলাম। বায়ুর গতি কোন্ দিকে পরীক্ষা করলাম। হালকা বাতাস বইছে দক্ষিণ থেকে অগ্নিকোণের দিকে। চতুষ্কোণ পাল তুলে দিলাম কিন্তু কুঁকড়ে রইল। পালে আঁকা বুড়োর চেহারা কুঞ্চিত—বেশ অসন্তুষ্ট দেখাল।

'বোধ হয় বুড়োর এটা পছন্দ নয়,' বলল এরিক, 'তাঁর যুবা বয়সে বাতাস আরও টাটকা ছিল।'

'মনে হচ্ছে আমরা পিছু হটছি,' বলল হেরমান। সামনের দিকে সে একটা কাঠের টুকরো ছুঁড়ে দিল জলে।

'এক-দুই-তিন…উনচল্লিশ, চল্লিশ, একচল্লিশ'—বালসাকাঠের টুকরোটা তখনও ভেলার পাশেই স্থির হয়ে আছে। আমাদের পাশ দিয়ে ভেলার অর্ধেকটাও অতিক্রম করেনি।

'মনে হচ্ছে এটাকে পাশে নিয়েই যেতে হবে,' টরস্টেইনের কণ্ঠে আশার স্বর ধ্বনিত হল।

'আশা করি সান্ধ্য বাতাসের সঙ্গে পিছু হটতে হবে না!' বললেন বেণ্ট, 'তাহলে ক্যালাওকে বিদায় জানানো একটা মারাত্মক পরিহাসে পরিণত হবে। শীগগির ফিরে আসার অভিনন্দন হারাতে হবে!'

এই সময় কাঠটা আমাদের ভেলার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছল। আমরা সোল্লাসে হুর-রা বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। শেষ মুহূর্তে ভেলার পাটাতনের উপর যেসব জিনিস এলোমেলো ভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ফেলেছিলাম সেগুলো আবার গোছগাছ করে এক জায়গায় জড়ো করে বাঁধাছাদা সেরে ফেললাম। বেণ্ট একটা খালি বাক্সের তলায় প্রাইমা স্টোভটা জ্বালালেন—তারপর গরম কোকো বিস্কুট সহযোগে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলাম। একটা টাটকা নারকেলও ফুটো করলাম। কলাগুলো এখনও কাঁচা আছে—পাকেনি।

'একদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের অবস্থা বেশ ভালো,' বলল এরিক হাসতে হাসতে। ওর পরনে ভেড়ার চামড়ার ট্রাউজার, মাথায় আদিবাসীদের মস্ত বড় একটা টুপি আর কাঁধে তোতাপাখিটা। সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিল, 'একটা জিনিস শুধু আমার অপছন্দ। আমরা যদি এইভাবে এখানে পড়ে থাকি, উল্টোপাল্টা স্রোত একসময় আমাদের উপকূলের পাহাড়ের গায়ে আছড়ে ফেলতে পারে।'

বৈঠা বাওয়ার কথা ভাবলাম। শেষ পর্যন্ত জোরাল বাতাসের জন্য অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত হল।

প্রার্থিত বাতাসও বইতে শুরু করেছে। অগ্নিকোণ থেকে একটা হাওয়া উঠে নিঃশব্দে এক নাগাড়ে বয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে ফুলে উঠল পাল। কন-টিকির মাথাটা লড়ুয়ের মতো ফুঁসে উঠল যেন। জল কেটে তর তর করে ভেসে চলল ভেলা। আমরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম ইংল্যাণ্ডের নাবিকদের মতো—ওয়েস্টওয়ার্ড হো। (চল চল, পশ্চিমদিকে চল)। দড়িদড়া টেনে পালের দিক ঠিক করলাম। দাঁড় নামানো হল জলে। কে কখন পাহারায় থাকবে তার পর্যায়-ক্রমের

তালিকা তৈরি হল। আমরা কাঠের টুকরো ও কাগজের গোলা পাকিয়ে ভেলার সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম আর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে হাতে ঘড়ি নিয়ে গুণতে লাগলাম,—

'এক, দুই, তিন···আঠার, উনিশ—এখন!'

কাগজ ও কাঠের টুকরো দাঁড়ের পিছনে চলে আসতে লাগল—সুতোয় বাঁধা মুক্তোর মতো ভেলার পিছনে ঢেউয়ের খাদে একবার পড়তে আর একবার চূড়োয় উঠতে লাগল। আমরা এগিয়ে চলেছি। কন-টিকির বাইচ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী তীক্ষ্ণ ছুঁচাল অগ্রভাগ জলযানের মতো তরতর বেগে জল কেটে ছুটছে না। ভেলার সামনেটা ভোঁতা, প্রশস্ত ও নিরেট—তাই অলস মন্থর গতিতে ঢেউয়ের উপর নাচতে নাচতে চলেছে, দুপাশে জল ছিটকানোর তাড়াহুড়োর বালাই নেই। কিন্তু একবার যখন চলতে শুরু করেছে—এগিয়ে যেতে লাগল অপ্রতিহত গতিতে।

এই মুহূর্তে হাল টানার ব্যবস্থাদি নিয়ে আমাদের সব থেকে বড় সমস্যায় পড়তে হল। স্পেনীয়দের বর্ণনা মতো হুবহু ভেলা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এমন কেউ এ যুগে বেঁচে নেই যে ভেলা চালানোর ব্যাপারে বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে। এ সমস্যা নিয়ে ডাঙায় যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু ফল যা পাওয়া গেছে তা অতি নগণ্য। এ ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতার দৌড় আমাদের মতোই। অগ্নিকোণমুখী বাতাসের গতিবেগ দ্রুত বাড়ছে—ভেলাকে এমনভাবে চালিত করতে হবে যাতে পালে বাতাস লাগবে পিছন দিক থেকে। যদি ভেলার পার্শ্ব-দেশ বাতাসের দিকে বড্ড বেশি চলে যায় অমনি পাল হঠাৎ ঘুরে গিয়ে মালপত্র মানুষ ও কেবিনের গায়ে জোরে আছড়ে পড়বে। সমস্ত ভেলাটাই তখন পাক খেয়ে ঘুরে যাবে—আবার আগের পথেই চলতে শুরু করবে—পিছন দিকটা যেদিকে সেই দিকে। তিন জন পাল নিয়ে বাতাসের সঙ্গে কঠোর লড়াই চালাতে লাগল, আর বাকি তিনজন দিক নিয়ন্ত্রণকারী দীর্ঘ হালের সাহায্যে ভেলার নাক অর্থাৎ অগ্রভাগ বাতাসের দিকে সরিয়ে নিতে সচেষ্ট হল। ভেলার গতি পরিবর্তন করার পর দাঁড়ী এবার খুব সতর্ক হয়ে রইল যাতে না এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যে-হালের সাহায্যে ভেলা নিয়ন্ত্রণ করা হবে সেটার দৈর্ঘ্য উনিশ ফুট। হাল বা দাঁড়টা ভেলার পিছন দিকে একটা বড় কাঠের খণ্ডের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা গোঁজের মধ্যে আলগাভাবে বসান। ইকুয়াডোরের প্যালেনকিউ থেকে কাঠগুলো যখন জলে ভাসিয়ে আনা হচ্ছিল আমার স্থানীয় বন্ধুরা ভেলা চালাতে এই হালটাই ব্যবহার করেছিল। গড়ান কাঠের তৈরি—ইস্পাতের মতো কঠিন। এত ভারী যে জলে পড়ে গেলে মুহূর্তে ডুবে যাবে। কাঠের দণ্ডের শেষ প্রান্তে হালের বিরাট ফলাটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। যখন বড় বড় ঢেউগুলো আমাদের দিকে তেড়ে আসছিল এই বিরাট হালটা বাগে রাখতে রীতিমতো হিমসিম

খেতে হচ্ছিল—দেহের সবশক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছিল। সমুদ্র-তরঙ্গ-আক্ষেপে পীড়িত আঙুলগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল হালের ফলাটা জলের মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখতে। এ সমস্যারও সমাধান করা গেল—হালের দণ্ডের সঙ্গে আড়াআড়ি একটা কাঠ বেঁধে। ব্যাপারটা এখন দাঁড়াল লিভার চালিত হালের মতো। ইতিমধ্যে বাতাসের গতিবেগ যথেষ্ট বেড়ে গেছে।

বিকেলের দিকে অয়ন-বায়ু সবেগে বইতে শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও ফুঁসে উঠল। তরঙ্গোচ্ছ্বাস ভেলার পিছন দিকে আঘাত করতে লাগল। এই প্রথম অভিজ্ঞতা হল—সমুদ্র নিজে এবার আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আসরে নেমেছে। ডাঙার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন। সমুদ্রে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে এগোবে কিনা একমাত্র নির্ভর করছে বালসা কাঠের গুণাগুণের উপর। আমরা জানি উপকূলমুখী বাত্যাপ্রবাহ আর পাব না—যা একমাত্র ভেলাটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে ডাঙার দিকে। আমরা সত্যিকার অয়ন-বায়ুর পথে পড়েছি। প্রতিদিনই আমাদের দূরে—আরও দূরে সমুদ্রের গভীরে ঠেলে নিয়ে যাবে। আমাদের একমাত্র কাজ হল পুরো পাল খাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া সামনের দিকে। যদি ঘরের দিকে ফিরতে চেষ্টা করি ভেলার পিছন দিক সামনে রেখে, তাহলেও বাতাস আমাদের ঠেলে নিয়ে চলবে ঘরের দিকে নয়—সমুদ্রের দিকে। একটিই মাত্র পথ খোলা, সে হল—সূর্যের অস্তাচলের দিকে ভেলার মুখ ঘুরিয়ে বায়ুর অনুকূলে পাল তুলে এগিয়ে যাওয়া।

আমাদের অভিযানেরও তাই তো উদ্দেশ্য। সূর্যের পথ পরিক্রমা করা। পেরু থেকে সমুদ্রে বিতাড়িত হয়ে কন-টিকি ও সূর্যোপাসকরা তো তাই করেছিল।

বিজয়ানন্দে ও স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ফেনময় তরঙ্গ যখন তেড়ে আসছে আমাদের দিকে, কাঠের ভেলা কেমন স্বচ্ছন্দে তরঙ্গের চূড়োয় উঠে পড়ছে। কিন্তু গর্জমান তরঙ্গ যখন তেড়ে আসছে, যে হাল ধরে আছে তার পক্ষে হাল ঠিকমতো ধরে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে! তরঙ্গ হালটাকে ঠেলে জল থেকে শূন্যে তুলে দিচ্ছে অথবা ফলাটা একপাশে সরিয়ে দিচ্ছে। তখন ঘুরপাক খাওয়া কর্ণধারের অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে অসহায় দড়াবাজিকরের মতো। সমুদ্র যখন আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মতো মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভেলার পিছন দিকে, দুজন দাঁড়ীও সমবেত চেষ্টায়ও হালটাকে ঠিকমতো বাগে রাখতে পারছে না। একটা বুদ্ধি মাথা খাটিয়ে বের করলাম আমরা। ফলার দড়ি ভেলার দুপাশ দিয়ে টেনে নিয়ে অন্য দড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলাম। আবার হালের মাথার দণ্ডটাও অন্য দড়িদড়ার সঙ্গে বাঁধা হল যাতে দাঁড়টা খেঁজের মধ্যে সীমিতভাবে নড়াচড়া করতে পারে। এইভাবে দাঁড়ের গতিবিধি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত করা গেল। সমুদ্রের চরমতম বিক্ষুব্ধ অবস্থাতেও এবার আমরা মোকাবিলা করতে পারব—যদি নিজেরা না ভেঙে পড়ি।

ক্রমশ দুই তরঙ্গ-শীর্ষের মধ্যবর্তী খাদ গভীরতর হতে লাগল অর্থাৎ আমরা হুমবল্ড স্রোতের দ্রুততম গতিবেগের মধ্যে পড়ে গেছি। সমুদ্রের এই উত্তাল অবস্থা বাতাসের জন্য নয়—স্রোতের গতিবেগের জন্যই। চারপাশে জলের রং সবুজ, জলও ঠাণ্ডা। পিছনে পেরুর বন্ধুর পর্বতমালা ঘন মেঘের প্রাচীরের আড়ালে অদৃশ্য। সমুদ্রের উপর যখন অন্ধকার নেমে এল, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শুরু হল আমাদের প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। এখনও আমরা সমুদ্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হতে পারিনি। নিকট ভবিষ্যতে সমুদ্র বন্ধু না শত্রু হয়ে দেখা দেবে, এখনও আমরা সে সম্বন্ধে অনিশ্চিতের গর্ভে আছি। অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে ফেলতেই আমরা চারপাশে সমুদ্রের সাধারণ শব্দ শুনতে পেতে লাগলাম। হঠাৎ কানে তালাধরানো তরঙ্গের হিসহিস শব্দে সচকিত হয়ে দেখলাম, আমাদের কেবিনের মাথা সমান উঁচু হয়ে সাদা দীর্ঘ উত্তাল তরঙ্গের চূড়ো এগিয়ে আসছে আমাদের ভেলার দিকে। আমরা শক্ত করে ভেলার কাঠ ধরে রইলাম, অস্বস্তিকর মন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন জলরাশি আমাদের ভেলার উপর ভেঙ্গে পড়বে।

কিন্তু প্রতি মুহূর্তে একই বিস্ময় আর স্বস্তির ধাক্কা। কন-টিকি অবিচলিত, প্রশান্ত ভাবে ভেলার পশ্চাৎ ভাগ তুলিয়ে আকাশমুখী ঢেউয়ের মাথার উপর চড়ে বসছে আর নিচের খাদে নামছে—অপেক্ষা করছে পরবর্তী ঢেউয়ের জন্য—এইভাবে ঢেউয়ের পর ঢেউ কাটিয়ে চলেছে নিঃশঙ্ক চিত্তে। বৃহত্তম ঢেউগুলো মাঝে মাঝে খুব তাড়াতাড়ি দুটো তিনটে একসঙ্গে এসে পড়ছে—তারপর ছোট ছোট ঢেউয়ের মালা। যখন এ রকম দুটো ঢেউ এত কাছাকাছি এসে পড়ে যে দ্বিতীয় ঢেউটা ভেলার পিছনের পাটাতনের উপর হামলে পড়ে। কারণ তখনও ভেলার অগ্রভাগ প্রথম ঢেউয়ের চূড়োয় উঠতে পারেনি,আকাশমুখী হয়ে আছে, নিচের খাদে নামবার সময় পায়নি। কাজেই এটা একটা অলঙ্ঘনীয় আইনে পরিণত হল যে দাঁড়ীর কোমরে দড়ির এক প্রান্ত বাঁধা থাকবে, আর-এক প্রান্ত বাঁধা থাকবে ভেলার সঙ্গে। কারণ ভেলায় আত্মরক্ষার গড়প্রাচীরের ব্যবস্থা নেই তো! দাঁড়ীর কাজ হল পালটা সবসময় বায়ু ভর্তি করে রাখা আর সেজন্য ভেলার পশ্চাৎভাগ ও পালটা যে-দিক থেকে তরঙ্গ ও বাতাস আসছে সেইদিকে রাখা।

একটা পুরানো জাহাজের দিকনির্ণয় যন্ত্র ভেলার পিছনের দিকের একটা বাক্সের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। এরিক কমপাসের কাঁটার অবস্থান দেখে ভেলার গতিপথ নিরূপণ করছে, আমাদের অবস্থান ও গতিবেগেরও হিসেব-নিকেশ করছে। এই মুহূর্তে আমরা কোথায় আছি, অনিশ্চিত। কারণ আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন আর দিগবলয় বলতে বিরাট বিরাট বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের সারিবদ্ধ জটলা। দু জন করে লোক প্রতিবারে দাঁড়ের দায়িত্ব নিচ্ছে—সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নৃত্যপরা দাঁড়ের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

আর বাকিরা দরজাহীন বাঁশের কেবিনে ঢুকে ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগল।

যখনই একটা বিরাট ঢেউ এসে আক্রমণ করছে দাঁড়ীরা দাঁড়-নিয়ন্ত্রণ দড়ির উপর ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে কেবিনের ছাদের একটা প্রলম্বিত বাঁশ চেপে ধরছে—জলরাশি ভীষণ গর্জন করে ভেলার পিছন দিক থেকে তাদের উপর এসে দুটো কাঠের ফাঁক দিয়ে বা ভেলার দু-পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। জল চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা লাফিয়ে নেমে দাঁড় ধরছে—যাতে না ভেলার গতিমুখ ঘুরে বা পালের কাপড় চুপসে যায়। যদি ভেলা ঢেউয়ের সঙ্গে কোণ করে এগোতে যায় ঢেউ সহজেই বাঁশের কেবিনের উপর ভেঙে পড়বে। ঢেউ পিছন দিক থেকে এলে জলরাশি বেরিয়ে থাকা কাঠের ফাঁক দিয়ে মুহূর্তে গলে যায়—কদাচিৎ কেবিনের বেড়ার কাছাকাছি আসে। পিছনের দিকের গোলাকার কাঠের ফাঁক দিয়ে জল আসে যেন কাঁটা চামচের কাঁটার ফাঁক দিয়ে আসছে। কাঠের ফাঁক যত বেশি থাকে তত ভালো—এটাই ভেলার সব থেকে বড় স্থবিধে। পাটাতনের বাঁশের ফাঁক দিয়েও জল বেরিয়ে যায়—কখনও কেবিনের ভিতরে জল ঢোকে না।

মাঝরাতে একটা জাহাজের আলো দেখতে পেলাম—জাহাজটা উত্তর দিকে চলেছে। রাত তিনটের সময় আর একটা জাহাকেও একই পথে যেতে দেখা গেল। আমরা আমাদের মোমবাতির আলো তাদের দিকে আন্দোলিত করলাম। তারা নিশ্চয়ই আমাদের আলো দেখতে পায়নি। উত্তর দিকে গাঢ় অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেল তারা। জাহাজের কেউ হয়ত ভাবতেও পারেনি, ইনকা যুগের ভেলা তাদের কাছাকাছি রয়েছে, তরঙ্গের তালে তালে নাচতে নাচতে গড়িয়ে চলেছে। আমরা যারা ভেলায় চড়েছি আমরাও ভাবতে পারিনি, যতদিন না সমুদ্রের অপর পাড়ে পৌঁছচ্ছি ততদিন এই আমাদের শেষ জাহাজ দেখা এবং মানুষেরও শেষ নিকট সান্নিধ্য।

সেই নিবিড় অন্ধকারে আমরা দুজন দুজন করে দাঁড়ের সঙ্গে লেপটে রইলাম। নতুন নতুন ঢেউয়ের স্পর্শ চুলে লাগছে। যতক্ষণ না সতর্ক হচ্ছি, অনবরত হালের গুঁতো খাচ্ছি পিছনে—ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে হাত আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে। গোড়ার দিকে বেশ কয়েকদিন দিনে-রাতে আমাদের শিক্ষানবিসি চলল। স্থলের জবুথবু আনাড়ী লোকগুলো দেখতে দেখতে ঝানু নাবিক হয়ে উঠল। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা প্রত্যেককে এক নাগাড়ে দু-ঘণ্টা কাজ করতে আর তিন ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে দেওয়া হল। এই নিয়মবিধি অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে লাগল। ব্যবস্থা হল প্রতি ঘণ্টা অন্তর একজন নতুন লোক এসে যে-দুজন দাঁড়ে দু ঘণ্টা অবস্থান করছে তার একজনকে অব্যাহতি দেবে কার্যভার থেকে।

ভেলা চালানোর সময় দাঁড় নিয়ন্ত্রণ করতে দেহের প্রতিটি মাংস-পেশী নিপীড়িত

হয়। দাঁড় ঠেলতে ঠেলতে যখন ক্লান্তি আসে, তখন স্থান বদল করে আবার টানি। যখন চাপ দিতে দিতে হাত ও বুক টাটিয়ে ওঠে তখন পিঠের সাহায্য নেই। হালের গুতোয় বুক ও পিঠ নীল ও সবুজ হয়ে ওঠে। অব্যাহতি দিতে বদলি আসা মাত্র আমরা কোন দিকে না তাকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ি—অর্ধ অচেতন অবস্থায়। পায়ে দড়ি বেঁধে লবণাক্ত জামাপোশাকেই শুয়ে পড়ি—ঘুমোনোর থলিতে ঢোকার আর অবসর হয় না। তার আগেই ঘুমের অতলে ডুবে যাই। শুতে না শুতেই মনে হয় পায়ের দড়িতে কে যেন অমানুষিক টান দিয়েছে। তিন ঘণ্টা নিশ্চয়ই কেটে গেছে। একজনকে বাইরে যেতে হবে। দাঁড়ী দুজনের একজনকে অব্যাহতি দিতে হবে।

পরের রাত্রে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল—শান্ত হওয়ার বদলে সমুদ্র আরও উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে। এক নাগাড়ে দীর্ঘ দু ঘণ্টা দাঁড় নিয়ে লড়াই করা সত্যিই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এর পর দ্বিতীয়বার যখন দায়িত্বভার আসে, তখন আর তার আগের মতো নিপুণতা থাকে না। সমুদ্র-তরঙ্গ তখন আধিপত্য বিস্তার করে আমাদের উপর—এপাশে-ওপাশে আছড়ে ফেলতে থাকে আমাদের। পাটাতনের উপর দিয়ে জল বয়ে যেতে লাগল। এবার আমরা এক ঘণ্টা দাঁড়ে থাকার পর দেড়ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে লাগলাম। এইভাবে ষাট ঘণ্টা কেটে গেল। উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে লড়াইয়ে একটুও বিরতি ছিল না। একের পর এক ফেনিল তরঙ্গ অবিশ্রান্ত আক্রমণ চালিয়েছে। কখনও উঁচু হয়ে, কখনও নিচু হয়ে, কখনও বর্শার ফলার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে এসেছে, কখনও বা চক্রাকারে, কখনও বা এসেছে তেরচা হয়ে। ঢেউয়ের উপর ঢেউ আক্রমণ চালিয়েছে। নিরুদ্ধ গতিতে।

সব থেকে বেশি হেনস্থা হয়েছে হুট। শেষ পর্যন্ত তাকে দাঁড়টানা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাকে সমুদ্র-দেবতা নেপচুনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে—কেবিনের এক কোনে নিঃশব্দে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ। তোতাপাখিটা খাঁচায় মুখ গোমরা করে বসে আছে। যেই ঢেউয়ের অপ্রত্যাশিত আঘাতে ভেলাটা নাড়া খাচ্ছে, পাখিটা চঞ্চু দিয়ে দাঁড়ের কাঠিটা কামড়ে ধরে ঝুলতে থাকে ডানা ঝাপটিয়ে। পিছন দিকে সমুদ্রের জল কেবিনের দেওয়ালের গায়ে এসে ছিটকে পড়ছে। কন-টিকি খুব একটা দুলছে না—বরং এই আকারের যে-কোন তরণীর চেয়ে অনেক সহজভাবে মানিয়ে নিতে পারছে। ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা কোনদিকে কাত হয়ে পড়বে পূর্বাহ্নে ভবিষ্যত বাণী করা সম্ভব ছিল না—আমরাও তখনও সহজভাবে ভেলায় নড়াচড়া করার কৌশলে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। ভেলাটা যেই দোল খাচ্ছিল অমনি নাড়া খেয়ে শিউরে উঠছিল।

তৃতীয় রাত্রে সমুদ্র অপেক্ষকৃত শান্ত হয়ে এল। তাহলেও ঢেউয়ের তাণ্ডব বেশ

তীব্রই ছিল। ভোর চারটের সময় অন্ধকারের গর্ভ থেকে এক অপ্রত্যাশিত ফেনায়িত জলোচ্ছ্বাস এসে আঘাত করল ডান পাশে। ভেলার মুখ ঘুরে গেল। দাঁড়ীরা বুঝতেই পারেনি কি ঘটছে। পাল বাঁশের কেবিনে আছড়ে পড়ল। এই বুঝি পাল কেবিন-টেবিন ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়—ভগ্ন হল! সবাই ছুটে এল ডেকে মালপত্র সামলাতে—পালের নিচের দড়িদড়া টানটানি করে পালকে ঠিকভাবে বিন্যস্ত করতে যাতে পালে হাওয়া লেগে ভেলা আবার ঠিক দিকে মোড় নেয়, আবার শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু ভেলা কোনমতেই সুস্থির হতে পারছে না। ভেলার পশ্চাৎভাগ সামনে চলে এসেছে—এই যা। আমাদের দড়িদড়া টানাটানি, দাঁড় চালানোর একটি মাত্র ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল—তা হল, আমাদের দুজন সঙ্গী অন্ধকারে সমুদ্রে ছিটকে গিয়েছিল কিন্তু পালে আটকে রক্ষা পেয়ে যায়।

যাক্, শান্ত হয়ে এল সমুদ্র। শরীর আড়ষ্ট, যন্ত্রণাক্লিষ্ট—হাতের তালুতে ফোস্কা পড়েছে, ছড়ে গেছে। চোখ ঘুমে ঢুলঢুলু—নিদ্রাকাতর। শরীরের শক্তি সংহত করতে এখন বিশ্রামের দরকার। সমুদ্র হয়ত আরও কঠোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত করতে পারে। তাই আমরা পাল নামিয়ে বাঁশের দণ্ডের সঙ্গে গুটিয়ে রাখলাম। কন-টিকি ঢেউয়ের পাশাপাশি অবস্থায় কর্কের মতো ভাসতে ভাসতে চলেছে। পাটাতনের উপরের সবকিছু আবার আঁটসাট করে বেঁধে রাখা হল। আমরা ছ জন হামা দিয়ে কেবিনের মধ্যে ঢুকে গেলাম- গাদাগাদি করে শুয়ে পড়লাম। তারপর ঘুমে অচৈতন্য—টিনে সংরক্ষিত সার্ডিনের মমির মতো।

আমরা ধারণা করতেই পারিনি, এই ভেলা-অভিযানের কঠিনতম দাঁড় নিয়ন্ত্রণের রিহার্সেল দিয়েছি আমরা। সমুদ্রের গভীরতম অন্তঃস্থলে যাওয়ার আগেই ইনকাদের ভেলা চালানোর সহজ সরল ও দক্ষতাপূর্ণ কলাকৌশল রপ্ত করে ফেলেছি আমরা।

পরের দিন আমাদের যখন ঘুম ভাঙল বেলা তখন অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। তোতাপাখিটা দাঁড়ে বসে লম্ফঝম্প ও ডাকাডাকি করছে, শিস দিচ্ছে। বাইরে তখনও সমুদ্র বেশ ফুলেফেঁপে উঠছে। বড় বড় খাড়া ঢেউ, কিন্তু গতকালের মতো এলোমেলো নয়। ঘুম ভাঙতে প্রথমেই নজরে পড়ল হলদে বাঁশের পাটাতনের উপর। সূর্যের কিরণ ধারার ঢল নেমেছে—চারপাশে রোদে স্নাত হয়ে সমুদ্রকে উজ্জ্বল বন্ধু-ভাবাপন্ন দেখাচ্ছে। সমুদ্র বড় বড় ফেনায়িত ঢেউ নিয়ে এগিয়ে এলে কি এসে যায় আমাদের, যদি আমরা শান্তিতে ভেলার উপর থাকতে পারি? কি এসে যায় যদি পর্বতপ্রমাণ ঢেউ নাকের সামনে এসে পড়ে, যখন জানি ভেলা তরঙ্গ শীর্ষে উঠে ফেনায়িত চূড়োকে বাষ্পীয় রোলারের মতো সমান করে দেবে—যেমন করে লুচির লেচিকে বেলে চ্যাপটা লুচি তৈরি করা হয়? শুধু তো বুক-কাঁপুনি-ধরা পর্বতপ্রমাণ

জলরাশি আমাদের শূন্তে তুলে ধরে কলকল খলখল গজরাতে গজরাতে ভেলার তলা দিয়ে চলে যাবে! বালসা ভেলা নয়—যেন কর্কের বাষ্পীয় রোলার!

দুপুরবেলা আমরা কোথায় এসেছি, আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে একটা হিসেব-নিকেশ করে এরিক এই সিদ্ধান্তে এল, পাল তুলে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা উপকূল বরাবর অনেকটা পথভ্রষ্ট হয়ে উত্তরমুখো সরে এসেছি। স্থলভাগ থেকে প্রায় শতাধিক মাইল দূরে এখনও আমরা হমবল্ড স্রোতের এলাকাতেই আছি। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে যে বিশ্বাসঘাতক ঘূর্ণি আছে আমরা কি শেষ পর্যন্ত তাদের পাল্লায় পড়ে যাব—এই সমস্যা একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল আমাদের সামনে। একটা বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটাও অসম্ভব নয়। ঘূর্ণির সঙ্গে তীব্র সমুদ্র স্রোতের কবলে পড়লে ভেলা হয়ত মধ্য আমেরিকার উপকূলের দিকে তাড়িত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের হিসেবমতো যদি ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হয়, উত্তরে গ্যালাপাগোসের দিকে নীত হবার আগেই আমরা প্রধান স্রোতের ধাক্কায় পশ্চিমে সমুদ্রের গভীরে চলে যাব। এখনও সোজা অগ্নিকোণ থেকে বাতাস বইছে। আমরা পাল তুলে দিলাম, ভেলার পশ্চাদভাগ সমুদ্রমুখো করে—দাঁড় নিয়ন্ত্রণের প্রহরায় ব্যস্ত রইলাম।

হুট সমুদ্র-পীড়া থেকে সামলে উঠেছে। সে আর টরস্টেইন দোনলা-দোলা মাস্তলের মাথার দণ্ডে বসে রহস্যময় রেডিও এয়্যারইঅ্যাল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগল—বেলুন ও ঘুড়ির সাহায্য এ্যায়রইঅ্যাল শূন্যে উঠিয়ে দিল। হঠাৎ কেবিনের ভিতরের রেডিও-স্টেশান থেকে একজন চিৎকার করে বলল, লিমা রেডিও-স্টেশান থেকে সংকেত পেয়েছে, ডাকছে আমাদের। তারা জানিয়ে দিল আমেরিকার রাষ্ট্র-দূতের বিমান উপকূল থেকে যাত্রা করেছে—আকাশ থেকে আমাদের শেষ বিদায় অভিনন্দন জানাবে এবং সমুদ্রে আমাদের অবস্থাও সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করবে। শীগগিরই বিমানের রেডিও-অপারেটারের সঙ্গে সোজাসুজি সংযোগ স্থাপিত হল। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে অভিযানের সেক্রেটারী জার্ড ভল্ডের সঙ্গে কথাবার্তা হল। সেও ঐ বিমানে ছিল। আমাদের বর্তমান অবস্থানের খবর যতদূর সম্ভব জানিয়ে দিলাম—ঘণ্টার পর ঘণ্টা গতিপথের সংকেত পাঠাতে লাগলাম। আর্মি-১১৯ বিমানটা চক্রাকারে আকাশে উড়ছিল—যখন কাছে আসছিল বা দূরে চলে যাচ্ছিল ইথারে কণ্ঠস্বর কখনও জোরাল, কখনও দুর্বলতর শোনাচ্ছিল। দুটো তরঙ্গের খাদে ছোট্ট ভেলাকে দেখতে পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের দেখার ক্ষমতাও সীমিত। অবশেষে বিমানটা খোঁজাখুঁজির ইতি ঘটিয়ে উড়ে চলে গেল উপকূলের দিকে। আমাদের সন্ধান নেওয়ার এটাই শেষ চেষ্টা।

এর পরের দিনগুলোতেও সমুদ্র উঁচু হয়ে উঠত। অগ্নিকোণ থেকে তরঙ্গমালা ফিল্‌ফিল গর্জন করে এগিয়ে আসত—দুটো তরঙ্গের মাঝখানে যথেষ্ট সমতলের ব্যবধান

নিয়ে। দাঁড়ীর পক্ষেও ভেলা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজসাধ্য ছিল না। ভেলার বাঁ দিক থেকে বাতাস ও ঢেউ আসছিল—তাই কদাচিৎ ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে হচ্ছিল দাঁড়ীকে —ভেলার পক্ষেও অবিচল গতিতে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল। বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই লক্ষ্য করতে লাগলাম, অগ্নিকোণ থেকে আসা অয়ন বায়ু আর হুমবল্ড স্রোত দিনের পর দিন আমাদের সোজা এমন একটা পথে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে যে একদিন সুনিশ্চত গ্যালাপাগোস দ্বীপের চারপাশের বিপরীতমুখী স্রোতাধরার সম্মুখীন হতে বাধ্য করবে। আমরা বায়ুকোণের দিকে এত দ্রুত এগিয়ে চলেছি যে সেইসব দিন-গুলোতে আমরা গড়পরতা পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল পথ অতিক্রম করেছি—একদিন তো একাত্তর মাইল পর্যন্ত।

'গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ কি খুব সুন্দর জায়গা?' হুট একদিন খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্নটা পেশ করল। দৃষ্টি ওর আমাদের মানচিত্রের দিকে। মানচিত্রে আমাদের অবস্থান মুক্তোর মালার মতো ফুটকি বসিয়ে দেখানো হয়েছে। সেই মালার একটা ফুটকিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখাচ্ছিল ঠিক একটা আঙুলের মতো—অভিশপ্ত দ্বীপটার দিকে যেন অশুভ ইংগিত করছে।

'একটুও নয়?' বললাম আমি, 'কলম্বাসের আসার অল্প কিছুদিন আগে ইনকা টুপাক উপানকুই ইকুয়াডোর থেকে গ্যালাপাগোসের দিকে যাত্রা করেছিল ভেলায় চেপে। কিন্তু ঐ দ্বীপে পানীয় জল না থাকায় কেউই সেখানে বসতি স্থাপন করতে পারেনি।'

'ঠিক আছে,' বলল হুট, 'ওখানে আমরা যাব না—কোনমতেই নয়।'

ভেলার চারপাশে সমুদ্রের নাচানাচিতে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে আমরা আর এই নাচানাচি নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমরা আর ভেলাটা যখন তরঙ্গের মাথায় চড়ে আছি, তখন হাজার হাজার বাঁও জলরাশি নিয়ে সমুদ্র একটু মাতামাতি করলে কি এসে যায়? সহজেই বোঝা যাচ্ছে বালসা কাঠ জল শুষে নেয়। পিছনের আড়াআড়ি পাতা কড়িকাঠের অবস্থা অন্যদের তুলনায় খারাপ—ভেজা কাই আঙুল চেপে ধরলে আঙুল ভিতরে ঢুকে যায়—শেষ পর্যন্ত প্যাচ প্যাচ করে জল বেরিয়ে আসে। আমি কোন কথা না বলে এক টুকরো ভেজা কাঠ ভেঙে নিয়ে জলে ফেলে দিলাম। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে টুকরোটা তলিয়ে গেল জলের তলায়। আমাদের মধ্যে আরও দু-তিনজনও গোপনে ঐরকম করেছে—ভেবেছে কেউ দেখতে পায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই সশ্রদ্ধ চোখে নিঃশব্দে জল সঁপসপে কাঠের টুকরোটা জলের তলায় তলিয়ে যেতে লক্ষ্য করল।

আমরা যখন যাত্রা করেছিলাম, তখন লক্ষ্য রেখেছিলাম ভেলার কতটা জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল আর কতটা জলের উপরে ভেসেছিল। কিন্তু বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে এটা লক্ষ্য করা কোনমতোই সম্ভব হয়নি। এই মুহূর্তে ভেলার কাঠ জলের উপর

ভেসে উঠছে—পর মুহূর্তে জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু কাঠের গায়ে ছুরি ঢুকিয়ে দেখা গেছে কাঠের উপরের দিকে এক ইঞ্চি বা তার কিছু বেশি বেশ খটখটেই আছে। এটা আনন্দের কথা। আমরা হিসেব করে দেখেছি যদি একই গতিতে জল ভিতরে ঢুকতো, ডাঙ্গায় পৌঁছানোর প্রত্যাশিত দিনের আগেই এই সময়ের মধ্যে ভেলা জলের উপরি ভাগের পরিবর্তে ঠিক নিচ দিয়ে চলত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভিতরে যে-রস জমা আছে তা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের কাজ করছে—প্রতিহত করছে জল শোষণ।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ আর একটা ভয় আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। তা হল দড়ির ব্যাপারটা। দিনের বেলা এত ব্যস্ত থাকতে হত যে এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথাই ঘামাতে পারতাম না। কিন্তু রাত্রে কেবিনের ভিতরে ঢুকলে তখন এ সম্বন্ধে ভাবার, অনুভব করার ও শোনার সময় হত একমাত্র। প্রত্যেকে যে যার শরের কাঠির মাদুরের শয্যায় শুয়ে থাকি—মাদুরের নিচে বালসা কাঠের নড়াচড়ার সময় মনে হয় যেন নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ভেলা নড়াচড়ার সঙ্গে নটা কাঠের দণ্ডই সমানভাবে আবর্তিত হয়। একটা উপরে ওঠে আর একটা নিচে নেমে যায় আর সেই সঙ্গে একটা মৃদু খসখস শব্দ ওঠে। খুব বেশি নড়াচড়া করে না। যেটুকু করে তাতেই মনে হয় আমরা যেন একটা জীবন্ত প্রাণীর পিঠে শুয়ে আছি—প্রাণীটা হাঁসফাঁস করছে। আমরা কাঠের উপর লম্বালম্বি শুতে পছন্দ করি। প্রথম দুটো রাত ভারি খারাপ কেটেছে—পরে এব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর আর অবসরই হয়নি। পরে দড়িগুলো ভিজে একটু ফুলে উঠেছে—কাঠের মশমশ শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে।

যা হোক ভেলার উপর কোথাও একটু এমন সমতল জায়গা ছিল না, যা নিশ্চল থাকতে পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমিকায়। ভেলার কাঠ অনবরত ওঠানামা করে—তার ফলে যে যে জায়গায় কাঠকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়েছে সেখানে যা কিছু থাকে, তাও নড়ে। বাঁশের পাটাতন, মাস্তুল, কেবিনের চারধারের ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া, পাতার ছাউনি-দেওয়া চাটাইয়ের ছাদ—সবকিছু দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা—দুমড়োচ্ছে। দৃষ্টির অন্তরালে ঘটলেও ঘটছে সব সময়। একটা কোণ উঁচু হয়ে উঠলে আর-একটা কোণ নিচু হয়ে যায়। ছাদের অর্ধেকটা সমস্ত কাঠের ছিলাকা সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেলে, ছাদের বাকি অর্ধেকটা ছিলাকা নিয়ে পিছনের দিকে সরে যাবে।যদি দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাই, সেখানে আরও বেশি জীবনের লক্ষণ-স্পন্দন ও নড়াচড়ার আভাস পাই। বাইরে আকাশ নিঃশব্দে বৃত্তাকারে ঘুরছে আর সমুদ্র লাফিয়ে শূন্যে উঠছে তাকে ধরতে।

দড়ির উপরই সব চাপ পড়ছে। সারারাত ক্যাঁচ-ক্যাঁচ হাঁস-ফাঁস কিচ-কিচ কাতরানি চলেছে—অন্ধকারে এখন দড়ির সমবেত বিচিত্র কণ্ঠের প্রতিবাদ। প্রতিটি দড়ি কত মোটা এবং কত শক্ত করে বাঁধা, দড়ি যেন তার নিজস্ব কায়দায় হিসেবনিকেশ নিচ্ছে।

প্রতিদিন সকালে আমরা দড়িদড়া পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করি—ভেলার ধার ধরে জলেতে মাথা ডুবিয়েও। দুজন আমাদের শক্ত করে ধরে থাকে কাঁধের কাছটায়। জলের তলায়ও দড়ি অটুট আছে কিনা পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু দড়ি ছেঁড়েনি—অটুটই আছে। নাবিকরা বলেছিল, এক পক্ষ কালের বেশি টিকবে না। তারপর সব দড়ি ঘষাঘষিতে ক্ষয়ে ছিঁড়ে যাবেই। এই এক সুরে গাঁথা সম্মিলিত মত সত্ত্বেও কোন প্রকার ক্ষয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণও দেখতে পাই না। বহুদূরে সমুদ্র গর্ভে যাওয়ার পর তবে এ সমস্যার সমাধান-সূত্র নজরে পড়ে। বালসা কাঠ এত নরম যে দড়ি শক্ত কাঠের গায়ে ধীরে ধীরে বসে যায়। তাই কাঠের ঘষা লেগে দড়ি ক্ষয়ে যাবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সপ্তাহখানেক পরে সমুদ্র শান্ত হয়ে এল। সমুদ্রের জল আর সবুজ নেই—নীল। আমরা বায়ুকোণের দিকে নয়—বায়ুকোণের পশ্চিমমুখো চলেছি। উপকূলের কাছাকাছি স্রোতের গণ্ডী কাটিয়ে আসতে পেরেছি তারই যেন একটা ক্ষীণ আভাস পাচ্ছি। সমুদ্রের অভ্যন্তরের দিকে যাবার সম্ভাবনাও প্রবলতর হয়ে উঠছে।

প্রথম দিন যখন অসীম সমুদ্রে একলা হলাম সেদিন ভেলার আশেপাশে মাছ ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। কিন্তু তখন ভেলা চালানোর ব্যাপার নিয়ে এত মশগুল ছিলাম যে মাছ শিকারের কথা চিন্তায়ও আসেনি। দ্বিতীয় দিন আমরা সন্তরণরত সারডিন মাছের এক বিরাট ঘন ঝাঁক দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর এল আট ফুট লম্বা নীল একটা হাঙ্গর—সাদা পেটটা তুলে ভেলার দাঁড়ে গা ঘষল। হেরমান ও বেংট খালি পা জলে ঝুলিয়ে দাঁড়ে বসেছিল। হাঙ্গরটা কিছুক্ষণ ভেলার চারপাশে খেলা করে বেড়াল—তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল, যে মুহূর্তে আমি হারপুনটা বাগিয়ে ধরেছি ছুঁড়ে মারবার জন্য।

পরের দিন দেখা দিল টানি, বনিটো ও ডলফিনরা। একটা বড় উড়ুক্কু মাছ উড়ে এসে ভেলার পাটাতনের উপর ধপাস করে পড়ল। উড়ুক্কু মাছকে টোপ হিসেবে বঁড়শিতে গেঁথে জলে ফেলতে না ফেলতেই দুটো বড় ডলফিন টেনে তুললাম। এক একটার ওজন কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড হবে। বেশ কয়েকদিন ধরে খেলুম দুটোকে। দাঁড়ে বসে কত রকম মাছ দেখতে পাই। তাদের নামই জানি না। এরপর একদিন শুশুকদের দঙ্গলের মুখোমুখি হলাম। তাদের সংখ্যা যে কত, গুণে শেষ করা যাবে না। ডিগবাজি খেয়ে কালো পিঠটা দেখিয়ে ভুস করে ডুবে যাচ্ছে। আমাদের ভেলার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তারা। অনবরত লাফিয়ে উঠছে আর ডুব খাচ্ছে। মাস্তুলে বসে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু শুশুকদের মেলা। যতই নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হচ্ছি আর উপকূল ভাগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, হামেশাই উড়ুক্কু মাছের দেখা মিলছে। অবশেষে শুধু নীলাম্বুরাশির মধ্যে এসে পড়লাম, সমুদ্র নিরবচ্ছিন্ন রাজোচিত ভঙ্গিতে

আবর্তিত হচ্ছে। সূর্য কিরণস্নাত প্রশান্ত মহাসাগর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। এই সময় উড়ুক্কু মাছেরা নিক্ষিপ্ত শরের মতো ছিটকে ওঠে সমুদ্রের বুক থেকে, আলোয় ঝলমলিয়ে উড়ে যায় সরল রেখায়—ওড়ার শক্তি নিঃশেষিত হতে আবার সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হয়ে পড়ে।

রাত্রে আলো জেলে রাখলে, উড়ুক্কু মাছেরা সেই আলোয় আকৃষ্ট হয়। ছোটবড় মাছেরা বৃষ্টিপাতের মতো ভেলার উপর লাফিয়ে পড়ে, কখনও বা মাস্তুল ও বাঁশের কেবিনে ধাক্কা খেয়ে অসহায়ের মতো পাঠাতনের উপর ছিটকে পড়ে। সাঁতরে বা উড়ে পালাতে পারে না—পাটাতনের উপর দাপাদাপি করে বড় চোখ, বড় বড় পাখনা হেরিং মাছের মতো। এ রকমও প্রায়ই ঘটে—ডেকের উপর একজন দাঁড়িয়ে আছে একটা ঠাণ্ডা উড়ুক্কু মাছ বেগে উড়ে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে তার গালে আঘাত করেছে। আর তখন সে রাগে যা-তা বকতে শুরু করে দেয়। এরা বেশ বেগে উড়ে আসে তুণ্ড সামনে নিয়ে। তখন যদি কারুর মুখে এসে ঘা খায়, গাল যন্ত্রণায় বেশ টনটন করতে থাকে। কিন্তু এই অকারণ আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিটি মুহূর্তে তার দোষ ক্ষমা করে দেয়। কারণ সবরকম অসুবিধে সত্ত্বেও আমরা এখন এক রহস্যময় মায়াময় সামুদ্রিক জগতে এসে পড়েছি, যেখানে বাতাস থেকে সুস্বাদু মাছ ছিটকে এসে পড়ছে ভেলায় আপনা হতেই। আমরা মাছ ভাজা খেয়ে প্রাতরাশ করি। মাছের, না রান্না, না খিদের জন্য বলতে পারব না, তারা আমাদের আঁশ ছাড়ালেই ট্রাউট মাছের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে রান্না করবে অর্থাৎ পাচকমশাই সকালে ঘুম থেকে উঠে ডেকের চারধার ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রে যত উড়ুক্কু মাছ ডেকের উপর এসে পড়ে, সংগ্রহ করে। ছ-সাতটা তো প্রায় রোজই পাওয়া যায়। একদিন বেশ পুরুষ্টু ছাব্বিশটা উড়ুক্কু মাছ পেয়েছিলাম। একদিন সকালে বেন্ট তো বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ফ্রায়িংপ্যান হাতে নিয়ে কাজ করছিলেন, এমন সময় একটা উড়ুক্কু মাছ এসে তাঁর হাতে গোঁত্তা খেয়ে পড়ল—রান্না করার চর্বিতে না পড়ে। সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের এই যে প্রতিবেশীসুলভ ঘনিষ্ঠতা টরস্টেইন তার মর্ম সঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি এতদিন। কিন্তু একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল তার বালিসের তলায় একটা সার্ডিন রয়েছে। কেবিনে জায়গা কম—তাই তাকে দরজার মুখে মাথাটা রেখে ঘুমোতে হয়। কেউ যদি রাত্রে বাইরে বের হতে অসাবধানবশত তার মুখে পা ফেলে, অমনি সে তার পায়ে কামড়ে দেয়। টরস্টেইন সারডিনটাকে লেজে জড়িয়ে ধরে তার কানে কানে বলল—সারডিনরা তার খুব প্রিয়। আমরা বিবেকতাড়িত হয়ে পা গুটিয়ে শুই, যাতে পরের দিন রাত্রে টরস্টেইন শুতে বেশি জায়গা পায়। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার ফলে রেডিও কর্ণারের কাছে যেখানে রান্নার বাসন-

কোসন থাকে, তার উপরে শোবার জায়গা করে নিতে হল তাকে।

কয়েক রাত্রি পরের ঘটনা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নিঃরন্ধ্র অন্ধকার। টরস্টেইনের মাথার কাছে মোমবাতির আলো জ্বলছে—রাত্রে যারা পাহারায় থাকবে, পাহারা বদলের সময় তারা ভিতরে ঢুকবে বা যারা বাইরে বেরিয়ে আসবে, তখন যেন তাকে দেখতে পায়। ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল টরস্টেইনের। বাতিটা গড়িয়ে পড়ে গেছে। ঠাণ্ডা কি একটা তার কানের কাছে ডানা ঝটপট করছে। উড়ুক্কু মাছ ভেবে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে বাইরে ফেলে দেবার জন্য হাত বাড়াল টরস্টেইন। ধরে ফেলল লম্বা কি একটা। জলসিক্ত। সাপের মতো কিলবিল করছে। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। হাতটা যেন আগুনে পুড়ে গেল! অদৃষ্ট আগন্তুক পাক খেতে খেতে এগিয়ে গেল হেরমানের দিকে। আর টরস্টেইন মোমবাতিটা আবার জ্বালাতে চেষ্টা করল। চমকে উঠল হেরমান। আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। অক্টোপাশের কথা মনে পড়ে গেল। সমুদ্রে এই সময় অক্টোপাশের আবির্ভাব ঘটে থাকে।

আলো জ্বালা হলে দেখা গেল হেরমান উঠে বসেছে। একটা লম্বা সরু মাছের গলা চেপে ধরে আছে, যেটা ঈলের মতো তার হাতে কিলবিল করছে। লম্বায় তিন ফুট হবে। সাপের মতো নরম তনুদেহ। কালো চোখের মণিদুটো জ্বল জ্বল করছে। ছুঁচলো তুণ্ডদেশ। মুখে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। লোভাতুর। দাঁতগুলো ছুরির ফলার মতো ধারালো। দাঁতগুলো আবার ছুরির ফলার মতোই মুখের ভিতরে ভাঁজ করা যায়—যা খায় তা গিলে ফেলার সুবিধে হয় তাতে। হেরমানের হাতের চাপে একটা বড়সড় চোখ, সাদা আট ইঞ্চি লম্বা মাছ বের হয়ে এল পেট থেকে—তারপর আর একটা। এই শিকারী সাপ-মাছের দাঁতে ছিন্নভিন্ন দুটো গভীর জলের মাছ। সাপ মাছটার গায়ের চামড়া পিঠের দিকে নীলাভ বেগনী আর তলার দিকটা ইস্পাতের মতো নীলচে। চেপে ধরতে আঁশের মতো খুলে আসতে লাগল।

আমাদের চেঁচামেচিতে শেষ পর্যন্ত বেণ্টেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা বাতি ও মাছটা তাঁর নাকের কাছে নিয়ে এলাম। তিনি স্লিপিং ব্যাগ থেকে ঘুম জড়ানো চোখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'না এরকম কোন মাছের অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে।' বলেই আবার তিনি শুয়ে পড়লেন—সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

খুব একটা ভুল কথা বলেননি বেণ্ট। বাঁশের কেবিনে আমরা দু জন যারা বসেছিলাম আলোর চারধারে, আমরাই প্রথম এরকম মাছ জ্যান্ত দেখেছি। দক্ষিণ আমেরিকা ও গ্যালাপাগোস দ্বীপের উপকূলে এই রকম মাছের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। মৎস্যবিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন জেমফাইলাস বা সাপ-ম্যাকরেল। তাঁদের ধারণা সমুদ্রের গভীর তলদেশে বাস করে এরা—কারণ এরকম মাছ জ্যান্ত দেখার সৌভাগ্য হয়নি কারুর। কিন্তু এরা যদি সমুদ্রের গভীর তলদেশেই বাস করে, এরা

তাই করতেই বাধ্য, কারণ সূর্যের আলো এদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বড় বড় চোখ নিয়েও দিনের আলোয় কিছু দেখতে পায় না। মিশ কালো রাতে এরা সমুদ্রের উপরে ভেসে ওঠে। তাই ভেলায় এদের চাক্ষুস দেখার সৌভাগ্য হল আমাদের।

এই দুর্লভ-দর্শন মাছটি যেদিন টরস্টেইনের স্লিপিং ব্যাগের উপর লাফিয়ে পড়েছিল, তার এক সপ্তাহ পরে আবার এর দর্শন পেয়েছিলাম। ভোর চারটে। চাঁদ অস্তমিত। তাই চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। তবে আকাশে তারারা মিটমিট করছে। ভেলা ভেসে চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে। পাহারার কাজ শেষ হতে আমি ভেলার ধার ঘুরে দেখছিলাম, নতুন পাহারাদারের পক্ষে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা, হাতে মোমবাতি। একেবারে ধার ঘেঁষে শেষ কাঠটার উপর দিয়ে চলেছি খুব সতর্কভাবে। মাস্তুলটাকে ঘুরে আসব। কাঠটা ভেজা আর পিচ্ছিল। হঠাৎ পিছন থেকে আচমকা কেউ আমার দড়িটা চেপে ধরায় ভীষণ রেগে গেলাম আমি। এমনভাবে দড়িটা ঝাঁকুনি খেল প্রায় জলে পড়ে গিয়েছিলাম আর কি! আমি আলো হাতে অগ্নিশর্মা হয়ে পিছনে তাকালাম, কিন্তু কোন জনপ্রাণীকেও দেখতে পেলাম না। আবার ঝাকুনি খেল দড়িটা। এবার তাকাতেই দেখি চকচকে কি একটা কিলবিল করছে ডেকের উপর। একটা নতুন সাপ-মাছ। এমন শক্ত করে দড়ি কামড়ে ধরেছে যে দড়িটা আলগা করতে সাপটার কয়েকটা দাঁত ভেঙে গেল। খুব সম্ভবত লণ্ঠনের আলো পড়ে সাদা দড়িটা চকচক করে উঠেছিল, আর সুস্বাদু খাবারের লোভে আগন্তুক সমুদ্রের বুক থেকে লাফিয়ে উঠে কামড়ে ধরে ছিল দড়িটা—বেশ লম্বা রসাল খাবার হবে ভেবে! এবার তাকে ফরমালিনের বয়মে আশ্রয় নিতে হল।

যে-লোক সমুদ্র-পৃষ্ঠের সঙ্গে এক সমতলে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ভেসে চলে, সমুদ্র তার জন্য নানা বিস্ময়ের ঝাঁপি খুলে ধরে। একজন শিকারী বন ভেদ করে চলে এসে বলতে পারে বনে কোন বন্য জন্তু নেই। অথচ আর একজন যদি গাছের গুঁড়ির উপর চুপচাপ বসে থাকে, প্রতীক্ষা করে,—তাহলে শুনতে পাবে পাতার মর্মর, ফিসফিস, দেখতে পাবে পত্রান্তরাল থেকে অদ্ভুত চোখের উঁকি ঝুঁকি। সমুদ্রের ব্যাপারেও ঠিক তাই ঘটে। আমরা সাধারণত বড় বড় জাহাজে করে সমুদ্রে যাই, ইঞ্জিনের গর্জন, পিস্টনের ওঠানামা চলে। ফেনায়িত জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে জল কেটে চলে জাহাজ। আমরা ফিরে এসে বলি বিক্ষুব্ধ অনন্ত জলরাশি ছাড়া সমুদ্রে দেখবার কিছু নেই।

সমুদ্র-বক্ষে ভেলায় করে ভেসে যাওয়ার সময় এমন একটা দিন যায়নি—যেদিন একটা-না-একটা কৌতূহলী জীবের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়নি—তারা ভেলার চারপাশে ঘোরাফেরা করে চোখে অফুরন্ত কৌতূহল নিয়ে। কিছু পাইলট মাছ আর

ডলফিন আমাদের এত ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তারা সব সময় ভেলার আশেপাশে ঘুরে বেড়াত—ভেলার সহযাত্রী হয়ে পড়েছিল।

রাত আসে। অন্ধকার আকাশে তারারা আলোর চোখ টিপতে থাকে আর সমুদ্রের বুকে তারাদের সঙ্গে চলে ফসফরাসের ঝিকিমিকি দীপ্তির প্রতিযোগিতা। আর ভাস্বর প্ল্যাংকটনদের দেখায় ঠিক জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মতো। যখন তারা ঢেউয়ের ধাক্কায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেলার দাঁড়ের উপর রাখা আমাদের অনাবৃত পায়ের কাছে আসে, আমরা ভয়ে পা ভেলার উপর তুলে ফেলি। ওদের ধরেওছি। তখন বুঝলাম ওরা চিংড়ি গোষ্ঠীর অত্যুজ্জ্বল ক্ষুদে জ্বলন্ত প্রাণী। এই রকম রাত্রে মাঝে মাঝে বুকটা ঢিব ঢিব করে উঠত যখন দেখতাম দুটো জ্বলন্ত চোখ আমাদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। ঐ দৃষ্টিতে কেমন একটা সম্মোহন-শক্তি আছে যেন! এরা প্রায়ই বড় বড় স্কুইড—জলের উপর ভেসে চলেছে আমাদের সঙ্গে। অন্ধকারে প্রেতাত্মার মতো বীভৎস সবুজ চোখ ফসফরাসের দীপ্তি নিয়ে জ্বল জ্বল করে। তারা আমাদের ভেলার আলোয় আকৃষ্ট হয়ে সমুদ্রের গভীর জল থেকে ভেসে উঠেছে জলের উপরে। সমুদ্র যখন শান্ত থাকে, ভেলার চারপাশে কালো কালো গোলগোল মাথা দেখা যায়। মাথার ব্যাস দু-তিন ফুট হবে। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে আমাদের আলোর দিকে। তাদের চোখও অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে। কোন কোন রাত্রে তিন ফুট বা তার চেয়েও বড় ব্যাসের আলোর গোলক মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক বাতির মতো জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়।

আমরা ক্রমশ সমুদ্রের অন্তঃপুরচারী প্রাণীদের সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। তা হলেও মাঝে মাঝে নতুন নতুন প্রাণীর আবির্ভাবে আমাদের বিস্ময় চরমে উঠতে লাগল। এক মেঘাচ্ছন্ন রাতে—দুটো হবে তখন, দাঁড়ীর পক্ষে কালো জলকে কালো আকাশ থেকে পৃথক করতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। এমন সময় একটা ক্ষীণ আলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—যা ক্রমশ বিরাট প্রাণীর আকার ধারণ করল। আলোটা বস্তুত প্রাণীটার গায়ে লেগেথাকা প্ল্যাংকটনের আলো, না প্রাণীটার গা থেকে ফসফরাসের দ্যুতি বের হচ্ছে, বোঝা কঠিন। যাই হোক, কালো জলে ভয়ঙ্কর প্রাণীটার তরঙ্গায়িত এক অস্পষ্ট দেহ-রেখার সৃষ্টি করেছে। কখনও গোল, কখনও ডিম্বাকার, কখনও বা ত্রিভুজাকার দেখালেও, হঠাৎ দুটো ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দেহ আর বিচ্ছিন্ন দুটো দেহ ভেলার নিচে ইতস্তত: নড়াচড়া করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তিনটে ভৌতিক প্রাণী আমাদের ভেলার নিচে চক্রাকারে ধীর গতিতে ঘুরতে লাগল।

সত্যিকারের দানবীয় প্রাণী। যে-অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল তাই প্রায় তিরিশ ফুট লম্বা হবে। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি এসে ডেকের উপর জড়ো হলাম। লক্ষ্য

করতে লাগলাম এই ভৌতিক নাচ। ভেলাকে কেন্দ্র করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে লাগল এই নাচ। রহস্যময় নিঃশব্দ এই ঝকমকে প্রাণীটা জলের বেশ তলা দিয়ে চলেছে। বেশির ভাগ সময় ভেলার ডান পাশ দিয়ে—ভেলার আলোটা তো ডান দিকেই। কিন্তু প্রায়ই ভেলার তলায় চলে যাচ্ছে বা দেখা দিচ্ছে বাঁদিকে। পিঠের যে-আলোর চিকচিকানি নজরে পড়ছে, তা থেকে বোঝা যায় প্রাণীটা হাতির চেয়েও বড়। তবে তারা যে তিমি নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ কোন সময়েই তারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে জলের উপর ভেসে উঠছে না। দৈত্যকায় রে-মাছ হয় যদি, গা মোড়ামুড়ি করলে তাদের চেহারার অদলবদল হচ্ছে কি? ওদের প্রলুব্ধ করতে আলোটা একেবারে জলের উপরে ধরলেও তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই নিচ্ছে না। আমাদের উদ্দেশ্য—আলোয় চেহারাটা দেখে নেওয়া। ঠিক ভূত পেত্নীর মতো ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমুদ্রের অতলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই তিনটে ঝিকিমিকি প্রাণীর নৈশ অভিযানের কোন সঙ্গত কারণই খুঁজে পেলাম না। তবে দেড় দিন পরে ভর দুপুর বেলা তাদের পুনরাবির্ভাবে সব কিছুর ফয়সালা হয়ে গেল।

চব্বিশে মে ভেলাটা ঠিক ৯৫° পশ্চিম ৭° দক্ষিণ কোণ ঘেঁষে চলেছে—মন্থর গতিতে। সকালে দুটো ডলফিন ধরেছিলাম। তাদের নাড়ীভুঁড়ি জলে ফেলে দিয়েছিলাম। আমি গা জুড়োতে ভেলার সামনের দিকে জলেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। চোখ রেখেছি চারদিকে। একটা দড়ির প্রান্ত হাতের মুঠিতে ধরা। এমন সময় একটা বাদামী মাছ আমার দিকে এগিয়ে এল। ফুট ছয়েক লম্বা হবে। সমুদ্রের জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। এ আবার কি ধরনের প্রাণী, যাচাই করতে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমিও দ্রুত ভেলায় লাফিয়ে উঠে চনচনে রোদে বসে রইলাম দেখতে—এ আবার কি ধরনের মাছ! মাছটা নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হুট বসে ছিল বাঁশের কেবিনের পিছন দিকে। এমন সময় তার মুখে উত্তেজিত 'রণং দেহী' হুঙ্কার শুনতে পেলাম। 'হাঙর' 'হাঙর' বলে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। চলল যতক্ষণ না গলা খাদে নেমে এল। রোজই তো আমাদের ভেলার পাশ দিয়ে কত হাঙর আসা-যাওয়া করে দেখতে পাই। কিন্তু এত উত্তেজনার কারণ তো ঘটেনি কখনও। বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ ঘটেছে! আমরা হুটের সাহায্যে এগিয়ে এলাম ভেলার পিছন দিকে।

হুট ভেলার পিছনে বসে সমুদ্রের ফুলে-ওঠা জলে প্যাণ্টটা ধুচ্ছিল। মুহূর্তের জন্য মুখ তুলে তাকাতেই তার দৃষ্টি এক বৃহত্তম কুৎসিততম প্রাণীর দিকে আকৃষ্ট হল। সেরকম বীভৎস মুখ আমরাও জীবনে কখনও দেখিনি। এক সামুদ্রিক দানবের মুখ। সমুদ্রের সেই বুড়ো মানুষটিও (দি ওল্ড ম্যান অফ দি সী) যদি এখন হঠাৎ এসে পড়ত, তাহলেও আমাদের মনে কোন গভীর রেখাপাত করত না। মাথাটা প্রশস্ত,

ব্যাঙের মতো চ্যাপ্টা। দুপাশে দুটো কুতকুতে ছোট চোখ। কুনো ব্যাঙের মতো চোয়াল—চার থেকে পাঁচ ফুট প্রশস্ত। মুখের দুপাশ থেকে চামড়ার ঝালর ঝুলছে পত্ পত্ করে। মাথাটার পিছনে বিপুল দেহকাণ্ডটা এসে শেষ হয়েছে লম্বা পাতলা লেজে। লেজের উপান্তে তীক্ষ্ণ ছুঁচালো পুচ্ছ-পাখনা। লেজটা সোজা শূন্যে উত্থিত। এর থেকেই প্রমাণিত যে এটা তিমি মাছ নয়। জলের তলায় গায়ের রঙ বাদামী দেখাচ্ছে। মাথা ও দেহকাণ্ড সাদা সাদা ফুটকিতে ভরা।

শান্তভাবে ভেলার পিছু পিছু এগিয়ে আসছে দানবটা—বুলডগের মতো দাঁত বের করে। লেজ আন্দোলিত করছে। পিঠের বিরাট বর্তুলাকার পাখনা মাঝেমাঝে ভেসে উঠছে জলের উপর—কখনও বা পুচ্ছ পাখনাও। যখন দুটো ঢেউয়ের মাঝখানে পড়ে যাচ্ছে প্রাণীটা, জল পিঠের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—যেন একটা নিমজ্জিত পাহাড়কে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। প্রশস্ত চোয়ালের সামনে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে এক দঙ্গল পাইলট মাছ যাচ্ছে আগে আগে। মাছগুলোর গা জেব্রার মতো ডোরাকাটা। বিরাট দেহের সঙ্গে সেঁটে আছে একটা বড় রেমোরা মাছ আর পরজীবীরা। দেখে মনে হবে একটা ভাসমান গভীর জলের পাহাড়কে ঘিরে আছে অদ্ভুত এক দল প্রাণীর ঝাঁক।

আমাদের ভেলার পিছন দিকে ছটা বড় বড় বঁড়শিতে পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের একটা ডলফিন বাঁধা ছিল হাঙরের টোপ হিসেবে। এক ঝাঁক পাইলট মাছ এগিয়ে এসে শুঁকল ডলফিনটাকে, আবার ছিটকে ফিরে গেল ওদের সমুদ্রের রাজা—প্রভুর কাছে। যন্ত্রচালিত দানবের মতো এর দেহের কলকবজা যেন কাজ করছে। আলস্য মন্থর গতিতে ডলফিনটার কাছে এগিয়ে এল। ডলফিনটা যেন ওর বিরাট চোয়ালের কাছে তুচ্ছ, হেলাফেলার খাদ্য সামগ্রী। আমরা ডলফিনটা ভেলার উপর টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম—দানবটা ধীরে ধীরে ভেলার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এল। মুখ হাঁ করল না—ডলফিনটাকে শুধু মুখে আঘাত করতে দিল। যেন এরকম একটা তুচ্ছ খাবারের জন্য মুখের দরজাটা হাট করে খোলা আদৌ সঙ্গত নয়। দানবটা ভেলার কাছে এসে ভারী দাঁড়টার গায়ে পিঠ দিয়ে ঘষল। দাঁড়টা ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা জলের উপর টেনে তুলেছি। এবার দানবটাকে অতি কাছ থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া গেল। এত কাছ থেকে যে, আমরা যেন পাগল হয়ে গেলাম। আমরা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লাম—অভূতপূর্ব প্রাণীটার দিকে চেয়ে উত্তেজিত চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। উর্বর কল্পনা নিয়েও ওয়াল্ট ডিজনে এমন একটা লোম-খাড়া-হয়-ওঠা ভয়াল দানবের কল্পনা করতে পারত না। হঠাৎ দানবটা বীভৎস-চোয়াল নিয়ে আমাদের ভেলার একেবারে পাশে এসে পড়ল।

দানবটা একটা তিমি-হাঙর। এর চেয়ে বড় হাঙর আর নেই পৃথিবীতে।

পৃথিবীর বৃহত্তম মাছও বটে। অতি দুষ্প্রাপ্য। উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রে কচ্চিৎ কখনও দেখা মেলে। এদের গড় দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ ফুট। প্রাণিতত্ত্ববিদদের মতে এদের ওজন হবে কমপক্ষে পনের টন। বলা হয়ে থাকে বৃহত্তমদের দৈর্ঘ্য ষাট ফুটও হয়। একটা বাচ্চা হাঙ্গর একবার হারপুন-বিদ্ধ করা হয়েছিল—তার যকৃতের ওজন ছিল ছ-শ পাউণ্ড—আর প্রশস্ত চোয়ালের প্রত্যেকটিতে দাঁতের সংখ্যা ছিল তিন হাজার।

জল-দানবটা এত বড় যে যখন ভেলার চারদিকে ও তলায় বৃত্তাকারে ঘুরছিল, মাথাটা দেখা যাচ্ছিল এক পাশে আর লেজের সবটা তখন অন্য পাশে বেরিয়ে থাকত। এমন অবিশ্বাস্য কিম্ভূতকিমাকার, তৎপরতাহীন, জড়তাগ্রস্ত ও বোকাবোকা দেখাচ্ছিল যখন মুখোমুখি হচ্ছিল সে, আমরা সহাস্যে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলছিলাম। কিন্তু ভালো করেই জানতাম মনে মনে, ও ইচ্ছে করলে লেজের এক ঝাপটায় দড়িদড়াসুদ্ধ ভেলাটা টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারত। ক্রমশ বৃত্তের আকার ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছিল—বিশেষ করে ভেলার তলায়। কি শেষ পর্যন্ত ঘটে, শুধু তারই জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। অন্যপাশে যখন দেখা মিলল হাঙ্গরটার, অতি হৃদ্যতার সঙ্গে সে তখন দাঁড়ের তলা দিয়ে গলে গেল—দাঁড়টা শূন্যে উঠে পড়ল আর দাঁড়ের ফলক তার পিঠে ঘষটাতে লাগল।

আমরা প্রত্যেকে চারদিকে হারপুন হাতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম কিন্তু যে বিরাট দানবটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে তার কাছে এই হারপুন দাঁতের খড়কে কাঠির মতো তুচ্ছ মনে হল। তিমি-হাঙ্গরটা যে আমাদের রেহাই দেবে, তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রভুভক্ত কুকুরের মতো ভেলার কাছাকাছি ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা কেউই এ রকম কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইনি, আর হব বলেও মনে হচ্ছে না। সমুদ্রদানবটার কখনও পিছনে কখনও ভেলার তলায় ঘুরপাক খাওয়া এত অস্বাভাবিক ঠেকছিল আমাদের কাছে যে, ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে নিতে পারছিলাম না।

পুরো একটা ঘণ্টা ধরে তিমি-হাঙ্গরটা আমাদের সঙ্গে এইভাবে এসেছিল। কিন্তু আমাদের ধারণা সারা দিনই সঙ্গে ছিল সে। শেষ পর্যন্ত এরিকের পক্ষে ব্যাপারটা ভারি উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছিল। ও হাতে একটা হারপুন নিয়ে ভেলার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের অনভিপ্রেত চিৎকার চেঁচামেচিতে খচে গিয়ে হারপুনটা মাথার উপর তুলে সবেগে নিক্ষেপ করে বসল। হাঙ্গরটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল ওর দিকে—প্রশস্ত চোয়ালটা প্রায় ভেলার কোণের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। এরিক অমনি আসুরিক শক্তি নিয়ে দানব তিমি-হাঙ্গরটার মজ্জাগঠিত কোমল মাথায় বসিয়ে দিল এক আঘাত। দু এক মুহূর্ত লাগল বুঝতে কি ঘটতে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মুহূর্তে প্রশান্ত নির্বোধ জড় প্রাণীটা ইস্পাত-মাংস-

পেশীর পাহাড়ে পরিণত হল। হারপুনটা ভেলার কোণ ঘেঁষে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা হিস্‌হিস্ শব্দ কানে এল, সৃষ্টি হল জলপ্রপাতের মতো প্রবল জলোচ্ছ্বাস। দানবটা মাথাটা একবার জলের উপর তুলে মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল গভীর সমুদ্রে। যে তিনজন লোক কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, ছিটকে পড়ল মুখ থুবড়ে—হারপুনের দড়ির ঘষা লেগে দুজনের গায়ের ছাল উঠে গেল। যে পুরু দড়িটা একটা নৌকোকে বেঁধে রাখতে পারে, ফটাস করে ছিঁড়ে গেল সরু সুতোর মতো। একটু পরেই দুশ গজ দূরে হারপুনের ভাঙ্গা ফলাটা ভেসে উঠল জলের উপর। পাইলট মাছের বিরাট ঝাঁকটা ভীতত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠল জল থেকে—তারপর মরিয়া হয়ে ছুট দিল পুরনো মনিব ও প্রভুর সঙ্গে তাল রাখতে। আমরাও আতঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই বুঝি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ডুবোজাহাজটা তেড়ে আসবে আক্রমণোদ্যত হয়ে। কিন্তু তিমি হাঙ্গরটার আর দেখাই পাইনি কোন দিন।

এবার আমরা দক্ষিণী নিরক্ষীয় স্রোতের এলাকায় এসে পড়েছি—ভেলাটা গ্যালাপাগোসের চারশ মাইল দক্ষিণে পশ্চিমমুখো চলেছে। গ্যালাপাগোসের স্রোতের টানে পড়ার আর কোন বিপদ-সম্ভাবনাই নেই। এই দ্বীপের সঙ্গে যেটুকু সংযোগ হল, তা হল এই দ্বীপের বৃহদাকার কচ্ছপের মারফত। তারা এই দ্বীপ থেকে বহুদূর সমুদ্রে চলে আসে। একদিন অস্বাভাবিক বড় একটা কচ্ছপ দেখতে পেলাম। দুমদাম শব্দে জল নাড়াচ্ছিল—মাথা ও একটা বড় পাখনা আন্দোলিত করে জলের উপর ভেসে থাকতে চেষ্টা করছিল। তরঙ্গ স্ফীত হয়ে ওঠার সঙ্গে কচ্ছপটার নিচে সবুজ নীল ও সোনালী রশ্মির ঝিকিমিকি দেখতে পেলাম। অর্থাৎ ডলফিনের সঙ্গে মরণপণ লড়াই চলেছে। লড়াইটা হল মুখ্যত এক তরফা। বার থেকে পনেরটা উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট বিরাট মাথাওয়ালা ডলফিন কচ্ছপটার গলা ও ডানা কামড়ে ধরেছে। দেহ থেকে মাথা ও পা ছিঁড়ে নিতে চেষ্টা করছে। কচ্ছপটা তো আর অনির্দিষ্ট কাল মাথা ও পা খোলের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে পারে না।

ভেলাটা দেখামাত্র কচ্ছপটা এক ডুবে ভেলার কাছে এগিয়ে এল। ওর পিছনে তাড়া করে আসছে ডলফিনরা। ভেলার উপর উঠতে চেষ্টা করতে গিয়ে ও আমাদের দেখতে পেল। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে দিয়ে কচ্ছপটাকে বন্দী করে ফেলতে পারতাম বিনা কসরতেই—কারণ কচ্ছপটা আমাদের ভেলার পাশাপাশিই আসছিল। কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মজা দেখছিলাম। ফাঁসটা যখন তৈরি করলাম, তখন কচ্ছপটা আমাদের ছাড়িয়ে দূরে চলে গেছে। আমরা ছোট রবারের ডিঙ্গিটা ছুঁড়ে দিলাম জলে—হেরমান বেণ্ট টরস্টেইন বাদামের খোলার মতো ডিঙ্গি চেপে কচ্ছপটার পিছু পিছু যেতে লাগল। ওদের সামনে যে প্রাণীটা যাচ্ছে, তার চেয়ে বড় নয় ওদের জলযানটা। বেণ্ঠ আমাদের পাচক। তাঁর চোখে

ভাসছে অফুরন্ত কচ্ছপের মাংস আর সুস্বাদু ঝোলের প্লেটের লোভনীয় দৃশ্য।

কিন্তু ভেলা যত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কচ্ছপটাও তাল রেখে দ্রুততর বেগে জলের তলা দিয়ে সাঁতরে চলেছে। ভেলা থেকে তখন শতাধিক গজ দূরেও যায়নি, হঠাৎ কচ্ছপটা বিলকুল অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না তার। যা হোক তারা একটা মহৎ কাজ করেছে। কারণ যখন তারা হলদে ছোট্ট ডিঙ্গিটা নিয়ে জলের উপর নাচতে নাচতে ফিরে আসছিল, ডলফিনরা কচ্ছপটার কথা ভুলে গিয়ে এই নতুন জীবটার পিছু পিছু আসতে লাগল। এই নতুন কচ্ছপটাকে তারা চক্রাকারে ঘিরে ধরল। ডলফিনদের মধ্যে সব থেকে সাহসী যে, ডানার মতো বৈঠা ছপ ছপ করে জল কেটে যখন আসছিল তারা; হঠাৎ ছোবল মেরে বসল বৈঠার গায়ে। ইতিমধ্যে ঘৃণ্য অত্যাচারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শান্তিপ্রিয় কচ্ছপটা নির্বিঘ্নে সরে পড়তে সক্ষম হয়েছে।

॥ ৫ ॥

তিনটি সপ্তাহ অতিক্রান্ত। কোন জাহাজের টিকিটিও আর দেখতে পাইনি। বা এমন কিছু জিনিসও নজরে পড়েনি, যা থেকে প্রমাণিত হয় আমাদের ফেলে-আসা পৃথিবী ছাড়াও অন্য কোথাও মানুষের বসতি আছে। এখন সমস্ত সমুদ্রটাই যেন আমাদের খাস তালুকের এলাকা। দিগন্তের সব দরজা অবারিত, তাই নভোমণ্ডল চুঁইয়ে আসছে প্রকৃত শান্তি ও স্বাধীনতা।

বাতাসে লবনের টাটকা তীব্র গন্ধ। আমাদের চারপাশে যে পবিত্র স্নিগ্ধ নীলিমা ঘিরে আছে, তা যেন আমাদের দেহ ও আত্মাকে ধৌত ও পরিশুদ্ধ করে তুলছে। ভেলায় ভাসমান আমাদের কাছে সভ্য মানুষের বড় বড় সমস্যা মিথ্যে ও মায়াময় ঠেকছে। এ যেন মানুষের মনের বিকৃত ফসল। জীবনের মৌন উপাদনই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ। সেই মৌল উপাদানের কাছে এই ছোট্ট ভেলাটারও কোন মূল্য নেই। হয়ত বা ভেলাটা স্বাভাবিক পদার্থ হিসেবে গৃহীত, যা সমুদ্রের ঐক্যতানে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। পাখি ও মাছের মতো ভেলাটাও সমুদ্র ও স্রোতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেকে। ভেলা ও সমুদ্র এক সূত্রে গ্রথিত। ভয়ঙ্কর শত্রু না হয়ে সমুদ্র আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। ধীর ও নিশ্চিতভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। বাতাস ও তরঙ্গ যেমন ঠেলে নিয়ে চলেছে ভেলা, তেমনি জলের নিচের স্রোতধারা আমাদের লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সময় কোন নৌকো যদি আমাদের চলার পথে আসত কোনদিন, তাহলে দেখতে পেত অবিরত গড়িয়ে-যাওয়া দীর্ঘ ঢেউয়ের মাথায় ভেলাটা কেমন উঠছে নামছে। ছোট ছোট ফেনার পুঞ্জ সৃষ্ট হচ্ছে আর অয়ন বায়ু হলদে পালটাকে ফুলিয়ে পলিনেশিয়ার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ভেলাটা।

যারা ভেলায় আছে, তারা দেখতে পেত ভেলার পিছনে দাঁড়ে বসে আছে এক বুড়ো। উলঙ্গ দেহ, বাদামী গায়ের রঙ। এক মুখ দাড়ি। বিরাট একটা হাল বাগ মানাতে মরিয়ার মতো চেষ্টা করছে—কখনও বা জট পাকানো দড়ি ধরে টানছে। আর আবহাওয়া শান্ত থাকলে একটা বাক্সের উপর বসে তপ্ত রোদে ঝিমোয় আর পা জোড়া আলতো ভাবে চাপানো থাকে হালের উপর। আলস্য-মন্থর ভঙ্গি।

এই লোকটা যদি বেন্ট না হতেন, তাহলে বেন্টকে দেখা যেত কেবিনের দরজার মুখে পেটের উপর চাপ দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে আছেন সঙ্গেআনা তিয়াত্তরখানা সমাজ-বিজ্ঞানের কোন একখানা বই নিয়ে। এ ছাড়াও ভেলার খাদ্য ভাণ্ডারের দায়িত্বও তাঁর উপর। প্রতিদিন কতটা রসদ খরচ করা হবে সে-দায়িত্বও তাঁর। দিনের বেলা হেরমানকে ভেলার যত্রতত্র দেখা যাবে। কখনও মাস্তুলের মাথায় বসে থাকে—সঙ্গে আবহাওয়ার গতিবিধি নিরূপক যন্ত্রাদি। কখনও বা জলের নিচে দেখা যায় এমন গগলস চোখে এঁটে ভেলার তলাকার কোন সেণ্টারবোর্ড পরীক্ষা করছে। অথবা বসে আছে রবারের ডিঙ্গির গর্তে—বেলুন আর মাপজোকের যন্ত্র নিয়ে ভারি ব্যস্ত। হেরমান আমাদের প্রধান যন্ত্র-বিশারদ—আবহাওয়া ও জল-বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্বভার প্রাপ্ত।

ন্থট আর টরস্টেইন ব্যস্ত তাদের ভিজে ড্রাই ব্যাটারি নিয়ে, লোহা ঝালাই করছে অথবা সারকিট ঠিক আছে কিনা দেখছে। তাদের শিক্ষা ও সামরিক অভিজ্ঞতা রেডিও-স্টেশানকে চালু রাখার কাজে নিয়োজিত। মাত্র এক ফুট জলের উপরে স্টেশান।

প্রতি রাতে আমাদের খবর ও আবহাওয়া সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট ইথারে পাঠিয়ে দেয়—রেডিও-বিদরা সেই খবর সংগ্রহ করে ওয়াশিংটনের হাওয়া-অফিস ও অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এরিক সাধারণত ফুটো হয়ে-যাওয়া পালের কাপড় সেলাই করে, দড়ি পাকায়, কাঠ খোদাই করে, দেড়ে মাহুষ ও অদ্ভুত মাছের ছবি আঁকে। প্রতিদিন দুপুর বেলা সেক্সটাণ্ট হাতে নিয়ে কোন বাক্সের উপর উঠে বসে সূর্যকে লক্ষ্য করে—আগের দিনের তুলনায় কতটা দূর এগিয়েছে তার মাপজোক চলে। আমি নিজেও ভেলার বেগ সংক্রান্ত হিসেবের খাতায় অর্থাৎ লগ বইয়ে নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করি, প্ল্যাংকটন সংগ্রহ করা, মাছধরা, ছবি তোলা প্রভৃতি নিয়েও সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে। প্রত্যেকের উপরই একটা-না-একটা দায়িত্ব দেওয়া আছে আর কেউই কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে না। ভেলা চালানো রান্নাবান্না করার মতো কঠিন কাজগুলো সমানভাবে সবার মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেককে দিনে দু ঘণ্টা ও রাতে দু'ঘণ্টা অবশ্যই দাঁড়ে বসতে হবে। রান্নার কাজ প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে এক এক জনের উপর ন্যস্ত থাকে। ভেলায় সামান্যই আইনকানুন

মেনে চলতে হয়। শুধু রাত-পাহারাদারদের কোমরে দড়ি বাঁধা অবশ্য পালনীয়। এটা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ বাঁচানোর দড়িটা একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখা থাকে। খানা খেতে হবে কেবিনের বাইরে—উপযুক্ত স্থান হল ভেলার শেষ প্রান্তে। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, সবাই মিলেমিশে একত্র আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেই।

গতকালের রাতের পর থেকে কন-টিকিতে আমাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সাধারণ, একঘেঁয়ে, ছন্দহীন হয়ে পড়েছে। শুধু রাতের পাহারায় যে ছিল, সে রান্নায় একটু বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেছিল। সে সকালের রোদে ভেলার উপর দিয়ে ঘুম চোখে কেবিনে ঢোকার সময় কয়েকটা উড়ুক্কু মাছ ধরে ফেলে। পেরু ও পলিনেশিয়ার লোকেদের মতো কাঁচা মাছ না খাইয়ে তাদের স্টোভে ভেজে খাওয়াল। স্টোভটা কেবিনের বাইরে একটা বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে। বাক্সটা কেবিনের গা ঘেঁষে ভেলার পাটাতনের সঙ্গে খুব শক্ত করে বাঁধা। এটাই আমাদের রান্নার ঘর। দক্ষিণ অয়ন বায়ু থেকে জায়গাটা সুরক্ষিত। অয়ন বায়ু তো সবসময় বয়ে চলেছে ভেলার সর্বত্র সবকিছুর উপর দিয়ে। যখন সমুদ্র ও বাতাস এক কাট্টা হয়ে বড্ড মাতামাতি শুরু করে, তখন স্টোভের আগুন বাক্সে লেগে যাবার ভয় ঘনিয়ে তোলে। একবার তো যে রাঁধছিল, ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙ্গতে দেখে বাক্সটা জ্বলছে। আগুন কেবিনের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়—ধোঁয়া ঢুকে পড়ে কেবিনের মধ্যে। কন-টিকিতে জলের জন্য তো আর বেশি দূর যেতে হয় না!

কেবিনের ভিতরে যারা নাক ডাকায়, ভাজা-মাছের গন্ধ কদাচিৎ তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে পারে। তাই পাচককে সাধারণত ফর্ক বা কাঁটা দিয়ে খোঁচা মেরে গাইতে হয়—'ওঠ, জাগো! প্রাতরাশ তৈরি!' এই গদর্ভ-রাগিণী কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করলে আর ঘুমানো সম্ভব নয়—উঠে পড়তেই হয়। ভেলার পাশে যদি হাঙ্গরের ডানা দেখতে না পাই, প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চটপট স্নানটা সেরে ভেলার ধারে বসে প্রাতরাশের সদ্ব্যবহার করি!

আমাদের খানা একেবারে নিখুঁত। রন্ধন প্রণালীকে পরীক্ষামূলকভাবে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগ বিংশ শতাব্দীর খাবার—দ্বিতীয় ভাগ পঞ্চম শতাব্দীর। এক ভাগ তত্ত্বাবধায়কের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আর এক ভাগ নিবেদিত কন-টিকিকে। টরস্টেইন আর বেণ্ট প্রথম পর্যায়ের খাবার নিয়ে গবেষণায় রত। এইসব খাবারের বিশেষ মালমশলা ছোট ছোট প্যাকেটে দুটো কাঠের খাঁজে ও বাঁশের পাটতনে গুঁজে রেখেছি। মাছ বা সামুদ্রিক খাবারের প্রতি তাদের কোন উৎসাহ নেই। প্রতি সপ্তাহে বাঁশের পাটাতনের দড়ি খুলে মালমশলা বের করে দিতে হয় ভাঁড়ার থেকে। পিজবোর্ডের বাক্সের বাইরে পুরু পিচের আবরণে জল ও আদ্রতা

থেকে সুরক্ষিত। অথচ দিবারাত্র সমুদ্রের লোনা জল নিরবচ্ছিন্ন আছড়ে পড়ছে বায়ু-নিরপেক্ষ খাবারের টিনের গায়ে—লোনা জল ভিতরে ঢুকে খাবার নষ্ট করে ফেলছে। টিনগুলো বাক্সটার গায়ে গাদাগাদি করে ঠাসা আলগা অবস্থায় পড়ে আছে।

কন-টিকি যখন প্রথম সমুদ্র যাত্রা করেন, তাঁর তো পিচ বা বায়ুনিরপেক্ষ টিনের বাক্স ছিল না, আর তাঁকে খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামাতে হয়নি। সেদিনও মানুষ ডাঙ্গা থেকে খাদ্য সম্ভার সঙ্গে নিয়েছে, কিন্তু সমুদ্র থেকে যে খাবার পাওয়া যেত তার উপরই একান্ত নির্ভরশীল ছিল। ধরে নেওয়া যাক, লেক টিটিকাকা কর্তৃক পরাভূত হয়ে কন-টিকি পেরুর সমুদ্র উপকূল থেকেই সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। দুটো উদ্দেশ্য ছিল। তার একটা হল: তাঁরা সূর্য-দেবতার উপাসক, সূর্য-উপাসকদের ধর্মীয় প্রতিনিধি। তাই সূর্যকে সামনে রেখে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন—মনে এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে যে একদিন তাঁরা এমন নতুন দেশে পৌছে যাবেন, যে-দেশ শান্তিময়। আর একটা সম্ভাবনার কথাও ভাবা যায়। ভেলায় চেপে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের দিকে যাত্রা করা—এমন একটা স্থানে রাজ্য স্থাপন করবেন যেখানে অত্যাচারী শত্রুরা পৌছতে পারবে না, থাকবেন তাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। কিন্তু সেখানেও ছিল পর্বতসঙ্কুল উপকূল ভাগ আর উপকূল বরাবর শত্রুভাবাপন্ন উপজাতিদের প্রতিকূলতা। কিন্তু আমাদের মতোই তাঁরা নৈঋত কোণের অয়ন বায়ু ও হুমবোল্ড স্রোতের কবলে পড়ে যান—বৃত্তাকারে চলে যান সূর্যের অস্তাচলের দেশে।

যখন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সূর্যোপাসকদের যাই পরিকল্পনা থাকুক না কেন, যাত্রাপথের পাথেয় হিসেবে পর্যাপ্ত খাদ্যও সঙ্গে নিয়েছিলেন। শুকনো মাংস মাছ মিঠে আলু—তাঁদের আদিম খাদ্য-তালিকায় এসব খাদ্যের স্থান ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

ভেলাচালকরা পেরুর ঊষর উপকূল থেকে সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়েছিল—সঙ্গে প্রচুর পানীয় জলও নিয়েছিল। মাটির পাত্র ছাড়াও বিরাট বিরাট লাউয়ের খোলও সঙ্গে ছিল—যা ঠোকাঠুকি লেগে ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা নেই। আর ছিল মোটা মোটা বাঁশের চোঙ—যা ভেলায় ব্যবহার করার পক্ষে সব থেকে উপযোগী। এই বাঁশের চোঙগুলোয় ভিতর থেকে শাঁস বের করে নেওয়ায় অনেকটা জল ধরত। বাঁশের চোঙের গায়ে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে জল ভরে ফুটোটা কোন প্রকার গোঁজ দিয়ে আটকে দেওয়া হত। রজন বা পিচের প্রলেপ দিয়েও ফুটো বন্ধ করা যায়। এই রকম তিরিশ থেকে চল্লিশটা চোঙ বাঁশের পাটাতনের নিচে শক্ত করে বেঁধে রাখা হত। ছায়ায় ছায়ায় ঠাণ্ডায় থাকত। তাছাড়া নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্রোতের তাপমাত্রা ছিল ৭৯° ফারেন হায়েট। সেই টাটকা সমুদ্রের জলের ঝাপটা খেত অনবরত। আমরা যে ধরনের জল পাত্রের ব্যবস্থা করেছিলাম তার তুলনায় এ ধরনের ব্যবস্থায়

দ্বিগুণ পরিমাণ জলের ব্যবস্থা করা যেত। আরও বেশি জল নেবার ইচ্ছে হলে অনেক বাঁশের চোঙ পাটাতনে বেঁধে নিলেই হল। এই চোঙগুলো বেশি জায়গা নেয় না—ওজনও এমন কিছু বেশি নয়।

দু মাস পরে মিঠে জল ক্রমশ বাসী ও বিস্বাদ হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে সমুদ্রের প্রথমাংশ পেরিয়ে এসেছি যেখানে বৃষ্টিপাত বিরল। এবার এমন এলাকায় এসে পড়েছি—যেখানে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত আমাদের জলাভাব মেটাতে পারবে। প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমান জল প্রত্যেককে সরবরাহ করা হত—বরং সরবরাহ করা জলের সবটা আমরা খরচা করতেই পারতাম না।

আমাদের পূর্বগামীরা ডাঙ্গা থেকে যাত্রাকালে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সঙ্গে না নিলেও সমুদ্রে তারা পর্যাপ্ত মাছের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়নি কখনও। আমাদের যাত্রাপথে এমন একটা দিনও যায়নি, যেদিন ভেলার আশপাশ দিয়ে মাছেদের ভেসে যেতে দেখিনি। এসব মাছ ধরাও খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। এমন একটা দিনও যায় না যেদিন একটা না একটা উড়ুক্কু মাছ স্বেচ্ছায় উড়ে এসে ডেকে পড়ে। এ ছাড়াও বড় বড় সুস্বাদু বনিটো মাছেরা জলের সঙ্গে ভেলার পিছন থেকে পাটাতনের উপর এসে পড়ে—জল চালুনির মতো কাঠের ফাঁক গলে বের হয়ে যায়, কিন্তু মাছগুলো পড়ে থাকে। সমুদ্রে অনাহারে মৃত্যু অসম্ভব।

যুদ্ধের সময় জাহাজডুবি হলে জলে ভাসমান নাবিকরা কাঁচা মাছ খায় তেষ্টা মেটাতে। আদিবাসীরাও এ কলাকৌশল জানত। এমন কি কাপড়ে মাছ বেঁধে কাপড় মুচড়ে মাছের রস নিঙড়ে বের করে নেওয়া যায়। মাছটা বড় হলে মাছের গায়ে দু পাশে ফুটো করলে লসিকা গ্রন্থি থেকে রস ক্ষরিত হয়ে ফুটো ভরে যায়। সেই রস খেলে তেষ্টা দূর হয়। এই রস মিঠা জলের মতো সুস্বাদু নয়, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারিত হয়। এই রসে নুনের পরিমাণ খুব কম।

নিয়মিত স্নান করে ভেজা গায়ে ছায়াশীতল কেবিনে শুয়ে থাকলেও জলের চাহিদা অনেকাংশ হ্রাস পায়। যদি বিরাট একটা হাঙর ভেলার পাশাপাশি রাজকীয় ভঙ্গিতে যেতে থাকে, তখন তো আর জলে নামা যায় না। তখন ভেলার ধারে হাত ও পায়ের আঙুল দিয়ে দড়ি শক্ত করে চেপে ধরে শুয়ে থাকা। তাহলে কয়েক মুহূর্ত অন্তর অন্তর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সমুদ্রের জল গায়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ধারাস্নাত করে দেবে।

উষ্মপরিমণ্ডলে তৃষ্ণায় কষ্ট পেলে আমরা সাধারণত ধরে নেই দেহে জলের অভাব ঘটেছে, শুরু হয় জলের রেশানিং, যার পরিণামফল শুভ হয় না। উষ্মমণ্ডলে ঈষদুষ্ণ গরম জল গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেও তেষ্টা মেটে না। বস্তুত দেহে জলের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন নুনের। আমরা গরমের দিনে নিয়ম করে জলের ট্যাবলেট খেতাম—

কারণ ঘামের সঙ্গে দেহ থেকে প্রচুর নুন বেরিয়ে যায়। এমন দিনের অভিজ্ঞতা হয়েছে যখন বাতাসের রেশটুকু মাত্র থাকে না, আর সূর্যদেব নিষ্ঠুরের মতো অনল বর্ষণ করতে থাকেন ভেলাটার উপর। হাতা মেপে মেপে জলের বরাদ্দ করা হয়—তা না হলে পেটের ভিতরে ঢুকে ঢেকুর তুলতে পারে। কিন্তু তীব্র জলের তেষ্টা কিছুতেই মেটে না। চাই জল—আরও জল চাই। এই সময় মিঠে জলের সঙ্গে শতকরা কুড়ি ভাগ থেকে চল্লিশ ভাগ সমুদ্রের কটু লোনাজল মিশিয়ে নেই। আশ্চর্যের কথা, এই ঈষৎ লোনা জলে তৃষ্ণা মিটে যায়। এরপর দীর্ঘক্ষণ লোনা জলের স্বাদ জিভেয় লেগে থাকে, কিন্তু কখনও অসুস্থ বোধ করি না। বরং আমাদের বরাদ্দ জলের পরিমাণ বেশ বাড়িয়ে দেই।

একদিন সকালে প্রাতরাশ খেতে বসেছি—হঠাৎ সমুদ্রের জল ছিটকে এসে খাবারে পড়ল, আমাদের বুঝিয়ে দিল জইয়ের খাবার লোনা জলের কটু স্বাদ অনেকাংশে দূরীভূত করে দেয়।

পলিনেশীয়দের মধ্যে প্রাচীন যারা, তাদের মধ্যে এখনও অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রথা প্রচলিত আছে। পূর্বপুরুষরা যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে এসে পৌছেছিল, তাদের সঙ্গে একরকম গাছের পাতা ছিল যা চিবুলে তৃষ্ণা দূর হত। এই পাতার একটা অদ্ভুত গুণ, পাতার রস খেলে লোনা জল একটুও অসুস্থ করতে পারে না। এ রকম পাতা প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আগে কখনও ছিল না। তাদের আদি নিবাস ছিল নিশ্চয়ই পলিনেশীয়দের জন্মভূমিতেই। পলিনেশীয়দের সম্পর্কে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকরা এ সম্বন্ধে এতবার ঐ রকম মন্তব্য করেছেন যে, শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরাও অনুসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন—একমাত্র কোকা উদ্ভিদই এই রকম ভেষজগুণসম্পন্ন। আর এ উদ্ভিদ পেরুতে জন্মায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই উদ্ভিদ ইনকারা ও তাদের পূর্বপুরুষরা যারা এখান থেকে একদিন অন্তর্হিত হয়েছিল, তারাও ব্যবহার করত। এই পাতার রসে কোকেন আছে যা নেশা ধরায়। পাহাড়ী পথে বা দূর সমুদ্রে যাতায়াতের সময় তারা এই পাতা প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে যেত, দিনের পর দিন তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর করতে এই পাতা চিবুত। এই পাতা চিবুলে সমুদ্রের লোনা জল পান করলেও সাময়িক ভাবে কোন অনিষ্ট হত না।

কন-টিকিতে থাকাকালীন আমরা কোকা পাতার রস খাইনি কখনও। কিন্তু ভেলার সামনের দিকে পলকা ঝুড়িতে নানা লতাগুল্ম ও চারা গাছ ছিল যার অনেকগুলো দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসীদের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঝুড়িটা ঝুড়ি ভেলার বেড়ার সঙ্গে অনুবাতে অর্থাৎ যে-দিকের অভিমুখে বাতাস বয় সেই দিকে বাঁধা থাকত। যতই দিন গড়িয়ে চলল আলু ও নারকেলের গা থেকে হলদে অঙ্কুর ও সবুজ পাতা দেখা দিল আর অঙ্কুর ক্রমশ বড় হতে লাগল। ভেলার উপর যেন

ছোটখাট একটা বাগান তৈরি হয়ে গেল।

ইউরোপীয়রা যখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথম পদার্পণ করে, তারা ইস্টার দ্বীপ, হাওয়াই ও নিউজিল্যাণ্ডে প্রচুর মিষ্টি আলুর চাষ দেখতে পায়। অন্যান্য দ্বীপেও এই আলুর চাষ হয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র পলিনেশীয়দের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। আরও পশ্চিমে রাঙ্গাআলু তখনও অজ্ঞাত ছিল। ঐ সুন্দর দ্বীপপুঞ্জে যে-সব উদ্ভিদের চাষ হত, রাঙ্গাআলুর চাষ তার মধ্যে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। লোকজনেরা তখন মাছের উপরেই একান্ত নির্ভরশীল ছিল। এই রাঙ্গা আলুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পলিনেশিয়ার বহু গল্প-উপকাহিনী। বংশপরম্পরায় এই ঐতিহ্য চালু হয়ে এসেছে। স্বয়ং কন-টিকি যখন তাঁর সহধর্মিণী পানিকে নিয়ে এই দ্বীপে এসেছিলেন পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ছেড়ে, তিনিও সেদিন সঙ্গে করে রাঙ্গাআলু এনেছিলেন। পেরুর খাদ্য-তালিকায় রাঙ্গাআলু একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। নিউজিল্যাণ্ডের গল্পগাছায় যে-সব কাহিনী প্রচলিত, তাতেও দেখা যায় রাঙ্গাআলু সমুদ্রপথে সে-দেশে এসেছে। ক্যানু চেপে নয়—এসেছে দড়ি-বাঁধা ভেলায়।

এখন জানা গেছে ইউরোপীয়দের আসার আগে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আমেরিকায় আলু জন্মাত। সুদূর অতীতকালে আদিবাসীরা পেরুতে যে রাঙ্গাআলুর চাষ করত, কন-টিকিই প্রথম সেই রাঙ্গাআলু প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও নিয়ে আসেন। পলিনেশিয়ার সমুদ্র-বিহারী ও পেরুর আদিবাসীদের ভ্রমণকালে শুকনো রাঙ্গাআলু খাদ্য-তালিকায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে গন্য হত। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-এলাকায় রাঙ্গা আলুর চাষ করতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হত, কারণ লোনা জলের সংস্পর্শে আলু গাছ সহজেই মরে যায়। পেরু থেকে চাব হাজার মাইল সমুদ্র অতিক্রম করে এসেছে বলেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতেও সহজে পর্যাপ্ত আলু জন্মাবে, এরকম আশা অলস কল্পনা মাত্র। পলিনেশিয়ায় আলু-চাষের উৎপত্তির ব্যাপারটাকে বাজে ব্যাখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা নিরর্থক—কারণ ভাষাবিদরাও বলেছেন দক্ষিণ-সমুদ্রের অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও মিঠে আলুর নাম কুমারা। পেরুর প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যেও মিঠে আলু ঐ একই নামে সুপরিচিত। ঐ নামটাও গাছের সঙ্গে সাগরপারে ঐ দ্বীপ চলে গেছে।

কন-টিকির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ গাছ আমাদের সঙ্গে ছিল। সে হল লাউ গাছ। পলিনেশিয়ায় লাউয়েরও বিপুল চাষ হয়। বিশেষ করে লাউয়ের খোলাটা পলিনেশীয়-দের কাছে খুবই আদরণীয়। কারণ আগুনে শুকিয়ে ঐ খোলে মিঠে জল ধরে রাখা যায়। লাউ গাছও সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে একদিন পলিনেশিয়ায় পৌঁছেছিল একথা ভাবা অলস কল্পনা-বিলাস। রাঙ্গা আলুর মতো লাউও একই ভাবে সে দেশে গিয়েছে। পেরুবাসীদের মধ্যে যেমন, পলিনেশিয়ার বাসিন্দাদের মধ্যেও তেমনি লাউ

সমান জনপ্রিয়। লাউয়ের পলিনেশীয় নাম হচ্ছে কিমি। আবার মধ্য আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যেও ঐ নামটা প্রচলিত। এখানেও পেরুসভ্যতার মূল খুব গভীরে প্রোথিত।

কয়েক সপ্তাহ ধরে আরও যে-সব উষ্মমণ্ডলীয় ফলপাকুড় নষ্ট হয়ে যাবার আগে খেয়েছি, তার মধ্যে রাঙ্গাআলুর মতোই তৃতীয় একটির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের ইতিহাসে তার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সঙ্গে কমপক্ষে দুশো ডাব ও ঝুনো নারকেল ছিল। ডাব-নারকেল যেমন সুস্বাদু পানীয়ের যোগান দিয়েছে, তেমনি নারকেলের শাঁস থেকেও দাঁতের ব্যায়ামও হয়েছে প্রচুর। কয়েকটা নারকেল থেকে ইতিমধ্যে অঙ্কুর গজিয়েছে। আমরা দশ সপ্তাহ সমুদ্রের বুকে কাটিয়েছি। গোটা ছয়েক নারকেলের চারা প্রায় একফুট লম্বা হয়ে উঠেছে। মূল বেরিয়েছে, পাতাও বেশ সবুজ ও পুরুষ্টু হয়েছে। কলম্বাসের আমেরিকা পদার্পণের আগে থাকতেই পানামা প্রণালী ও দক্ষিণ আমেরিকায় নারকেল গাছ গজাত। ঐতিহাসিক অভিয়েডো লিখেছেন, স্পেনীয়রা যখন পেরুতে আসে পেরুর উপকূল ভাগে প্রচুর নারকেল গাছ দেখেছে। প্রশান্তমহাসগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও তার অনেক আগে থেকেই নারকেল গাছ দেখা গেছে।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদরা এখনও সুনিশ্চিত নয় কোথা থেকে নারকেল গাছ সেদেশে গিয়েছে। কিন্তু একটা তথ্য এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। নারকেলের শক্ত খোলা থাকা সত্ত্বেও মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে নারকেল সমুদ্রপথে স্থানান্তরে বাহিত হতে পারে না। আমাদের ঝুড়ি ভরতি নারকেল ছিল। খাবার উপযোগীও। পলিনেশিয়া পর্যন্ত পথ অতিক্রম করা পর্যন্তও তাদের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল। আমরা অর্ধেক নারকেল ভবিষ্যতের রসদ হিসেবে পাটাতনের নিচে রেখে দিয়েছিলাম। প্রতিমুহূর্ত তারা সমুদ্রের জলে বিধৌত হয়েছে। প্রত্যেকটি নারকেল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বালসা কাঠ বায়ুতাড়িত হয়ে যত তাড়াতাড়ি ভেসে যেতে পারে, নারকেলের সে-ক্ষমতা নেই। নারকেলের যাকে চোখ বলা হয়, সেই চোখ নোনা জল শুষে নেয়—যার জন্য নারকেল নষ্ট হয়ে যায়। সারা সমুদ্রে যারা আবর্জনা সংগ্রাহক তারা খাবার যোগ্য কোন কিছু ভেসে যেতে দেয় না—কাজেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত তাদের যাওয়ার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত।

নিঃসঙ্গ পেট্রল ও অন্যান্য সামুদ্রিক পাখি যারা সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে ঘুমোয়, তাদের আমরা ডাঙা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরেও ভেসে যেতে দেখেছি। কখনও কখনও শান্ত দিনগুলোতে কতদিন দেখেছি, নীল সমুদ্রের বুকে আমাদের ভেলা সাদা পাখির পালকের সঙ্গে বয়ে চলেছে। খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করার সুযোগ ঘটলে দেখতাম, সেই পালকের ভেকে দু'তিন জন যাত্রী—বাতাসের টানে পরম

নিশ্চিন্তে ভেসে চলেছে। কন-টিকিকে পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় পালক-যাত্রীরা যেই বুঝতে পারত একটা জলযান ভেসে যাচ্ছে যাতে তাদের পালকের চেয়ে যথেষ্ট জায়গা আছে—অমনি তারা তীব্র গতিতে ভেলার দিকে ছুটে আসত জলের উপর দিয়ে, উঠে বসত ভেলার উপর। আর পরিত্যক্ত পালকটা একলা ভাসতে ভাসতে চলে যেত। এইভাবে কন-টিকিকে বিনা ভাড়ার যাত্রীরা ছেঁকে ধরেছিল। ছোট ছোট কাঁকড়াদেরও নামোল্লেখ করা যায়। হাতের অঙ্গুলের মতো বড়। তার চেয়েও বড় দু-চারটে দেখা যেত। এদের ধরতে পারলে এরা আমাদের খাবারের যোগান দিত।

ছোট কাঁকড়ারা যেন সমুদ্রের উপরিভাগের আরক্ষবাহিনী। খাবার মতো কিছু দেখলেই এরা দ্রুত তার দিকে ছুটে যায়। পাচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যদি কোন উড়ুক্কু মাছ দুটো কাঠের ফাঁকে পড়ে থাকে, পরের দিন দেখা যাবে গোটা আস্টেক ছোট কাঁকড়া তাকে ছেঁকে ধরেছে—দাঁড়ার সাহায্যে ভোজ লাগিয়ে দিয়েছে পরমানন্দে। কিন্তু আমাদের দেখতে পাওয়া মাত্র বড় বড় পা ফেলে আত্মরক্ষা করতে চোখের পলকে সরে পড়ত। পিছনে দাঁড়ের কাছে বসবার জন্য যে-কাঠের গুঁড়িটা আছে, তার একটা ছোট গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল এক কাঁকড়া। কাঁকড়াটা বেশ পোষা হয়ে পড়েছিল। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম জোহানস।

তোতা যেমন সবার প্রিয়, এই কাঁকড়াটাও তেমনি আমাদের খুব অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তোতার মতো কাঁকড়াটাও যেন আমাদের দলেরই একজন। সূর্যঝলসিত দিনে কেবিনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ী দাঁড় নিয়ন্ত্রণ করছে—সামনে প্রসারিত নীল সমুদ্র। তখন জোহানসকে সঙ্গী হিসেবে না পেত যদি দাঁড়ী, সে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করত এই সীমাহীন নীলিমার রাজ্যে। ভেলার আশপাশ দিয়ে ছোট ছোট কাঁকড়ারা ছিটকে পালিয়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক—সাধারণ নৌকোর আরশুলার মতো ছিঁচকে চুরিচামারি করতে ব্যস্ত। আর তখন জোহানস তার ছোট্ট আস্তানার দরজার সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকে—জুলজুল চোখে প্রতীক্ষা করে কখন পাহারার বদল হবে। বদলী যেই আসুক না কেন, তার হাতে থাকে ওর জন্য বিস্কুটের টুকরো বা ছোট মাছের খণ্ড। সে গর্তের মুখের কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে কখন জোহানস এগিয়ে দরজার মুখের কাছে আসবে—দাঁড়ার হাত বাড়িয়ে দেবে খাবার গ্রহণ করতে। সে দাঁড়া দিয়ে হাতের আঙুলের ফাঁক থেকে খাবারটা নিয়েই গর্তের মধ্যে দ্রুত সেঁদিয়ে যাবে। তারপর গর্তের মুখের কাছে বসে স্কুলের ছাত্রের মতো খচ খচ করে খেয়ে ফেলবে খাবারটা।

ভেজা নারকেলের গায়ে কাঁকড়ারা মাছির মতো ছেঁকে ধরে। নারকেলটা গেঁজে উঠে এক সময় ফটাস করে ফেটে যায়। নয়ত ওরা ভেলার উপর জলে ভেসে-আসা প্ল্যাংকটন খাবলে ধরে। এই খুদে প্রাণীজ পদার্থ ভেলায় বসবাসকারী আমাদের মতো

গলিয়াথদের উপাদেয় খাদ্যের যোগান দেয়। কি ভাবে ধরতে হবে সে-কৌশল রপ্ত করা মাত্র, আমরা তাদের ধরে মুখে পুরে ফেলতাম।

সমুদ্রের স্রোতের টানে যে অগুণতি অদৃশ্য প্ল্যাংকটন ভেসে বেড়ায়, খাদ্য হিসেবে তারা খুবই পুষ্টিকর। মাছ বা সামুদ্রিক পাখিরা নিজেরা প্ল্যাংকটন খায় না, তারা বেঁচে থাকে অন্য মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে, নিজেরা তারা যত বড়ই হোক না কেন। সমুদ্রের উপরিভাগে জলের সঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট দৃশ্য-অদৃশ্য জৈব পদার্থ ভেসে বেড়ায়, তাদের সাধারণভাবে বলা হয় প্ল্যাংকটন। তাদের কেউ হয়ত উদ্ভিদ (ফাইটো—প্ল্যাংকটন), কেউ বা মাছের ডিম বা অতি সূক্ষ্ম প্রাণীজ পদার্থ (জু-প্ল্যাংকটন)। প্রাণীজ প্ল্যাংকটন উদ্ভিজ্জ্য প্ল্যাংকটন খেয়ে বেঁচে থাকে আর উদ্ভিজ্জ্য প্ল্যাংকটন অ্যামোনিয়া নাইট্রেট ও মৃত প্রাণীজ প্ল্যাংকটন থেকে যে-নাইট্রেট তৈরি হয়, তা খেয়ে জীবন ধারণ করে। এরা সমুদ্রের অভ্যন্তরে ও উপরি-ভাগে যে সব প্রাণী ভেসে বেড়ায়, তাদের খাদ্যের যোগান দেয়। আকার দিয়ে যা পারে না, সংখ্যা দিয়ে তা পুষিয়ে দেয়।

প্ল্যাংকটন অধ্যুষিত এলাকার এক গ্লাস জলে হাজার হাজার প্ল্যাংকটন পাওয়া যায়। এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে বঁড়শিতে, জালে, বা শিকে গেঁথে বড় মাছ ধরতে না পেরে অনেক লোক সমুদ্রে প্রাণ হারিয়েছে। আবার এরকম ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা গেছে, জলে গোলা কাঁচা মাছের স্যুপ খেয়ে বেঁচে গেছে অনেকে। মাছ ধরার জাল ও বঁড়শির সঙ্গে জল ছাঁকার ছাঁকনি জাতীয় কিছু সঙ্গে থাকলে একটা পুষ্টিকর খাদ্য অর্থাৎ প্ল্যাংকটন পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতে মানুষ যেমন ডাঙায় শস্যের আবাদ করে, তেমনি সমুদ্রের এই প্ল্যাংকটন আহরণ করার কথাও ভাববে। সামান্য একটা শস্য দানা কোন কাজে আসে না, কিন্তু সংখ্যায় অনেক হলে তবেই তো খাদ্য হয়।

সামুদ্রিক প্রাণী বিশেষজ্ঞ ড. এ. ড বাজকভ এই প্ল্যাংকটনের কথা আমাদের বলেছিলেন এবং তাদের ধরবার উপযোগী জালও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সিল্কের সুতোয় তৈরি এ জাল—প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে তিন হাজার বুনানি আছে। একটা গোলাকার লোহার তারের সঙ্গে লাগান—দেখতে অনেকটা ফানেলের মতো। লোহার তারের চাকতিটার বেড় হবে আঠার ইঞ্চি। ভেলার পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া হত এটিকে। যেমন জাল দিয়ে মাছ ধরা হয় তেমনি ভাবে এই সিল্কের জাল ছেঁকে প্ল্যাংকটন ধরা হবে। স্থানকাল ভেদে এদের পরিমাণেরও তারতম্য ঘটে। পশ্চিমে যতই এগিয়ে চলেছি, সমুদ্র ততই উষ্ণতর হয়ে উঠেছে। প্ল্যাংকটনের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। রাত্রেই সব থেকে বেশি মাল ওঠে। মনে হয়, সূর্য উঠলে সূর্যের রশ্মি জলে এসে পড়তেই, অনেক প্রাণী জলের গভীরে ঢুকে যায়—সূর্যের তাপের হাত থেকে আত্ম-রক্ষা করতে।

ভেলায় সময় কাটানোর যখন আর কোন কিছু করার থাকে না, তখন প্ল্যাংকটন ধরার জালে নাক ঢুকিয়ে একটু বৈচিত্র্য আস্বাদন করা যায় বই কি। গন্ধ শোঁকার জন্য নয়—এদের গন্ধ বড়ই বিশ্রী। দৃশ্যটাও কিছু আহামরি নয়—বীভৎস দৃশ্য। প্ল্যাংকটনদের ডেকের উপর বিছিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করলে খালি চোখেও দেখা যাবে অগণিত ছোট ছোট জীব—যাদের আকার আলাদা, কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তাদের এক একটির আকার যেমন অদ্ভুত তেমনি তাদের বর্ণ-বৈচিত্র্যও অসীম।

বেশির ভাগই খুদে চিংড়ির মতো কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী (কোপেপড)—বা বিচ্ছিন্ন মাছের ডিম, আর আছে মাছ, খোলাযুক্ত মাছ, অফুরন্ত বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট কাঁকড়া, জেলিফিস, অগুণতি বিচিত্র প্রাণীর লার্ভা। ওয়াল্ট ডিজনের ফ্যাণ্টা-সিয়া ছবির মতোই বিচিত্র সব প্রাণীর লার্ভা। কতকগুলোকে দেখতে সেলোফেন কাগজের তৈরি পত্‌পত্‌ করে ওড়া ঝালর লাগান চাকার পাখির মতো, আবার কোনগুলো লাল চঞ্চুওয়ালা ডানাহীন, ডানার বদলে কঠিন শেল বা খোলস মোড়া পাখির মতো দেখতে। প্ল্যাংকটন জগতে প্রকৃতির যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় মেলে। অতি বাস্তববাদী শিল্পীরা এখানে এলে খুশিই হবে।

ঠাণ্ডা হুমবল্ড স্রোত যেখানে নিরক্ষীয় রেখার দক্ষিণে পশ্চিমমুখো প্রবাহিত, সেখানে কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর জালের থলি থেকে কয়েক পাউণ্ড প্ল্যাংকটনের পরিজ ঢেলে দিতে পারছিলাম। বাদামী, লাল, সবুজ ও ধূসর—নানা বর্ণের স্তরে বিভক্ত কেকের মতো দলা হয়ে পড়ে আছে। বিচিত্র প্ল্যাংকটন-ক্ষেত্র অতিক্রম করার দরুনই এই বিচিত্র বর্ণের সমাহার। রাত্রে চারদিকে যখন ফসফরাসের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়, তখন মনে হয় জল থেকে যেন রত্ন সম্ভার টেনে তুলছি। যখন তাদের হাতে নেই, জলদস্যুদের রত্ন মুহূর্তে পরিণত হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ খুদে চিংড়ি আর ফসফরাসযুক্ত মাছের লার্ভায়। অন্ধকারে জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মতো জ্বলছিল তারা। যখন এদের পাত্রে ঢালা হল এই জগাখিচুড়ি মণ্ড জাতীয় পদার্থকে দেখে মনে হল- জোনাকি দিয়ে তৈরি ঐন্দ্রজালিক লেপসি। রাতের এই সংগ্রহ দূর থেকে যত সুন্দর মনে হয়েছিল, কাছ থেকে ততোধিক কুশ্রী ঠেকতে লাগল। গন্ধ যত খারাপ, খেতে তত চমৎকার—অবশ্য যদি সাহস করে কেউ এক চামচে মুখে পুরে দেয়। খুদে চিংড়ির হলে স্বাদটা লাগে চিংড়ির লেই, লবাস্টার ও কাঁকড়ার মতো। গভীর জলের মাছের ডিমের হলে স্বাদটা লাগে নুনে জড়ানো মাছের ডিম বা ঝিনুকের মাংসের মতো।

অখাদ্য উদ্ভিজ্জ প্ল্যাংকটনরা এত সূক্ষ্ম যে হয়ত তারা জলের সঙ্গে জলের বুনানির ফাঁক দিয়ে গলে যায়, অথবা এত বড় যে হাতের আঙুল দিয়েই তাদের ধরতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি। আমাদের দুজনের কাছে প্ল্যাংকটন অতি সুস্বাদু, দু জনের কাছে মন্দ নয়, আর বাকি দু জন তো দেখলেই নাক সিঁটকোয়। পুষ্টির দিক

থেকে বিচার করলে তাদের স্থান বড় বড় শেল-মাছের পাশেই। মশলাপাতি দিয়ে ঠিকমতো রাঁধতে পারলে যারা সামুদ্রিক খাবার পছন্দ করে, তাদের কাছে এক নম্বরের খাদ্য বলে বিবেচিত হবে।

এই সূক্ষ্ম জৈব পদার্থের পর্যাপ্ত পরিমাণের তাপ আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী নীল তিমি এই প্ল্যাংকটন খেয়েই বেঁচে থাকে। আমাদের প্ল্যাংকটন ধরার পদ্ধতি অত্যন্ত সেকেলে। ক্ষুধার্ত মাছেরা ছোট জাল প্রায়ই চিবিয়ে ফেলে। একদিন তো জালটা হারিয়েই গেল জলে। একদিন ভেলায় বসে আছি। এমন সময় দেখতে পেলাম একটা চলমান তিমি শূন্যে জলপ্রপাতের মতো জল ছুঁড়ে দিচ্ছে—সেলুলয়েডের শ্মশ্রুর মতো লোমের ভিতর দিয়ে প্ল্যাংকটন ফিলটার হয়ে গলার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

'প্ল্যাংকটন-খাদকরা, তোমরাও তাই করো না কেন?' টরস্টেইন ও বেণ্ট জল উৎক্ষেপনকারী তিমিকে দেখিয়ে একটু যেন বিদ্রূপের স্বরেই বললেন আমাদের, 'মুখ জলে ভরতি করে গোঁফের ভিতর দিয়ে বের করে দিলেই তো পার!'

আমি তিমি দেখেছি নৌকো থেকে—তাও বেশ দূর হতে। মিউজিয়মেও তিমির কঙ্কাল দেখেছি। উষ্ণশোণিত প্রাণীদের দেখলে যে-মনোভাব হয়, এই বিপুলাকার দেহধারীকে দেখে তেমন কোন মনোভাব হয়নি আমার মনে, যেমন ঘোড়া বা হাতি দেখলে হয়। সত্যিকার স্তন্যপায়ী হিসেবে তিমিকে মেনে নিতে আমার দ্বিধা হয়নি কখনও, কিন্তু এদের হালচাল, জীবন-প্রণালী বিচার-বিন্যাস করে তিমিকে সত্যিকার শীতল শোণিত বৃহদায়তন মাছ বলেই মনে হয়। তিমিরা যখন মাছের মতো আমাদের ভেলার দিকে ছুটে আসে, তখন কিন্তু আবার ভিন্নতর অনুভূতি জেগে ওঠে মনে।

রোজকার মতো সেদিনও ভেলার ধারে বসে ছিলাম আমরা—খাচ্ছিলাম। জলের এত কিনারায় যে শুধু হেলান দিয়ে পিঠটা একটু বাঁকালেই মগটা ধুতে পারতাম জলে। শুরুও করেছিলাম—এমন সময় হঠাৎ আমাদের ঠিক পিছনে সন্তরণরত ঘোড়ার মতো কি যেন জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে—শুনতে পেলাম। বিরাট একটা তিমি এগিয়ে এসেছে ভেলার কাছে—স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাদের দিকে। এত কাছা-কাছি যে, যেখান দিয়ে জল বের করে দেয় সেই নাকের ফুটোয় পালিশ করা জুতোর মতো একটা জেল্লা চোখে পড়ল। যাকে সত্যিকার শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া বলে, সমুদ্রে তেমন কোন শব্দ শোনা সত্যিই অস্বাভাবিক। জলে যে সমস্ত প্রাণীরা কিলবিল করে বেড়ায়, শুধু কানকুয়া নাড়ায় নিঃশব্দে—ফুসফুস বলে কিছুই নেই তাদের। কাজেই সুদূর অতীতের আমাদের আত্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীর জন্য অর্থাৎ তিমির জন্য একটা কেমন উষ্ম অনুভূতি জেগে উঠল মনে। তিমিরা তো আমাদের মতোই স্তন্যপায়ী প্রাণী—যারা ডাঙ্গার বদলে সমুদ্রকেই বেছে নিয়েছে নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে। ঠাণ্ডা কুনো ব্যাঙের মতো দেখতে তিমি-হাঙ্গররা জল থেকে নাক উঁচু করে টাটকা

বাতাস নিতে জানে না কিন্তু তাদের বদলে এমন একটি প্রাণীর দেখা পেলাম—যাকে দেখে ভালো খাইদাই মেলে, চিড়িয়াখানার আমুদে হিপোপটেমাসের কথা মনে করিয়ে দিল। হিপোরা আমাদের মতোই শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। তিমি আমার মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়।

এরপর বহুবার তিমির সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট শুশুক আর দাঁতাল তিমিদের বিরাট দলকে জলের উপর ডিগবাজি খেতে দেখেছি আমাদের আশেপাশে। তাদের মধ্যে দু-চারটে বড়রাও নজরে পড়েছে। কিন্তু বিপুল আকার তিমিরা একক বা ছোট দলে দেখা দেয়। মাঝেমাঝে দিগন্তে দেখা জাহাজের মতো ভেসে চলে যায়, জলের ধারা তীরের মতো শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। আবার কখনও বা এগিয়ে আসে আমাদের দিকেই। একটা ভয়াল সংঘর্ষের আতঙ্কে চুপসে থাকি আমরা। এই প্রথমবার বৃহদাকার তিমি গতিপথ পরিবর্তন করে সোজা এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। তার ভাবভঙ্গিতে একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্যই প্রকটিত। একটা বিপজ্জনক সংঘর্ষ অনিবার্য। যতই নিকটে আসছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রচণ্ড হুস-হাস শব্দ শুনতে পাচ্ছি—গভীর এবং দীর্ঘলয়িত। হামেশাই জল থেকে মাথাটা তুলে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে পুরু চামড়া সৌষ্ঠবহীন জবরজং বিপুলাকায় একদা ডাঙ্গার বাসিন্দা, জল কেটে এগিয়ে আসছে স্থির লক্ষ্যে। মাছের সাঁতরাণোর সঙ্গে কোন সৌসাদৃশ্য নেই। যেমন পাখি আর বাদুড়ের ওড়ায় তফাৎ। ভেলার বাঁপাশ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। আমরা সবাই ভেলার ধারে এসে দাঁড়ালাম। একজন শুধু মাস্তলে বসে চেঁচাচ্ছে—আরও সাত আটটাও নাকি আমাদের দিকেই আসছে।

প্রথম তিমিটার মুখের সম্মুখভাগ বেশ বড়, কালো ও চকচকে। ওটা আমাদের গজ দুইয়ের মধ্যে এসেই টুপ করে ডুব মারল—দেখতে পেলাম নীলচে কালো বিরাট একটা দেহ আমাদের পায়ের তলা দিয়ে শান্ত ভাবে ভেলা পার হয়ে চলে গেল। ভেলার নিচে কিছুক্ষণ চুপচাপ নিথর হয়ে ছিল—একটা নিবিড় কালো ছায়া। রুদ্ধ শ্বাসে লক্ষ্য করলাম বিরাট কালো পিঠটা আমাদের ভেলার চেয়ে ঢের ঢের বড়। তারপর ধীরে ধীরে নীল জলের গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে একসময় একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দলের বাকি কটাও এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই নিল না—কোন মনোযোগই দেখানোর দরকার বোধ করল না। যে-সব দৈত্যাকায় তিমি তাদের বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে অর্থাৎ লেজের ঝাপটায় ডুবিয়ে দিয়েছে শিকারী জাহাজকে—প্রথমে আক্রান্ত হয়েছে বলেই এ রকমটা করেছে। সারা সকালটা তারা জোরে নিঃশ্বাস ছেড়েছে, মুখ দিয়ে হুস-হাস শব্দ তুলেছে আমাদের ভেলার আশেপাশে অপ্রত্যাশিত জায়গায়, কিন্তু কোন সময়েই ভেলাকে বা দাঁড়ে ধাক্কাটাক্কা মারেনি একবারও। রোদ্দুরে ঢেউয়ের তালে তালে

নাচানাচি করেছে উচ্ছ্বসিত আনন্দে। ঠিক দুপুর নাগাত সমস্ত দলটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল—যেন কোথা থেকে কোন ইঙ্গিত পেয়ে।

ভেলার তলায় কেবল তিমিদেরই দেখা যায় না। যে কাঠির মাদুর বিছিয়ে আমরা শুই, সেটা তুলে ফেললে দুটো কাঠের ফাঁক দিয়ে স্বচ্ছ নীল জল নজরে আসে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বক্ষ পাখনা বা পুচ্ছ পাখনা চলে যেতে দেখি—কখনও বা পুরো একটা মাছই। ফাঁকগুলো যদি আর একটু ইঞ্চিটাক বড় হত, বিছানায় আরাম করে শুয়ে মাদুরের তলা দিয়ে মাছ ধরতে পারতাম।

যে মাছেরা সব সময় আমাদের ভেলার সঙ্গে প্রায় লেপটে থাকে, তারা হল ডলফিন ও পাইলট মাছ। যে-মুহূর্তে ক্যালাও ছাড়িয়ে এসেছি, আমাদের যাত্রা পথে এমন একটা দিনও যায়নি, যেদিন ভেলার আশেপাশে বিরাট বিরাট ডলফিনকে ঘুরপাক খেতে দেখিনি। কিসের মোহে তারা ভেলার দিকে আকৃষ্ট হত, জানি না। হয়ত এমনও হতে পারে, মাথার উপর চলন্ত ছায়ায় সাঁতরে বেড়ানোয় একটা মায়াময় আকর্ষণ অনুভব করে। অথবা আমাদের ভেলার চার পাশে দাঁড় থেকে আরম্ভ করে ভেলার সমস্ত কাঠের গায়ে যে সামুদ্রিক আগাছা ও গুগুলি শামুক প্রভৃতি মালার মতো দোল খায়—ভাবে হয়ত তারা এ সবের মধ্যে মুখরোচক কোন খাবার পেয়ে যাবে। প্রথমে শুরু হয়েছিল কাঠের গায়ে পাতলা মসৃন সবুজ আস্তরণ নিয়ে—তারপর অদ্ভুত দ্রুততায় সামুদ্রিক আগাছা বাড়তে লাগল। এখন কন-টিকিকে দেখাচ্ছে শ্মশ্রুমণ্ডিত সমুদ্র-দেবতার মতো। যতই সে জল কেটে এগিয়ে চলেছে, এই সবুজ আগাছা ছোট ছোট মাছের ছানা আর কাঁকড়ার আস্তানা হয়ে উঠেছে।

এক সময় পিঁপড়েরা বড্ড জ্বালাতন শুরু করেছিল। কোন একটা কাঠের গায়ের গর্তে ছোট কালো পিঁপড়ের বাসা ছিল। আমরা যখন সমুদ্রে ভেলা ভাসাই আর জল কাঠে ঢুকতে থাকে, পিঁপড়েরা অমনি বাসা ছেড়ে ডেকের উপর উঠে আসে, ভেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের কামড়ে, নানা ভাবে অস্থির করে তুলছিল, এক সময় এমনও মনে হয়েছিল আমাদের একেবারে ভেলা-ছাড়া করবে। কিন্তু সর্বত্র যখন জল ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন তাদের ক্রমশ বোধগম্যি হল যে এখানে তারা আর টিকে থাকতে পারবে না। আমরা যখন অন্য জগতে পৌছলাম, মাত্র কয়েকটা পিঁপড়ে সেখানে পৌছতে পেরেছিল। ভেলার উপর সব থেকে জমাটি আসড় জমিয়ে ছিল যারা, তারা হল কাঁকড়া আর এক থেকে দেড় ইঞ্চি বড় গুগলি-শামুকরা। বিশেষ করে ভেলার অনুবাতে যারা আছে, দ্রুত তাদের বংশ বৃদ্ধি হতে লাগল। শয়ে শয়ে। যত তাড়াতাড়ি আমরা বড়দের ধরে ফলার করি, তার চেয়ে দ্রুততর তালে নতুন নতুন লার্ভা বড় হয়ে ওঠে। গুগলি শামুক খেতে বেশ উপাদেয়—টাটকা ও নরম। সামুদ্রিক আগাছা আমরা স্যালাড হিসেবে ব্যবহার করি। খেতে খুব একটা সুস্বাদু না হলেও

খাওয়া চলে। আমাদের বাগানের লতাগুল্ম থেকে ডলফিনদের কখনও দেখিনি—যদিও তারা ভেলার তলায় সব সময় সাঁতরে বেড়ায়, ঝকঝকে পেটের অংশ ঝলমলিয়ে ওঠে হামেশাই।

গ্রীষ্মমণ্ডলের সব থেকে উজ্জ্বল বর্ণ-বিশিষ্ট মাছেরা হল ডলফিন (ডোরাডো)। এদের দাঁতাল ছোট আকারের তিমির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। এদেরও অনেক সময় ভুল করে ডলফিন আখ্যা দিয়ে থাকি। ডলফিনরা সাধারণত তিন ফুট তিন ইঞ্চি থেকে চার ফুট ছ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। বিরাট উঁচু মাথা। ঘাড়ের তুলনায় দেহের দু পাশটা চেপটা। আমরা একবার একটা ডলফিনকে ভেলার উপর টেনে তুলেছিলাম, সেটা লম্বায় ছিল চার ফুট আট ইঞ্চি আর মাথাটা সাড়ে তের ইঞ্চি উঁচু। আর ডলফিনটার গায়ের রঙটি ছিল ভারি অপূর্ব। জলের তলায় ডলফিনটাকে নীল বোতলের মতো নীলাভ সবুজ দেখাচ্ছিল। আর পাখনার রঙ ঝকঝকে সোনালী হলদেটে। কিন্তু কোন একটাকে ভেলার উপর তুললেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় মাঝে মাঝে। ডলফিনটা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের রঙের পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে রুপোলী সাদা হয়ে ওঠে, এখানে ওখানে কালো ছোপ দেখা দেয়। এক সময় আগাগোড়া রুপোলী সাদা হয়ে যায়। চার পাঁচ মিনিট এই অবস্থান্তর চলতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে আগের রঙ ফিরে আসে। এমন কি জলের ভিতরও ডলফিনরা বহুরূপী কৃকলাসের মতো রঙ বদল করতে পারে। একবার আমরা তামাটে রঙয়ের অদ্ভুত এক নতুন ধরনের মাছ দেখি। কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পরে বুঝতে পারি, অদ্ভুত মাছটা আমাদের সুপরিচিত চিরসঙ্গী ডলফিন।

ভিটে কপালের জন্য উজ্জ্বল ডলফিনদের মুখটা বুলডগের মতো দেখায়। দু পাশটা চ্যাপ্টা বলে সমুদ্রের উপরের জল স্তর কেটে অগ্রসর হতে পারে সহজেই—বিশেষ করে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁকের পিছনে যখন টরপেডোর মতো তাড়া করে যায়, দেহটা চ্যাপ্টা বলে খুবই সহায়ক হয়। ডলফিনরা যখন খুশ মেজাজে থাকে তারা দেহের চ্যাপটা দিকে ঘুরে উলটে যায়, তীরের মতো ছুটে চলে, হঠাৎ লাফিয়ে বাতাসে উঠে আসকে-পিঠের মতো ডিগবাজি খায়! বেশ শব্দ করে জলের উপর পড়ে ঝপাং করে—জল ছিটকে ওঠে চারদিকে। জলে পড়তে না পড়তেই আবার লাফিয়ে ওঠে বাতাসে—আবার—আবার। এইভাবে চলতে থাকে। কিন্তু যখন আমরা কোনটাকে ভেলার উপর টেনে তুলি, মেজাজ বিগড়ে গেলে এরা কামড়ে দিতে চেষ্টা করে। টরস্টেইন একবার অসাবধানে ডলফিনের মুখের ভিতরে পা ঢুকিয়ে ফেলে কামড় খেয়েছে ডলফিনের। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কিছু দিন ল্যাঙচাতে হয়েছে তাকে। বাড়ি ফিরে শুনেছি—চান করার সময় ডলফিনরা মানুষকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলেছে। অথচ আমরা প্রতিদিন ওদের মধ্যেই চান করেছি—অথচ কেউ আমাদের বিশেষ গ্রাহ্যের

মধ্যেই নেয়নি। কিন্তু তাহলেও, এরা বেশ দুর্দান্ত গোছের শিকারী জীব। এদের পাকস্থলীতে উড়ুক্কু মাছ ও স্কুইডের মৃত দেহ দেখেছি।

উড়ুক্কু মাছ ডলফিনদের প্রিয় খাদ্য। কোন কিছু জলের উপর ছিটকে উঠলেই ডলফিনরা তার দিকে তেড়ে যায় অন্ধের মতো উড়ুক্কু মাছ ভেবে। কতদিন ঘুমঘুম চোখে বেরিয়ে এসেছি কেবিন থেকে চোখ পিট পিট করতে করতে। তখনও ঘুমের ঘোর ভালো করে কাটেনি। সেই অবস্থায় দাঁত মাজার ব্রাশ সবে জলের মধ্যে ডুবিয়েছি, অমনি লাফ মেরে সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠি। তিরিশ পাউণ্ড ওজনের একটা মাছ ভেলার তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে, দাঁত মাজার ব্রাশ শুঁকে নাক কুঁচকেছে হতাশায়। আবার সকাল বেলা যখন ভেলার ধার ঘেঁষে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছি নিশ্চিন্ত শান্তিতে, তখন ডলফিনরা ধারে কাছে লাফিয়ে উঠে এমন ঝাঁপ খাবে যে ছলাৎ করে সমুদ্রের জল ছিটকে আমাদের পিঠ ভিজিয়ে দেবে। খাবার-দাবার জলে নষ্ট হয়ে যাবে। একদিন দুপুরে খাবার খাচ্ছি, হঠাৎ টরস্টেইন খাওয়ার কাঁটা রেখে জলে হাত ডুবিয়ে বসল। কি ঘটতে যাচ্ছে বোঝবার আগেই জল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, বিরাট একটা ডলফিন আমাদের মধ্যে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। টরস্টেইন মাছ ধরার দড়িটার শেষ প্রান্ত শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে টেনে আনতে দেখা গেল অপর প্রান্তে এক বিরাট বিস্মিত ডলফিন বঁড়শি গাঁথা। কয়েকদিন আগে মাছ ধরার সময় এই ডলফিনটাই এরিকের দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছিল।

এমন একদিনও যায় না, যেদিন কমপক্ষে পাঁচটা ছটা ডলফিন আমাদের ভেলার তলায় বা ভেলাটাকে চক্রাকারে আবর্তন করে বেড়ায় না। দুর্যোগের রাতগুলোতেও দুটো তিনটে তো আসবেই, আর ঠিক তার পরের দিন তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে তিরিশ থেকে চল্লিশের কোঠায়। দ্বৈপ্রহরিক ভোজের জন্য টাটকা মাছের দরকার হলে পাচককে কুড়ি মিনিট আগে জানাতে হবে। এটাই আমাদের অলিখিত নিয়ম। যাকে জানাব সে তখন ছোট একটা বাঁশের ছিপের সুতোয় বঁড়শির সঙ্গে উড়ুক্কু মাছ গেঁথে সমুদ্রে ফেলবে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ডলফিন এসে হাজির হবেই। জলের মধ্যে হলকর্ষণ করার মতো এরা এগিয়ে যায় বঁড়শির দিকে—পিছনে আরও দুটো তিনটে। বঁড়শি নিয়ে খেলানোর পক্ষে চমৎকার একটি মাছ। সদ্য ধরা মাছের দেহের মাংস বেশ শক্ত। খেতেও সুস্বাদু। কড আর সলোমনের মাঝামাঝি এক রকমের স্বাদ। দিন দুই চলে। আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কারণ সমুদ্রে তো ডলফিনের অভাব নেই।

পাইলট মাছদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আর-এক ভাবে। হাঙ্গররা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। হাঙ্গরের মৃত্যুর পর তাদের ধরা হয়। কয়েক দিন সমুদ্রে ভেসে চলার পর প্রথম হাঙ্গরের দর্শন ঘটে। তারপর থেকে প্রায় রোজই তাদের

সঙ্গে মোলাকাত হয়। মাঝেমাঝে হাঙ্গরেরা ভেলাটা নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই আসে। শিকারের সন্ধানে বার দুয়েক ভেলাটা চক্রাকারে ঘুরে দেখে। হাঙ্গররা বেশির ভাগ সময় দাঁড়ের পিছনে অবস্থান করে। নিঃশব্দে কোন প্রকার ঝামেলা না করে ভাসতে থাকে—মাঝেমাঝে ভেলার গতির সঙ্গে তাল রাখতে লেজটাকে একটু আন্দোলিত করে। ওদের ধূসরনীল গায়ের রঙটা সূর্যের আলোয় বাদামী দেখায়—ঠিক সমুদ্রের উপরিভাগে জলের তলায় থাকে যখন। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সমতা রাখতে কখনও উঠেছে, কখনও ডুবছে। পৃষ্ঠ-পাখনা এমন ভাবে আন্দোলিত করে যে দেখে ভয় জাগে মনে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলে আমাদের ভেলাটা যে-স্তরে থাকে, তার থেকে একটু উঁচুতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আমরা তখন পাশ থেকে ওদের পুরোপুরি দেখতে পাই। যেন একটা কাচের বাক্সে রাখা আছে। হাঙ্গররা বেশ মর্যাদার ভঙ্গিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে—সামনে থাকে বিরাট পাইলট মাছের বাহিনী। মুহূর্তের জন্য মনে হয়, হাঙ্গরটা আর তার সামনের ডোরাদার মাছের বাহিনী নিয়ে আমাদের ভেলার উপর উঠে পড়বে! ভেলাটা একটু নিচের দিকে নেমে যায় খাদে—আবার ঢেউয়ের গা বেয়ে চূড়োয় ওঠে, তারপর চূড়ো ডিঙ্গিয়ে খাদে নেমে আসে শোভন ভঙ্গিতে।

হাঙ্গরদের হিংস্রতার খ্যাতি ও ভীতি-উৎপাদক চেহারার প্রতি বরাবরই আমার শ্রদ্ধা আছে। জলের মধ্যে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলাফেরা করার জন্য মাথা থেকে দেহটা ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। অমিত শক্তির অধিকারী। সারা দেহেই ইস্পাত কঠিন মাংসপেশী। মাথাটা প্রশস্ত ও চ্যাপটা। চোখের মনিদুটো বেড়ালের চোখের মনির মতো ছোট, সবুজ ও কুতকুতে। চোয়াল দুটো এত বড় যে অনায়াসে একটা ফুটবল গিলে ফেলতে পারে। এদের লোলুপতা যেন সীমাহীন। দাঁড়ী চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঙ্গর! হাঙ্গর!' আমরা অমনি ভেলার বাঁপাশে এসে দাঁড়াতাম হাতে কোঁচ ও হারপুন নিয়ে। হাঙ্গরেরা পৃষ্ঠপাখনা নাচিয়ে ভেলার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে কাছে এসে যেত। শিরীষ কাগজের মতো খড়খড়ে বর্মের পিঠে কোঁচ ছুঁড়ে মারলে কোঁচটা খড়কে কাঠির মতো বেঁকে যেত। তাই দেখে আমাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তুমুল লড়াইয়ের জটলায় হারপুনের বর্শার মতো ডগাটা মচাৎ করে ভেঙ্গে যেত। হাঙ্গরের চামড়ায়, মাংসপেশী বা মজ্জায় বর্শার ফলা ঢুকিয়ে এইটুকু লাভ হত যে একটা উত্তেজিত এলোমেলো লড়াই শুরু হয়ে যেত, ভেলার চারপাশে জলরাশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত—একসময় কেটে পড়ত হাঙ্গররা। জলের উপরে একটু তেল ভেসে উঠত—ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে।

আমাদের কাছে শেষ যে-হারপুনটা ছিল তার মাথাটার সঙ্গে এক গুচ্ছ বঁড়শি বেঁধে ফেললাম। তারপর সেটাকে একটা মরা ডলফিনের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে জলে

ছুঁড়ে দিলাম স্টিলের দড়ির সঙ্গে বেঁধে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একটা হাঙ্গর—শুণ্ডটা উঁচু করে ধরল জলের উপরে। তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি চোয়াল ব্যাদন করল—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ডলফিনটা ঢুকে গেল মুখের ভিতরে।- বঁড়শি আটকে গেল গলায়। শুরু হয়ে গেল লড়াই। লেজের ঝাপটায় ফেনায়িত হয়ে উঠল সমুদ্রের জল। আমরা ষ্টিলের দড়ি সবলে চেপে ধরে মরণ পণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও টেনে আনলাম ব্যাটাকে একেবারে ভেলার কাছে। অপেক্ষা করতে লাগলাম পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য। মাঝেমাঝে হাঁ করছিল হাঙ্গরটা—যেন করাতের মতো দাঁতের সারি দেখিয়ে ঘাবড়িয়ে দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। তারপর সমুদ্রের ঢেউ আর পিচ্ছিল আগাছার সহায়তায় টেনে তুললাম হাঙ্গরটাকে ভেলার পিছনের কাঠের উপর। পুচ্ছ-পাখনার কাছটায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে বেঁধে ফেললাম—চলে এলাম ওর আক্রমণের গণ্ডীর বাহিরে। একসময় ওর রণনৃত্য শেষ হয়ে এল।

আমাদের ধরা এটাই প্রথম হাঙ্গর। দেখলাম ওর তরুণাস্থিতে আমাদের হারপুনের ডগাটা বিঁধে আছে। ভাবলাম, এর জন্যই হয়ত হাঙ্গরটার লড়াইয়ের ক্ষমতা বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। এরপর এই একই পদ্ধতিতে অনেক হাঙ্গর ধরেছি। বেশ সহজেই কার্যোদ্ধার করতে পেরেছি। জোর ছুটোপুটি ও টানাটানি করলেও এবং দেহটা ভারী হলেও শেষপর্যন্ত হৃতবল, তেজহীন হয়ে পড়ত। আমরা সবলে ষ্টিলের রশিটা টেনে ধরে রাখতাম—একটুও ঢিলা দিতাম না হাজার টানাটানি করলেও। হ্যাঁচড়া-হ্যাঁচড়ি করলেও হাঙ্গররা তাদের দানবীয় শক্তির পুরো সদ্ব্যবহার করতে পারত না। যেসব হাঙ্গরদের আমরা ভেলার উপর টেনে তুলতাম তাদের দৈর্ঘ্য ছয় থেকে দশ ফুট। তাদের মধ্যে বাদামী ও নীল হাঙ্গরেরাও ছিল। বাদামী হাঙ্গরদের মাংস-পেশী আবৃত করে চামড়ার আবরণ থাকে, দেহের সমস্ত শক্তি সংহত করে তীক্ষ্ণ ফলাওয়ালা ছুরি দিয়ে আঘাত করেও চামড়া বিদ্ধ করতে পারতাম না। পিঠের যেমন, তেমনি তাদের পেটের চামড়াও দুর্ভেদ্য। ছুরি বসানোর সহজভেদ্য জায়গা হল মাথার পিছনের দুপাশের পাঁচটা কানকোর ফাটল।

আমরা যখন হাঙ্গরটাকে ভেলার উপর টেনে তুলতাম হাঙ্গরের গায়ে দৃঢ়ভাবে সেঁটে থাকা বেশ কয়েকটা মাছ দেখতে পেতাম। কালো কালো—পিচ্ছিল গা। মাছগুলোর চ্যাপটা মাথার শীর্ষে গোলাকার চাকতির মতো চোষক-যন্ত্র আছে। এই চোষক-চাকতি দিয়ে হাঙ্গরের দেহে এমন ভাবে সেঁটে থাকত যে লেজ ধরে টানাটানি করেও মাছদের স্থানচ্যুত করতে পারতাম না। কিন্তু ওরা ইচ্ছেমতো নিজেদের দেহ থেকে আলগা করে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে দেহের আর এক জায়গায় সেঁটে লেগে থাকতে পারে আগের মতো। এইভাবে লেগে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এবং হাঙ্গরটার আর সমুদ্রে যাবার কোন সম্ভাবনা না থাকলে, ওরা তখন নিচেতে লাফিয়ে

পড়ে ভেলার ছুটো কাঠের ফাঁক গলে অদৃশ্য হয়ে যায় সমুদ্রের জলে। সাঁতরে গিয়ে অন্য কোন হাঙ্গরের গায়ে লেগে থাকবে। কোন হাঙ্গরের দেখা না পেলে অন্য কোন মাছের গায়ে লেপটে থাকবে সাময়িক ভাবে। মাছগুলো লম্বায় এক ফুট—হাতের আঙুলের মতো। আমরা ইণ্ডিয়ানদের (আমেরিকার আদিবাসী) পুরানো কৌশল অবলম্বন করলাম। ইণ্ডিয়ানরা জ্যান্ত রেমোরা অর্থাৎ চোষক মাছ পেলে চোষক মাছের লেজ বেঁধে মাছ ধরবার দড়ির সঙ্গে বেঁধে জলে ঝুলিয়ে দিত। এরা তখন সাঁতরে যে-মাছ দেখতে পেত তার গায়ে সেঁটে থাকত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এইভাবে রেমোরার সাহায্যে অনেক মাছ ধরা পড়ত। কিন্তু আমাদের বেলা ভাগ্য কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করল না। আমরা এইভাবে যখনই কোন চোষক মাছ ঝুলিয়ে দিয়েছি জলে, তারা ছুটে গিয়ে ভেলার কাঠের গায়ে সেঁটে থাকত। ভাবত বুঝি এক অভূতপূর্ব সুন্দর হাঙ্গরের দেহ পেয়েছে। যত জোরেই দড়ি ধরে টানাটানি করি না কেন কিছুতেই তাদের আলগা করতে পারতাম না। এভাবে অনেকগুলো চোষক মাছ সংগ্রহ করেছিলাম আমরা। তারা ভেলার ধারে এঁকগুঁয়ের মতো লেগে থাকত—এবং এইভাবে আমাদের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল।

কিন্তু রেমোরারা যেমন বোকা তেমনি কুৎসিত দেখতে। পাইলট মাছেদের মতো কোনদিনই আমাদের প্রিয় সঙ্গী হয়নি। পাইলট মাছেরা ছোট্ট সিগারের মতো দেখতে। গায়ে জেবরার মতো ডোরাকাটা। এরা হাঙ্গরের তুণ্ডদেশের সামনে ঝাঁক বেঁধে দ্রুত সাঁতার কেটে চলে। এরা নাকি আধাঅন্ধ বন্ধু হাঙ্গরকে সমুদ্রে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। আসল কথা হল—এরা হাঙ্গরদের সঙ্গে চলাফেরা করে। নিজের দৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যে খাদ্য বস্তু দেখতে পেলেই স্বাধীনভাবে কাজ করে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাইলট মাছেরা তাদের প্রভুর সঙ্গ ছাড়ে না। এরা রেমোরাদের মতো হাঙ্গরের গায়ে সেঁটে থাকে না বলেই হঠাৎ প্রভু যদি শূন্যে লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়, এরা বিস্ময়ে একেবারে হতচকিত হয়ে পড়ে। এরা তখন প্রভুর খোঁজে চারদিকে ছুটোছুটি লাগিয়ে দেয় পাগলের মতো, শেষ পর্যন্ত ভেলার পিছন দিকে ফিরে আসে যেখান থেকে তাদের প্রভু আকাশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু সময় বহে যায়—হাঙ্গর-প্রভু আর ফিরে আসে না। তখন এরা নতুন প্রভুর খোঁজে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কন-টিকির মতো আর কাউকে হাতের নাগালের কাছে পায় না।

ভেলাটার এক পাশে শুয়ে যদি মাথাটা অপূর্ব স্বচ্ছ জলের নিচে চালনা করে দেই, ভেলাটাকে মনে হয় একটা সমুদ্র-দানবের উদর। দাঁড়টা যেন দানবের লেজ আর দুপাশে বেরিয়ে থাকা মাঝখানের তক্তাগুলো দেখায় ভোঁতা পার্শ্ব-পাখনার মতো। এই তক্তাগুলোর তলা দিয়ে হাঙ্গররা ও পাইলট মাছেরা সাঁতরে চলে পাশাপাশি। বুদ্বুদ সৃষ্টিকারী মানুষের মাথাটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। দু-একটা ছিটকে

পালিয়ে যায়—নাক উঁচিয়ে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে। আবার অবিচলিত ভাবে ফিরে আসে যথাস্থানে—সচকিত সাঁতারুদের দলে ভিড়ে যায়।

পাইলট মাছেরা দু ভাগে ভাগ হয়ে ভেলা পাহারা দিয়ে চলতে লাগল। এক দল রইল সেণ্টারবোর্ডের মাঝখানে আর একদল এগিয়ে চলল অর্ধবৃত্তাকারে ভেলার সামনে সুন্দর ভঙ্গিতে সাঁতরে। মাঝে মাঝে পাইলট মাছেরা ছিটকে বেরিয়ে আসছিল ভেলার তলা থেকে, যখনই আমরা তুচ্ছ খাবারের টুকরো ফেলে দিতাম জলে। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা যখন বাসন-কোসন জলে ধুতাম, দেখে মনে হত বাজে টুকিটাকির মধ্যে আমরা সিগারেট কেস থেকে ডোরাকাটা পাইলট মাছ ঝেরে-ফেলেছি। কোন বাজে জিনিসও পরীক্ষা না করে ছাড়ান দিত না এরা। যখন বুঝত উদ্ভিজ্জ পদার্থ, তখনই একমাত্র ডুব দিত জলে।

এই খুদে প্রাণীগুলো আমাদের ভেলার নিচে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় অবস্থান করত। ওদের আমাদের প্রতি এমন একটা শিশুসুলভ আস্থার ভাব ছিল যে আমরাও ওদের প্রতি পিতৃসুলভ মমত্ব বোধ অনুভব করতাম। ওরা হয়ে দাঁড়াল কন-টিকির পোষা জীব। আমাদের কাছেও কোন পাইলট মাছের গায়ে হাত দেওয়া রীতিমতো অপবিত্র কাজ বলে পরিগণিত।

আমাদের পাইলট মাছের দলে এমন মাছও নিশ্চয় ছিল যাদের শৈশব অতিক্রান্ত হয়নি। বেশির ভাগ দু-ইঞ্চি লম্বা হলেও এক-ইঞ্চি লম্বা মাছও দলে ছিল। এরিকের হারপুন তিমি-হাঙরের মাথার খুলিতে বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঙরটা বিদ্যুৎ গতিতে ছুট লাগালে, কয়েকটা বুড়ো পাইলট মাছও বিজয়ীর সঙ্গে সটকে পড়েছিল। তারা লম্বায় দু-ফুটের। শেষ পর্যন্ত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা পাইলট মাছ কন-টিকিকে দ্বিধাহীন নিঃসংশয় চিত্তে অনুসরণ করতে লাগল। তারা আমাদের ভেলার শান্ত সম্মুখগতি ও জলে ফেলে দেওয়া টুকিটাকি খাবার এত পছন্দ করত যে তারাও আমাদের সঙ্গে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে।

মাঝে মাঝে কেউ কেউ বিশ্বাসহীনতার কাজ করেছে। সেদিন আমি দাঁড়ে ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল দক্ষিণ দিকে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারপরই দেখি বিরাট এক ডলফিনের ঝাঁক ছুটে চলেছে তীর বেগে রূপালী টরপেডোর মতো। সাধারণত যেমন করে থাকে, দেহের চ্যাপ্টা দিকে ভর করে জল উৎক্ষিপ্ত করতে করতে সচ্ছন্দ গতিভঙ্গিমায় এগিয়ে আসছিল না। তারা যেন মরিয়ার মতন উন্মত্ত বেগে ছুটে আসছিল—বেশির ভাগ সময় শূন্যে লাফাতে লাফাতে। নীল সমুদ্র মুহূর্তে ফেনান্বিত সাদা হয়ে উঠল এই পলাতকদের লেজের ঝাপটায়। তাদের পিছনে কালো কি একটা—শুধু পিঠটাই দেখা যাচ্ছে—এঁকে বেঁকে স্পিডবোটের মতো ধেয়ে আসছে। মরিয়া ডলফিনরা শূন্যে লাফাতে লাফাতে, জল উৎক্ষিপ্ত করতে করতে

একেবারে ভেলার কাছে এসে পড়ল। শতাধিক ডলফিনের একটা দল। ডুব দিয়ে ভেলাটা পার হয়ে পুব দিকে চলল। দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ এককাট্টা হয়ে। ভেলার পিছন দিকে সমুদ্রে দেখা যাচ্ছিল শুধু নানা বর্ণের ঝিকিমিকি। তেড়ে আসা পিছনের ঝকঝকে পিঠটা জলের উপরে অর্ধেকটা উঁচু হয়ে কি দেখে নিয়ে রমণীয় ভঙ্গিতে একটা বক্র রেখায় ভেলার তলায় ডুব দিল। তারপর ভেলার পিছন দিকে নির্গত হয়ে তীব্র গতিতে ধেয়ে গেল ডলফিনের ঝাঁকের দিকে। একটা দুর্দান্ত নীল হাঙ্গর। প্রায় ফুট কুড়ি লম্বা হবে। হাঙ্গরটা অদৃশ্য হতেই আমাদের পাইলট মাছের দল থেকেও কয়েকটা দলছুট হয়ে হাঙ্গরটার পিছু ধাবিত হল। হ্যাঁ, কন-টিকির তুলনায় আরও অধিকতর উত্তেজনার রসদদার সান্ধব বীরের সাক্ষাৎ মিলেছে।

যে-সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে সমুদ্র-বিশেষজ্ঞরা আমাদের বিশেষ সাবধান করে দিয়েছেন তারা হল অক্টোপাশ। এরা ভেলার উপরও উঠে আসতে পারে। যেখান দিয়ে হমবল্ড স্রোত প্রবাহমান সেখানকার একটা জায়গার নাটকীয় বিবরণ ও নাটকীয় ম্যাগনেসিয়াম ফটোগ্রাফ দেখিয়ে ছিলেন ওয়াশিংটনের জাতীয় ভৌগোলিক সংঘ। জায়গাটা বিরাট বিরাট অক্টোপাশের আড্ডাখানা। রাত্রে তারা সমুদ্রেয় উপরে উঠে আসে গভীরতম তল থেকে। এরা এত লোভী যে এদের কেউ যদি মাংসের টুকরোর টোপ গিলে বঁড়শিতে জড়িয়ে যায়, অন্যেরা এসে নির্দ্বিধায় আটকে-পড়া অক্টোপাশকে খেতে শুরু করে দেয়। আটটা বাহু দিয়ে এরা বড় বড় হাঙ্গরকে শেষ করে ফেলতে পারে। এরা বৃহদাকার তিমির গায়েও দাগ রেখে যায়। এদের কর্ষিকায় ঈগলের চঞ্চুর মতো তীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত লুকোনো থাকে। আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—এরা অন্ধকারে ভাসতে থাকে আর চোখ থেকে ফসফরাসের আলো বিকীরিত হতে থাকে। এদের হাত বা কর্ষিকা এত লম্বা যে ভেলার উপরে না উঠেও জল থেকে এই কর্ষিকা ভেলার আনাচে-কানাচে প্রসারিত করে দেখে নিতে পারবে কোথায় কি আছে। রাত্রে আমরা যখন ঘুমে অচেতন, এদের হিমেল হাত আমাদের গলা জড়িয়ে ধরে স্লিপিংব্যাগ থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসুক—এটা আমরা কেউই চাই না। আমাদের প্রত্যেকের কাছেই তরোয়ালের মতো ধারাল ছুরি আছে। কোনদিন যদি এই হাতড়ে-বেড়ানো কর্ষিকার কবলে পড়ে যাই, তখন আত্মরক্ষার জন্যই এই ছুরি কাছে রাখা। আমরা যখন সমুদ্র অভিযানে ভেসে পড়ি সেদিন এই অক্টোপাশদের কথা ভেবেই ভারি বিশ্রী ঠেকেছিল। এমন কি পেরুর সমুদ্র-বিহারীরাও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিল। শুনে মনটা বেশ খিঁচড়ে গিয়েছিল। তারা আমাদের মানচিত্রে দেখিয়ে দিয়ে ছিল—কোন্ কোন্ জায়গাটা খারাপ। এমন কি হমবল্ড স্রোতাঞ্চলেও এরা আছে।

বহুদিন আমরা সমুদ্রে বা ভেলার উপরে স্কুইডের সন্ধান পাইনি। কিন্তু একদিন

সকালে প্রথম সঙ্কেত পেলাম—তারা আছে সমুদ্র এলাকায় বহাল তবিয়তে। সূর্য উঠলে ভেলার উপর বেড়ালের আকারের অক্টোপাশদের এক বংশধরকে দেখতে পেলাম। সাহায্য ছাড়াই রাতের অন্ধকারে ডেকের উপর উঠে এসেছে। এখন মরে পড়ে আছে। কেবিনের দরজার বাইরে বাঁশের গায়ে তার কর্ষিকা-হাত জড়ানো। ঘন কালো কালির মতো তরল পদার্থ বাঁশের পাটাতনের উপর মাখানো আর স্কুইডটার চারপাশে থক থক করছে। কাটল মাছের কালি দিয়ে লগ-বইয়ের পাতা দুই ভরিয়ে ফেললাম। কাটল মাছের কালি ভারতীয় কালির মতোই। খোকা স্কুইডটাকে এবার ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে ডলফিনদের প্রাতরাশের জন্য।

এই খোকা-স্কুইডের মধ্যেই বিরাটকায় রাত্রিচরদের আগমনের আশঙ্কা আমাদের সচকিত করে তুলল। যদি খোকাটা ভেলার উপর উঠতে পারে, তার বুবুক্ষু জনক-জননীদের তো কথাই নেই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন ভাইকিং (খ্রীষ্টীয় ৮ম-১০ম শতাব্দীর স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু) জাহাজে বসে থাকত, তাদের মনেও একই অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে। সমুদ্রের সেই বুড়োটার (দি ওল্ডম্যান অফ দি সী) কথাও মনে পড়ে গেল। কিন্তু পরে যে-ঘটনাটা ঘটল তাতে আমরা বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এই ঘটনা আমাদের খুবই বিব্রত ও বিভ্রান্ত করল। একদিন সকালে কেবিনের ছাদের তালপাতার চালের উপরে অপেক্ষাকৃত বাচ্চা একটা স্কুইডকে পাওয়া গেল। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। ওঠা বেড়া বেয়ে ছাদের উপরে উঠেছে —এ একেবারে অসম্ভব। বাচ্চাটার চারপাশে চক্রাকারে কালির দাগ ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। কোন সামুদ্রিক পাখিও ওটাকে ওখানে ফেলে দেয়নি। কারণ ওটার গায়ে চঞ্চুর কোন দাগ নেই। ভাবলাম, হয়ত সমুদ্রের ঢেউ-এ উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওখানে এসে পড়েছে। কিন্তু রাত পাহারায় ছিল যারা, তারাও সমুদ্রের ঐরকম বিক্ষোভের কোন হদিস দিতে পারল না। কিন্তু এর পর রাতের পর রাত ছোট ছোট স্কুইডদের ডেকের উপর দেখা যেতে লাগল—সবচেয়ে ছোট যেটা সেটা আমাদের মধ্যম আঙ্গুলের সমান।

এখন এটাই স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিদিন সকালে উঠলেই দেখা যায় উড়ুক্কু মাছের মধ্যে দুটো একটা ছোট স্কুইডও আছে। রাতে সমুদ্র খুব শান্ত থাকলেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। ছোট হলেও এরা শয়তানের প্রতিমূর্তি। আটটা বড় বড় কর্ষিকা —কর্ষিকার মাথায় চোষক চাকতি আর চাকতির চেয়ে বড় দুটো কাঁটার মতো বঁড়শি। কিন্তু এখনও ভেলার পাটাতনের উপর বড় স্কুইডের আসার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। অন্ধকার রাত্রে ফসফরাসের আলো-জ্বলা চোখ সমুদ্রের এখানে-ওখানে জলে বেড়াচ্ছে দেখতে পাই। শুধু একবারই মাত্র দেখতে পেয়েছিলাম—সমুদ্রের জল যেন ফুটছে, বুড়বুড়ি উঠছে, গাড়ির চাকার মতো কি একটা উঠে বাতাসে আবর্তিত হচ্ছে। আর

ডলফিনরা বাতাসে লাফিয়ে উঠে পালিয়ে যেতে মরিয়ার মতো চেষ্টা করছে। কিন্তু বড়রা কেন আসছে না, অথচ ছোটরা প্রতি রাত্রেই হানা দিচ্ছে—এটা একটা রহস্য। দু মাসের আগে এই রহস্যের কোন সমাধান-সূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি। এই দু-মাসে আমাদের অভিজ্ঞতার পুঁজিও যথেষ্ট বেড়েছে। এরপর কুখ্যাত অক্টোপাশের অঞ্চল পেরিয়ে এলাম।

ছোট ছোট স্কুইডরা প্রতিরাত্রেই ডেকে হানা দিয়ে চলেছে। একদিন রৌদ্র-ঝলকিত প্রভাতে ঝকমকে কিসের একটা ঝাঁক জল থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে বৃষ্টি-কণার মতো টুপটাপ জলে পড়ছে দেখতে পেলাম। আর অনুসরণকারী ডলফিনদের তাড়নায় সমুদ্রে রীতিমতো জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। ভাবলাম বুঝি উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক। আমরা ইতিমধ্যে তিনটে বিভিন্ন প্রজাতির উড়ুক্কু মাছ দেখেছি। কিন্তু অনুসৃতরা আমাদের ভেলার কাছে চলে এসেছে। অনেকে ভেলার চার পাঁচ ফুট উপর দিয়ে বাতাসে ভর করে চলে গেল বিপরীত পাশে। একটা তো এসে বেণ্টের বুকে ধাক্কা খেয়ে ধপাস করে পড়ল পাটাতনের উপর। একটা খোকা স্কুইড। তাজ্জব ব্যাপার। আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। আমরা ওটাকে একটা পালের কাপড়ের বালতিতে রাখলাম। ওটা মাঝেমাঝে বালতির জলের উপরে ভেসে উঠছে। কিন্তু ছোট বালতিতে সীমিত জায়গার মধ্যে এত গতিবেগ সংহত করতে পারছে না যে জল থেকে অর্ধেকের বেশি উপরে শূন্যে উঠতে পারে।

একথা সবাই জানে—স্কুইডরা সাধারণতঃ রকেট চালিত বিমানের মতো সাঁতরায়। স্কুইডদের দেহের পাশে একটা মুখবন্ধ নল আছে। এই নলের ভিতর দিয়ে ভীষণ জোরে সমুদ্রের জল ভিতরে টেনে নেয়। এই ভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে ভীষণ বেগে পিছনে ছিটকে যায়—সেই সঙ্গে কর্ষিকাগুলো মাথার উপর দিয়ে গুচ্ছাকারে পিছনে চলে যায়—দেখায় ঠিক মাছের টান-টান শরীরের মতো। স্কুইডের দুপাশে গোল মাংসল পর্দা আছে যা সাধারণ অবস্থায় সাঁতারের কাজে ব্যবহৃত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারলাম এই বাচ্চা স্কুইডরা বড় বড় মাছের অতি প্রিয় খাদ্য। উড়ুক্কু মাছের মতো অনুসরণকারীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই মাংসল পর্দার সাহায্যে বাতাসে ভেসে চলতে পারে। মানুষের প্রতিভা রকেট চালিত বিমান পোত আবিষ্কার করার আগেই স্কুইডরা রকেট চালানোর রীতি-পদ্ধতি বাস্তবায়িত করেছে। তারা দেহের ভিতরে নলের সাহায্যে জল ঢুকিয়ে নিতে থাকে, যতক্ষণ না তীব্র গতিবেগের সঞ্চার হয়—তারপর ডানার মতো চামড়ার পর্দা দু পাশে প্রসারিত করে একটা কোণ সৃষ্টি করে বাতাস কেটে চলে। উড়ুক্কু মাছেরা ইঞ্জিনহীন গ্লাইডার বিমানের মতো জলের উপর দিয়ে ছুটে যায় যতক্ষণ গতিবেগ অক্ষুণ্ণ থাকে। এরপর আমরা ওদের গতিবিধির উপর নজর দিতে শুরু করলাম। ওরা পঞ্চাশ থেকে ষাট গজ পর্যন্ত এক

নাগাড়ে যেতে পারে—কখনও একক ভাবে। কখনও বা ছুটো তিনটেকে এক সঙ্গেও দেখতে পাওয়া যায়। কাট্‌ল মাছরাও যে গ্লাইড করে যেতে পারে, প্রাণিতত্ত্ববিদরা একথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের অতিথি হিসেবে প্রায়ই স্কুইডের মাংস খেয়েছি। স্বাদটা অনেকটা গলদা চিংড়ি আর রাবার মিশিয়ে খেলে যেমন লাগে। কিন্তু কন-টিকিতে আমাদের খাবারের তালিকায় স্কুইডের স্থান ছিল সবার শেষে। ভেলার উপর যখন মাগনা পেতাম, ওদের টোপ হিসেবেই বঁড়শিতে বিঁধিয়ে জলে ফেলতাম। বঁড়শি-বাঁধা দড়ি টেনে তুললেই প্রায়ই বড় বড় মাছ পেতাম—জলে লেজ আন্দোলিত করছে। এমন কি টানি বণিটোরাও স্কুইড পছন্দ করে আর টানি-বনিটোরা আমাদের খাদ্য-তালিকায় প্রথম সারির।

সমুদ্রের উপর ভেসে যেতে যেতে আমরা কেবল হঠাৎ অপরিচিতের সম্মুখীনই হচ্ছি না, আমাদের ডাইয়ারিতে এ ধরনের অনেক খুচরো খবর লিপিবদ্ধ আছে।

আজ-আমরা যখন ভেলার ডেকের ধারে বসে রাতের খানা খাচ্ছি, একটা বিরাট সামুদ্রিক প্রাণী ছু বার আমাদের ভেলার কাছে এসেছে। ভীষণ ভাবে জল ছিটকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কি প্রাণী জানি না।

হেরমান আজ একটা গাঢ় বর্ণের মাছ দেখেছে। দেহটা প্রশস্ত সাদা রঙয়ের, লেজ সরু, কাঁটা যুক্ত। ভেলার ডান পাশে বেশ কয়েকবার জল থেকে লাফিয়ে উঠেছে।

ভেলার সামনের দিকে বাঁ পাশে অদ্ভুত ধরনের মাছ দেখা গেছে। ছ-ফুট লম্বা। খুব বেশি হলে ফুট খানেক চওড়া। ছুঁচালো সরু তুণ্ড—বাদামী। মাথার কাছে মস্ত বড় পৃষ্ঠ পাখনা, কিন্তু পিঠের মাঝখানটায় ছোট। বেশ ভারী কাস্তের মতো দেখতে পুচ্ছ পাখনা। সমুদ্রের উপর ভাসছে—মাঝে মাঝে ঈল মাছের মতো কিলবিল করে সাঁতার কাটছে। রবারের ডিঙ্গি চেপে আমি আর হেরমান হাত-হারপুন নিয়ে কাছে যেতেই টুপ করে ডুব মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুনঃও অদৃশ্য।

—পরের দিন। ছুপুর বারটা। এরিক মাস্তলের মাথায় বসে। গত কালের মতোই ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা বাদামী রঙয়ের সরু মাছ দেখতে পেল। ভেলার বাঁ দিকে দ্রুত গতি ছুটে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল পেছন দিকে। যেন একটা বড় বাদামী চ্যাপ্টা ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেল সমুদ্রের বুকে।

নুট একটা সাপের মতো প্রাণী দেখতে পেয়েছে। লম্বায় ছু থেকে তিন ফুট হবে। সোজা খাড়া হয়ে উঠে আবার জলের তলায় নেবে গেল। তারপর সাপের মতো এঁকেবেঁকে একেবারে জলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাঝে মাঝেই একটা বড় ঘরের মেঝের সমান ভাসমান কালো বস্তুর পাশ দিয়ে চলে

যাই। জলে নিমজ্জিত পাহাড়ের মতো নিথর দেহটা। খুব সম্ভবত কুখ্যাত দৈত্যকায় রে-মাছ। কিন্তু নড়া চড়ার কোন লক্ষণ নেই। আমরাও কখনও তার চেহারাটার সম্পূর্ণ রূপ জানতে এগিয়ে যাইনি তার কাছে।

জলে এই ধরনের কত রকমের সঙ্গী দেখতে পাই। তাই সময় কাটে দ্রুত তালে। মাঝে মাঝে জলে নেমে ভেলার নিচে দড়িগুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে ডুব দিতে হয় জলের তলায়। তখন দৃশ্যটা আরও রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। একদিন একটা সেণ্টারবোর্ডের দড়ি ছিঁড়ে আলগা হয়ে ভেলার তলায় চলে গেল সেটা। সেখানে দড়িতে জড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা উপর থেকে কিছুতেই তাকে টেনে উপরে তুলতে পারলাম না। হেরমান আর নুট হল সব থেকে ওস্তাদ সাঁতারু। দু বার হেরমান ভেলার তলায় গিয়ে অনেক টানাটানি করেছে। চারপাশে ডলফিন আর পাইলট মাছের জটলা। দ্বিতীয়বার সবে জল থেকে উঠে এসে ভেলার ধারে জলেতে পা ঝুলিয়ে বসেছে—হাঁফাচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে। হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে দশ ফুট দূরে একটা আট ফুট লম্বা হাঙ্গর সমূদ্রের তলা থেকে ভেসে উঠেছে উপরে। হেরমানের পায়ের আঙ্গুলের দিকে স্থির লক্ষ্যে অবিচলিত গতিতে এগিয়ে আসছে। হয়ত আমরাই হাঙ্গরটার প্রতি অবিচার করেছি। আমরা ওর উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে হারপুন ছুঁড়ে মারলাম ওর করোটিতে। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল হাঙ্গরটা। হুটোপুটি চলতে লাগল জলের মধ্যে—জল উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল হাঙ্গরটা। জলের উপরে শুধু ভাসতে লাগল তেল। এদিকে সেণ্টারবোর্ডটা উদ্ধার করা গেল না—ভেলার নিচে দড়িতে জড়িয়ে পড়ে রইল।

এরিকের মাথায় একটা নতুন মতলব এল। ঝুড়ি চেপে জলে নামার এক পরিকল্পনা মনে মনে এঁটেছে সে। যা দিয়ে ঝুড়ি বানাতে হবে সেইসব সাজসরঞ্জাম পর্যাপ্ত নেই আমাদের। আছে শুধু বাঁশ, দড়ি, আর নারকেল রাখার তালপাতার ঝুড়ি। ঝুড়িটার উপর দিকে বাঁশ বেঁধে এবং চারধারে দড়ির বেড় দিয়ে ঝুড়িটাকে উঁচু করলাম—তারপর ভেলার পাশ দিয়ে এক এক করে জলে নামিয়ে দেওয়া হল। লোভনীয় যা ঢাকা রইল ঝুড়ির মধ্যে। বিনুনীকরা দড়ি আমাদের ও মাছেদের মনে একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করল। তাহলেও কোনকিছু যদি প্রতিকূল মনোভাব নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তেড়ে আসে, ভেলার ডেকে যারা আছে তারা তক্ষুণি আমাদের চোখের পলকে টেনে তুলবে জলের উপরে।

এই ডুবুরী-ঝুড়িটা কেবল প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেই অমূল্য নয়, ভেলার উপরেও আমাদের আনন্দের খোরাক জোগাতে লাগল। ভেলার তলায় যে ভাসমান অ্যাকোয়ারিয়াম আছে তা পর্যবেক্ষণ করারও প্রথম শ্রেণীর একটা সুযোগ করে দিল।

সমুদ্র যখন শান্ত, অলস মন্থর গতিতে ঢেউয়ের পর ঢেউ বহে যায়—আমরা এক

এক করে ঝুড়িতে ঢুকে পড়ি। তারপর ঝুড়িটা জলে নামিয়ে দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দম থাকে জলের তলায় অবস্থান করি। জলের ভিতরে অদ্ভুত ভাবে রূপান্তরিত ছায়াহীন আলো চুঁইয়ে আসে। যে-মুহূর্তে জলের ভিতরে দৃষ্টি চালনা করি, বাহির বিশ্বে আলোক-রশ্মির যেমন একটা সুনির্দিষ্ট গতি পথ আছে, জলের তলায় ঠিক তার উল্টো—এখানে আলোর গতিপথের কোন নির্দিষ্ট নিশানা নেই। আলোর প্রতিসরণ উপর থেকে আসে যেমন, জলের তলা থেকেও তেমনি। সূর্য এখানে আলোক বর্ষণ করে না—সর্বত্র আলো ছড়ানো আছে মনে হয়। ভেলার তলা থেকে যদি উপর দিকে তাকাই সব কিছু উজ্জ্বল আলোয় আলোময় মনে হয়—নটা বড় বড় কাঠের কাণ্ড আর দড়ি-দড়ার বাঁধন অদ্ভুত রহস্যময় আলোয় স্নাত মনে হয়। ভেলার চারদিকে আর দাঁড়ের গায়ে বসন্তসবুজ শ্যাগাছার কম্পমান শিরপেচ বা শিরোমাল্য। পাইলট মাছেরা সারিবন্দী হয়ে চলেছে—দেখে মনে হবে মাছের চামড়ামুড়ে একদল জেব্রা চলেছে। বড় বড় ডলফিনরা বৃত্তাকারে ঘুরপাক খায়। সদা-চঞ্চল, সতর্ক, ঝাঁকি মেরে মেরে চলে। শিকারের সন্ধানে তৎপর। মাঝে মাঝে দুটো কাঠের মাঝখানে ঢোকান রসাল লাল সেণ্টারবোর্ডের গায়ে এসে পড়ে—তখন দেখা যায় তার উপর বসে থাকা গুগলি শামুকের শান্তিময় উপনিবেশ, ঝালর লাগানো হলদে কানকো বা ফুলকো খাদ্য ও অক্সিজেনের জন্য ছন্দময় গতিতে আন্দোলিত করছে। কেউ যদি তাদের খুব কাছে আসে, তারা তখুনি হলুদ-লাল ধার বিশিষ্ট খোলকের ঢাকনি বন্ধ করে দেবে। যতক্ষণ না বুঝতে পারবে বিপদ কেটে গেছে, ততক্ষণ দরজা আর খুলবে না। এখানে আলোক অতি স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধকর। বিশেষ করে আমাদের পক্ষে, যারা গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যের তাপে তপ্ত রোদ্দুরে ভেলার উপর থাকতে বাধ্য। সমুদ্রের সীমাহীন গভীরতার দিকে তাকালে, যেখানে অনন্ত অন্ধকারের রাজ্যে, সেখানেও সূর্যরশ্মির প্রতিসরণের জন্য অন্ধকারটা উজ্জ্বল হালকা নীল ঠেকে। আমরা সমুদ্রের উপরি ভাগ থেকে সামান্য নিচে থেকেও স্বচ্ছ নীল সমুদ্রের অনেক গভীরে মাছেদের সাঁতার কেটে বেড়াতে দেখতে পাই। সত্যই এটা এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। হয়ত তারা বনিটো। তারা ছাড়াও অন্যেরা আছে। কিন্তু তারা এত গভীরতায় থাকে যে তাদের চেনা দুষ্কর। অনেক সময় তারা বিরাট বিরাট ঝাঁক বেঁধে আসে। অনেক সময় বিস্ময়ে ভাবি, সমুদ্রের জল শুধু কি মাছেই ভরা অথবা তারা কয়েক দিনের জন্য আমাদের সঙ্গ দিতে কন-টিকির তলদেশে ইচ্ছে করে জমায়েত হয়েছে!

সোনালী পাখনা টানিরা যখন দেখা দেয়, আমাদেরও ভারি ইচ্ছে হয়, জলের তলায় ডুব মেরে তাদের সঙ্গে মিলিত হই। মাঝে মাঝে তারা বিরাট ঝাঁক বেঁধে ভেলার কাছে আসে। তবে বেশির ভাগ সময় দুটো তিনটে মিলে আসে। তারপর বেশ কয়েক দিন ভেলার চারপাশে সাঁতরে বেড়ায়। শান্তশিষ্টের মতো—যদি না

আমরা তাদের টোপের লোভ দেখিয়ে বঁড়শি-বন্দী করি। ভেলা থেকে তাদের দেখায়—বিরাট একটা বাদামী রংয়ের মাছ—কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু যদি তাদের নিজস্ব পরিবেশে চুপিচুপি এসে পড়া যায়, তখন দেখা যাবে তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আকার ও রঙ বদল করেছে। এই পরিবর্তন এত বিস্ময়কর যে বহুবার আমাদের সাজসরঞ্জাম নিয়ে কাছে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে—এটাই কি সেই মাছ যাদের আমরা কিছুক্ষণ আগে জলের উপর সাঁতার কাটতে দেখেছি! মাছটা কিন্তু আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপেও করত না। অবিচলিত—রাজকীয় মর্যাদায় যথাপূর্ব এগিয়ে চলেছে তারা। কিন্তু টানিদের চেহারায় এক অদ্ভুত সৌষ্ঠব বিকশিত হয়েছে যা অন্য কোন মাছের মধ্যে বিরল-দর্শন। গায়ের রঙটা ধাতব হয়ে উঠেছে—তাতে একটু ফিকে বেগুনীর রেশ। যেন রুপোলী ইস্পাতের তৈরি শক্তিধর টরপেডো। বিভিন্ন অংশের সুষমতা নিখুঁত—তরল পদার্থের প্রবাহের ন্যায় ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে দেহ। দেড়শ থেকে দুশ পাউণ্ডের ওজনের দেহ নিয়ে সাবলীল গতিতে জল কেটে যেতে একটা বা দুটো পাখনা আন্দোলনই যথেষ্ট। সৌষ্টবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রেখেই এই গতিভঙ্গি।

যতই সমুদ্র ও সমুদ্রবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা নিবিড়তর হচ্ছে ততই কোন কিছু দেখে অবাক হবার পালাও কমে আসছে। ক্রমশ নিজের বাড়িতে থাকার মতো স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম অনুভব করছি। যারা এই প্রশান্ত মহাসাগরের নিকট সান্নিধ্যে বাস করত, সেই প্রাচীন আদিম মানুষদের প্রতিও একটা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম অনুভব করছি। অবশ্য সমুদ্রের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা, একথা সত্যি, প্রশান্তমহাসাগরের জলে নুনের পরিমাণ কতটা, নিরূপণ করেছি—টানি ও ডলফিনদের নতুন লাটিন নামকরণও করেছি। তারা অবশ্য এসব কিছুই করেনি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমুদ্র সম্বন্ধে তাদের যে-ধ্যান-ধারণা, তা আমাদের থেকে অনেক সত্য ও বাস্তবসম্মত।

এখানে সমুদ্রের অনেককিছুর নির্দিষ্ট দিকচিহ্ন নেই। মাছ ও তরঙ্গ, সূর্য ও তারারা আসে যায়। পেরু ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে চার হাজার তিনশ মাইল ব্যবধান—এর মধ্যে ডাঙ্গা বলে কিছু নেই। কাজেই ১০০^{0} পশ্চিমে যখন এসে পৌছলাম, আমাদের মানচিত্রে পরিষ্কার একটা পাহাড় দেখানো আছে দেখে বিস্মিত হলাম। এগুলেই সামনে দেখতে পাব। একটা ছোট চক্রাকারে দেখানো হয়েছে জায়গাটা। মানচিত্রটা সেই বছরেই প্রকাশিত। সমুদ্রপথে দক্ষিণ আমেরিকা যাওয়ার নির্দেশিকা খানা খুলে নিয়ে বসলাম। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের নৈর্ঋত কোণে ছশ মাইল দূরে, নিরক্ষরেখা হতে দক্ষিণে ৬^{0}৪২´ কৌণিক দূরত্বে ও পশ্চিমে দ্রাঘিমাগত ৯৯^{0}৪৩´ দূরত্বে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে এবং পরে আবার ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে উর্মিভঙ্গের খবর

লিপিবদ্ধ করা আছে। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে এই স্থান থেকে এক মাইল দূর দিয়ে পশ্চিম-মুখো একটা বাষ্পীয় পোত অতিক্রম করে যায়, কিন্তু কোন উর্মিভঙ্গের চিহ্ন দেখতে পায়নি। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে আর-একটা জাহাজও দক্ষিণে এক মাইলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে—কোন উর্মিভঙ্গের চিহ্ন তাদের নজরেও পড়েনি। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে বাষ্পীয় জলযান 'কোউরি' এই স্থান দিয়ে যাবার সময় ন'শ ষাট বাঁও জলের তলায়ও কোন স্থলের নিদর্শন পায়নি।

মানচিত্র অনুযায়ী এখনও এই জায়গা দিয়ে জাহাজ যাতায়াতের পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থেকে যাচ্ছে। ভারী জাহাজ চলাচলের পক্ষে এই মগ্ন চড়া নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। তবে ভেলায় চড়ে যাওয়ায় কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কাজেই ওখান দিয়ে যাওয়াই মন স্থির করলাম। সরেজমিনে দেখতে চাই সত্যিকার কি আছে ওখানে। আমরা যে-বিন্দুর দিকে চলেছি তা থেকে একটু উত্তরে মগ্ন পাহাড়টা থাকার কথা। দাঁড়টা ভেলার দক্ষিণ পাশে রেখে চৌকো পালটা একটু গুটিয়ে ফেললাম। এর ফলে ভেলার সম্মুখভাগ কিছুটা উত্তরমুখো হল। সমুদ্রের স্রোত ও বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে বইছে। এবার সমুদ্রের জল চলকে এসে আমাদের স্লিপিং ব্যাগের উপর পড়ল। আবহাওয়াও বেশ জোরাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা খুশি হলাম, বাতাসের সঙ্গে প্রশস্ত কোণ করে কন-টিকিকে অবিচলিত গতিতে নিয়ন্ত্রণ করতে একটুও বেগ পেত হল না। এখনও পালে হাওয়া লাগছে। তা না হলে পাল চুপসে যেত। আবার ভেলাটা ঠিক পথে সুনিয়ন্ত্রণে আনতে পাগলের মতো বেশ কিছুটা নাস্তানাবুদ হতে হল।

দু দিন দু রাত্রি আমরা উত্তরে বায়ু কোণে ভেলাটাকে চালিত করলাম। অয়ন বায়ু কখনও অগ্নিকোণের দিকে, কখনও বা পূবে বইছে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠছে। অনবরত দিক পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রের মতিগতির হদিস পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। আমরা অনবরত ঢেউয়ের চূড়োয় উঠছি, আবার খাদে নামছি। মাস্তুলে বসে সব-সময় চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হচ্ছে। যখন ঢেউয়ের গা বেয়ে উঠছি, দিগন্ত রেখা বেশ প্রশস্ততর দেখায়। আমাদের বাঁশের কেবিনের উচ্চতা থেকে ঢেউয়ের উচ্চতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। হিস্ হিস্ গর্জন করে জলের স্তম্ভ উঁচু হয়ে উঠছে—যে কোন মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত দিকে ভেঙ্গে পড়তে পারে। রাত ঘনিয়ে এলে আমরা কেবিনের দরজার মুখে রসদের বাক্স বসিয়ে প্রতিরোধ-ব্যূহ রচনা করলাম। কিন্তু তাহলেও একটা ভিজে রাত কাটল। সবেমাত্র ঘুমে চোখের দু পাতা এক করেছি এমন সময় বাঁশের দেয়ালে প্রথম ঝাপটাটা এসে পড়ল—বাঁশের চাটাইয়ের ফাঁক-ফোকোর দিয়ে ফোয়ারার মতো জল ঢুকতে লাগল ভিতরে। খাবার-দাবার ও আমাদের উপর যেন ফেনায়িত ধারা বর্ষণ হতে লাগল।

'প্লামবারকে ফোনে খবর দাও', কে একজন ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল। আমরা যথা সম্ভব কুঁকড়ে বসে রইলাম—যাতে মেঝের ফাঁক ফুটো দিয়ে জল বের হয়ে যেতে পারে। প্লামবারও আসে নি আর সে-রাতে আমাদের বিছানাপত্তর স্নানের জলে ভিজে একসা হয়ে গেল। হেরমান যখন পাহারায় ছিল, একটা ডলফিন অনিচ্ছাকৃত ভাবে ডেকের উপর উঠে এসেছিল।

পরের দিন সমুদ্রের এলোমেলো ভাব অনেকটা কেটে গেল। অয়নবায়ু মনস্থির করে ফেলেছে, আজকে পুব দিক থেকে বইবে। মাস্তুলের উপর পাহারা অনবরত বদল করতে হচ্ছে। বিকেলের কাছাকাছি আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাব আশা করছি। সেদিন সমুদ্রে জীবনের লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকটিত হল। হয়ত আজকে নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের কাজটা আরও নিখুঁত চালিয়েছি।

বিকেলের দিকে বিরাট একটা তরওয়াল মাছকে ভেলার দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। দুটো ছুঁচালো পাখনা জলের উপর খাড়া হয়ে উঠেছে। একটা থেকে আর একটার দূরত্ব ছ-ফুট হবে। তরওয়ালটা প্রায় দেহের সমান লম্বা মনে হল! দাঁড়ে যে বসে ছিল, বৃত্তাকারে তার কাছাকাছি এসে ঢেউয়ের চূড়োর পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। আজকের দুপুরে খানা যা খেলাম, সবই লোনা আর জলে ভেজা। আমরা যখন খাচ্ছিলাম মাথা পিঠ আর আন্দোলিত পাখনা সমেত বিরাট একটা কাছিমের মূর্তি আমাদের নাকের প্রায় কাছ বরাবর উৎক্ষিপ্ত হল হিস হিস গর্জনকারী ঢেউয়ের তাণ্ডবে। পর পর দুটো ঢেউ ঝটতি এসে পড়ায় পলকে কাছিমের মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এবারও সাদাটে সবুজ ডলফিনের পেটের চিকচিকানির চকিত আভাস পেলাম বর্মাবৃত সরীসৃপের পেটের তলায়। এই অঞ্চলটা ইঞ্চিখানেক লম্বা ছোট ছোট উড়ুক্কু মাছে ঠাসা। বিরাট ঝাঁক বেঁধে তারা এগিয়ে চলেছে। মাঝেমাঝে আমাদের ডেকে এসে উড়ে পড়ছে। কখনও সখনও একক স্কুয়া (উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের সামুদ্রিক পাখি) নজরে পড়ছে। শঙ্খচিলেরাও নিয়মিত হানা দিচ্ছে। এদের লেজ দ্বিধাবিভক্ত। যেন দৈত্যাকায় সোয়ালো। এরা ভেলার উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ডাঙা যে কাছেই, শঙ্খচিলেরা তার বার্তাবাহক। আমরাও ডাঙা সম্বন্ধে আশান্বিত হলাম।

'হয়ত কোন পাহাড় বা বালিয়াড়ি কাছাকাছি কোথাও আছে,' আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এ রকম ভাবছে। সবচেয়ে আশাবদী যে সে বলল, 'ধরো, যদি সবুজ তৃণময় ছোট একটা দ্বীপ দেখতে পেলাম। আমাদের আগে সেই দ্বীপে কেউ গিয়েছে কিনা জানতে পারব না। তাহলে আমরাই হব একটা নতুন দ্বীপের আবিষ্কারক—'কন-টিকি দ্বীপ!' দুপুরের পর থেকে এরিক বারবার রান্নার বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে সেক্সটাণ্টের ভিতর দিয়ে পিট পিট করে তাকিয়েছে। বিকেল ছটা কুড়ির সময় সে

ঘোষণা করল—এখন নিরক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে আমাদের কৌণিক দূরত্ব ৬°·৪২´ মিনিট আর পশ্চিমে দ্রাঘিমাগত দূরত্ব ৯৯°৪২´ মিনিট। আমরা মানচিত্র অনুযায়ী পাহাড় থেকে পূব মুখো চলেছি এক মাইল দূর দিয়ে। বাঁশের লগাটা নামিয়ে পালটা গুটিয়ে ফেলা হল। বাতাস পূবমুখী বইছে। ধীরে ধীরে আমরা বাতাসের টানে পৌঁছে যাব সেখানে। সূর্য দ্রুত সমুদ্র গর্ভে ডুবে গেল। পূর্ণচন্দ্র তার আলোক সম্ভার নিয়ে সাড়ম্বরে দেখা দিল আকাশে। সমুদ্রের বুক আলোক চ্ছটায় ঝলসে উঠল। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের সারি বহে চলেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে—কখনও কালো, কখনও বা রূপালী দেখাচ্ছে! মাস্তুলের মাথা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। কিন্তু মগ্ন চড়া বা জল থেকে জেগে ওঠা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া তরঙ্গের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। কেউই কেবিনের ভিতরে ঢুকছে না। সবাই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে দেখছে। দু-তিন জন তো একসঙ্গে মাস্তুলের মাথায় উঠে বসেছে।

চিহ্নিত এলাকার উপর দিয়ে যাবার সময় আমরা সবসময় গভীরতার মাপ নিতে নিতে চলেছি। ভেলায় যতগুলো জলে ডোবানোর সীসের চাকতি ছিল, চুয়ান্নটা। সিল্কের সুতো পাকিয়ে তৈরি-করা দড়ির প্রান্তে বেঁধে তিন হাজার ফুট বাঁও জলের নিচে নামিয়ে দিলাম, কিন্তু তল পেলাম না। না মধ্যিখানে—না পূবে বা পশ্চিমে। শেষবারের মতো সমুদ্র-বক্ষের দিকে তাকালাম। এবার নিঃসন্দেহে বলতে পারি—জায়গাটা ভালোমতো জরীপ করা হয়েছে। কোন নিমজ্জিত পাহাড় বা বালিয়াড়ির কোন চিহ্ন নেই কোথাও। আমরা আবার পাল তুলে দিলাম—দাঁড়টাকে যথাস্থানে স্থাপন করা হল। বাতাস ও স্রোতের গতির অনুকূলে আবার আমাদের ভেলার মুখ ফেরালাম।

আবার আগের মতো ভেলা স্বাভাবিক পথে ভেসে চলল। ঢেউ আসছে, চলে যাচ্ছে পিছনের অনাবৃত কাঠের ভিতর দিয়ে। এবার আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে-যেতে পারি। ভেজার ভয় নেই—খাবারও জলে সিক্ত হবে না। এমন কি সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও না। অয়ন বায়ু পূর্ব থেকে অগ্নিকোণে এলোমেলো ছুটোছুটি করলেও না। এইভাবে চললও বেশ কয়েক দিন। অলীক পাহাড়ের খোঁজে যে-অভিযান চালান হল, তা থেকে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। ভেলার তলি হিসেবে সেণ্টারবোর্ডের কার্যকারিতার যথেষ্ট আভাস পাওয়া গেল। হেরমান ও নুট ডুব দিয়ে ভেলার তলায় গিয়ে পঞ্চম সেণ্টারবোর্ডের সংস্কার করল। আমরা এই অদ্ভুত কাষ্ঠফলকগুলোর উপকারিতা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানলাম। আগে বুঝতে পারিনি—এমন কি ইণ্ডিয়ানরাও এর উপকারিতার কথা ভুলে গেছে। এই কাষ্ঠ ফলক দিয়ে ভেলার তলির কাজ হয়—ভেলাটাকে বাতাসের সঙ্গে সমকোণে এগিয়ে

যেতে সাহায্য করে। এত সহজ ভাবে ভেসে যাওয়া! কিন্তু স্পেনীয়রা লিখে গেছে—বেশির ভাগ ইণ্ডিয়ানরা বালসা কাঠের ভেলা যখন সমুদ্রে চালনা করত, দুটো কাঠের মাঝখানের ফাঁকে একটা কাষ্ঠফলক গুঁজে দিত। এ কথাটা পড়ে আমাদের কাছে যেমন, তেমনি অন্যেরা যারা এই সমস্যার কথা নিয়ে চিন্তা করত, তাদের কাছেও দুর্বোধ্য ঠেকত। দুই কাঠের ফাঁকে কাঠের ফলক শুধু কাঠদুটোকে শক্ত করে বেঁধে রাখতেই সাহায্য করে মাত্র। ভেলাটাকে এদিক-ওদিক ঘোরাতে বা দাঁড়ের কোন সাহায্য করে এ ভাবাই যায় না!

কিন্তু আসল রহস্যটা আমাদের কাছে এইভাবে ফাঁস হয়ে গেল। বাতাসের গতিবেগ আবার সুস্থির হয়ে এসেছে। সমুদ্র অনেকটা শান্ত। ঢেউয়ের উচ্চতা বেশ কমে গেছে। কন-টিকি একই গতিতে স্থির ভাবে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। দাঁড় নিয়ে আমাদের আর বেশি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। আলগা হয়ে যাওয়া সেণ্টার-বোর্ডকে উদ্ধার করে যে-মুহূর্তে ভেলার পিছন দিয়ে দুটো কাঠের ফাঁকে যথাস্থানে বসিয়েছি, কন-টিকি পশ্চিম থেকে বায়ু কোণের দিকে কয়েক ডিগ্রী মোড় নিয়ে শান্ত গতিতে এগুতে শুরু করল। আমাদের আর দাঁড়ের সাহায্য নিতে হচ্ছে না। এখন যদি সেণ্টারবোর্ডটাকে উপরে টেনে তুলি অমনি ভেলাটা পাক খেয়ে আগের পথে চলতে শুরু করবে। এই ফলকটা উপরে টেনে তুলে ও নিচে ঠেলে নামিয়ে ভেলার গতিপথ পরিবর্তন করা যায়—দাঁড়ে আর হাত লাগাতে হয় না।

এটাই হল ইনকাদের দক্ষ পদ্ধতির নমুনা। ভার-সাম্য বজায় রাখার অতি সরল সাধারণ ব্যবস্থা। এর সাহায্যেই পালে বায়ুর চাপ মাস্তুলটাকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। মাস্তুলের বাহুদুটো ভেলার সামনের ও পিছনের অংশ যেন। যদি পিছনের কাষ্ঠফলকের সংখ্যাধিক্যে পিছনটা অপেক্ষাকৃত ভারী হয়, তাহলে ভেলার অগ্রভাগ বাতাসের গতিবিধির আওতায় পড়ে বাতাসের সঙ্গে যদৃচ্ছ মোড় নিতে বাধ্য হবে। মাস্তুলের সব থেকে কাছাকাছি যেসব ফলক আছে, হাত ও শক্তির মধ্যে সম্পর্কে হেতু তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বাতাস যদি পাশ্চাৎগামী হয় এই ফলকগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। তখন দাঁড়ের সাহায্য ছাড়া ভেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করা সুকঠিন। এই অবস্থায় ভেলাটা দীর্ঘ হলে ভেলা সমুদ্রে সহজভাবে চলতেও পারে না—অসহায় হয়ে পড়ে। কেবিনের দরজা আর যেখানে আমাদের খাবার দাবার জমা থাকে, সে-জায়গাটা ভেলার ডান দিকে—তাই ভেলার বাঁ দিকটা দিয়ে ঢেউয়ের মুখোমুখি হতে চেষ্টা করি আমরা।

আমরা অবশ্য দুই কাঠের মাঝখানের কাষ্ঠফলকের সাহায্যে ভেলার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম দাঁড়ের দড়ি টানাটানি না-করে। কিন্তু দাঁড় চালনায় এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে কাঠের ফলক অন্য কাজে লাগিয়ে দাঁড়কেই ভেলা নিয়ন্ত্রণের প্রধান

হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছি আমরা।

যাত্রাপথের পরবর্তী অধ্যায় আমাদের কাছে অদৃশ্য ছিল—কারণ মগ্ন বালিয়াড়ির অস্তিত্ব মাত্র মানচিত্রেই সীমাবদ্ধ! সমুদ্রে আমাদের চুয়াল্লিশ দিন কেটে গেছে। আমরা দ্বীপপুঞ্জের নিকটতম দ্বীপের দূরত্বের ব্যবধানের অর্ধেকটা অতিক্রম করেছি মাত্র। পূব দিকে দক্ষিণ আমেরিকা ও আমাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান দু-হাজার মাইলেরও বেশি। পশ্চিমে আমাদের ও পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেও ঐ একই দূরত্ব। ঈশান কোণের পুবে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণে ইস্টার দ্বীপ আমাদের সব থেকে কাছে—যেদিকেই তাকাই না কেন এই সীমাহীন সমুদ্রে তারাও আমাদের থেকে পাঁচশ মাইলেরও অনেক দূরে অবস্থিত। এ পর্যন্ত একটা জাহাজও দেখতে পাইনি। এর কারণ—প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজ চলাচলের পথ থেকে অনেক দূর দিয়ে চলেছি আমরা।

কিন্তু এই দূরত্বের বিশালতা আমরা একটুও অনুধাবন করতে পারিনি, কারণ দিগন্তরেখা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের চলার জগত যেন একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ভেলাটাকে কেন্দ্র-বিন্দু করে আকাশের ধনুকাকৃতি ছাদে একটা বৃত্ত যেন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। একই তারার দল রাতের পর রাত আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

॥ ৬ ॥

সমুদ্র যখন উত্তাল থাকে না আমারা রবারের ডিঙ্গি চড়ে মাঝেমাঝেই সমুদ্রে ভেসে পড়ি—ক্যামেরায় নানা ছবি তুলি। প্রথম যেদিন সমুদ্রে ডিঙ্গি ভাসান হয়েছিল, সেদিনের কথা কিছুতেই ভুলব না। কি শান্ত না ছিল সমুদ্র! তাই দেখে বেলুনের মতো হালকা ডিঙ্গিটা জলে নামিয়ে ডিঙ্গি-বিহারের দুর্নিবার লোভ হয়েছিল দু-জনের। ভেলার কাছ থেকে একটু দূরে যেতেই তারা ছোট বৈঠা জলে নামিয়ে দিল আর সঙ্গে-সঙ্গে অট্টহাসি। ঢেউয়ের ধাক্কায় তারা দূরে সরে গেল। পলকে চোখের আড়াল। আবার দেখা গেল। যে-মুহূর্তে আমাদের দেখতে পাচ্ছিল, আরও জোরে হেসে কুটোপাটি হচ্ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের বুক থেকে তাদের হাসি ঢেউয়ের মতোই গড়িয়ে গড়িয়ে আসছিল। আমরা চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। কেমন একটা মিশ্র অনুভূতি হল। হাসবার মতো কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না—একমাত্র নিজেদের লোমশ মুখ ছাড়া। আমাদের কেমন যেন মনে হল তাদের সাময়িক মস্তিস্ক-বিকৃতি ঘটেছে। হয়ত সর্দিগর্মি হয়েছে! এই হাসির জন্য কোনমতেই ভেলায় উঠতে পারছিল না—হাঁফাচ্ছিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল তাদের, ভেলায় টেনে তোলার জন্য কাকুতিমিনতি করতে লাগল তারা।

আমরা দু জন ঝাঁপিয়ে পড়লাম নৃত্যচঞ্চল ডিঙ্গিটার উপর—সঙ্গে-সঙ্গে ঢেউয়ের কবলে পড়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলাম। সঙ্গে-সঙ্গেই ধপাস করে বসে হাসিতে ফেটে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেলার কাছে এগিয়ে আসতে হবে। বাকি দু জন এখনও নিরুদ্বেলিত—তারা এখনও বাইরে বের হয়ে আসেনি। তাদের ধারণা আমরা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে পড়েছি।

দূর থেকে এবার আমাদের গর্বের ধন ভেলাটাকে দেখবার সৌভাগ্য হল। সত্যি কথা বলতে কি, কেমন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করল—এ এক নৈরাশ্যজনক পাগলের কাণ্ডকারখানা বলে প্রতিভাত হল। উন্মুক্ত সমুদ্রে নিজেদের এ ভাবে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কখনও। সামান্য ঢেউয়েই ভেলার কাঠ জলে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে —তখন চোখের সামনে ভাসতে থাকে আমাদের ছোট্ট কেবিনটা। সামনে প্রশস্ত দরজা। কেবিনের মাথায় তালপাতার ছাউনি ঢেউয়ের ঝাঁকি খেয়ে অনবরত ওঠানামা করছে। ভেলাটাকে দেখাচ্ছে নরওয়ের একটা পুরানো খড়ের মাচার মতো—অসহায়ের মতো ভেসে চলেছে সমুদ্রের বুকে। একমুখ দাড়ি, রোদে তামাটে বদমাসদের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় নিয়ে চলেছে খড়ের মাচা। কাউকে যদি সমুদ্রে স্নানের গামলা চেপে বৈঠা চালিয়ে আমাদের পিছু পিছু আসতে দেখতাম, আমরা কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারতাম না। ছোট্ট একটা ঢেউ কেবিনের বেড়ার অর্ধেক কাছে এলেই মনে হয়, এখুনি প্রশস্ত দ্বার পথে হুহু করে জল ভিতরে ঢুকে যাবে—যেখানে দাড়িওয়ালা লোক দুটো হাঁ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ভেলাটা ঠিক মুহূর্তে ঢেউয়ের মাথায় চেপে বসল। ভবঘুরে দুটো একমুখ শুকনো দাড়ি নিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে—জলে ভেজেনি একটুও। বিরাট উঁচু ঢেউ তেড়ে এলে মনে হয়, ভেলা তার কেবিন-পাল-মাস্তুলটাস্তুল নিয়ে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ-এ একেবারে তলিয়ে যাবে। কিন্তু কই, কিছুই হয় না। পরমুহূর্তেই দেখা যায়—ভবঘুরে দাড়িওয়ালারা আর কেবিন যথাপূর্বং অটুটই আছে—কোন ইতরবিশেষ হয়নি। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠলেও আমরা ভাবতেও পারিনি যে আজগুবি ভেলাটায় সবকিছু নিরাপদেই আছে।

এর পরের বার ডিঙ্গি চড়ে এই রকম হাসির খোরাক যোগাতে গিয়ে আমরা প্রায় মহাসর্বণাশের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বাতাস ও সমুদ্র দুই-ই উত্তাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন কন-টিকি দৃঢ়ভাবে নিজের পথ কেটে এগিয়ে চলেছে বেশ দ্রুত গতিতেই আমাদের কিছু বোঝবার আগেই। আমরা যারা ডিঙ্গিতে ছিলাম, তাড়াতাড়ি ভেলার কাছে আসতে জীবনপণ লড়াই করতে লাগলাম। ভেলাটাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছি না। না যাচ্ছে থামানো, না অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। ভেলাটা একপাক ঘুরে পিছনে আসবে তারও সম্ভাবনা নেই। কন-টিকির

উপর যারা ছিল তারা পাল নামিয়ে ফেলল। বাতাস কেবিনটাকে এমন ভাবে কবজা করে ফেলেছে যে ভেলাটা তর-তর বেগে পশ্চিমমুখো ছুটে চলেছে। যেমন আমরাও খেলনা বৈঠা চালিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছি ভেলার কাছে আসতে। সকলের মনে তখন একটাই দুর্ভাবনা—কেউ যেন না বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। পলাতক ভেলাটার আবার নাগালে পাওয়ার আগে বেশ কিছুটা ভীষণ ভয়াল মুহূর্ত কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত আমরা ভেলায় উঠে হামাগুড়ি দিয়ে বাকিদের কাছে অগ্রসর হলাম।

সেদিন থেকে ভেলার অগ্রভাগের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে ডিঙ্গি না বেঁধে রবারের ডিঙ্গি জলে নামানো বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। দরকার হলে দড়ি ধরে ডিঙ্গিটাকে ভেলার কাছে টেনে আনা যাবে। আমরাও ভেলা থেকে খুব একটা দূরে যেতাম না। একমাত্র বাতাস যখন ধীরে বইত আর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঢেউয়ের নামগন্ধও থাকত না, তখন হয়ত কোন দিন কালেভদ্রে একটু সাহস করে দূরে চলে যেতাম। কিন্তু তাও করেছি যখন পলিনেশিয়ায় পৌছতে আর মাত্র অর্ধেকটা পথ বাকি এবং বাতাস ও সমুদ্র পূর্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। সমুদ্র যেন ভূ-গোলকের চারদিকে ধনুকের মতো বেঁকে আছে বৃত্তের প্রতিটি বিন্দুর দিকে। তখনই আমরা কন-টিকি থেকে নিরাপদে ডিঙ্গিতে অবতরণ করতে পেরেছি—আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে নীলাম্বুরাশি ভেদ করে ডিঙ্গি বেয়ে চলেছি।

যখন দেখতাম দূরে ভেলার কালো ছায়াটা ক্রমশ ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে আর পালটা দিগন্তের বুকে একটা অস্পষ্ট কালো চৌকো খপুরির মতো দেখাচ্ছে, মনটা তখন কেন যেন নিঃসঙ্গতায় দুলে উঠত। অসীম সমুদ্রে একলা! সমুদ্রটা ধনুকের মতো বেঁকে আছে মাথার উপরের নীল আকশের মতো—শুধু নীলের উপর নীলের স্তর বিছানো। আর যেখানে আকাশ ও সমুদ্র মিশেছে, সেখানে সব নীল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দেখে-টেকে মনে হত আমরা অনন্ত শূন্যে ঝুলছি। আমাদের পৃথিবীটা যেন নীল এক মহাশূন্য, আর সেই নীলিমায় কোন নির্দিষ্ট বিন্দু নেই। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলের সোনালী তপ্ত সূর্য আমাদের ঘাড়ের পিছনটা জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। দূরে দিগন্তের কোণে নিঃসঙ্গ ভেলার পালটা চুম্বকের বিন্দুর মতো আমাদের আকর্ষণ করে তার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। আমরা বৈঠা বেয়ে ভেলার কাছে ফিরে এলাম—পাটাতনের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে লাগলাম। মনের মধ্যে একটা অনুভূতি হতে লাগল—আমরা যেন নিজের বাড়িতে, নিজেদের পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। ভেলার পাটাতনের উপর হলেও নিবিড় নিরাপত্তার আশ্রয়ে। বাঁশের কেবিনের ভিতরটা ছায়া-ঘন। বাঁশ ও শুকনো তালপাতার গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারল। বাইরের রৌদ্রতপ্ত নীলিমার পবিত্রতার স্পর্শ পেতে লাগলাম বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে। বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই। এই ভাবেই আমরা অভ্যস্ত! এই

ভাবেই কাটল কিছু সময়। আবার বাইরের নীলিমার স্বচ্ছ বিপুল বিস্তার দুর্নিবার আকর্ষণে আমাদের টেনে নিয়ে এল বাইরে।

এই নড়বড়ে বাঁশের কেবিন বা ছাউনি মনের উপর এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করত। দৈর্ঘ্যে চোদ্দ ফুট আর প্রস্থে আট ফুট পরিমিত জায়গা। বাতাস ও সমুদ্রের চাপ হ্রাস করতে একটু নিচু করেই তৈরি। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথা ছাদে ঠেকে যাবে! দেয়াল ও ছাদ ছাঁচা বাঁশের শক্ত বাখারির তৈরি। দড়ি দিয়ে বেশ আঁট করে বাঁধা ও খাড়া করে রাখা। তার গায়ে আর এক প্রস্থ চাটাইয়ের বেড়ায় ঢাকা। চার ধারে সবজে ও হলুদ বাঁশের চৌকো কাঠামো। ছাদের উপর থেকে ঝালরের মতো পাতা ঝুলছে। চোখের উপর স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেয় যা সাদা দেয়াল পারে না। কেবিনের দক্ষিণের দেয়ালের এক তৃতীয়াংশ ফাঁকা। ছাদ ও দেয়ালের ভিতর দিয়ে সূর্য ও চাঁদের আলো আসে। তা সত্ত্বেও আধুনিক কালের সাদা রঙ-করা ভারী দেয়ালও জাহাজের দুপাশের গায়ে গর্তের চেয়ে এই আদিম যুগের খোঁয়াড়ের মতো আশ্রয়-স্থান অনেক বেশি নিরাপত্তার বোধ জাগায় মনে।

এই অদ্ভুত সত্যের একটা ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত নিচের সিদ্ধান্তে এসে পৌছলাম। সমুদ্র ভ্রমণে তালপাতার ছাউনি দেওয়া বাঁশের কেবিনে বাস করার ব্যবস্থায় আমাদের চেতনাবোধ অনভ্যস্ত। আবর্তিত সমুদ্রের বিরাট তরঙ্গমালা আর তার উপর ভাসমান ভেলার উপর ছোট কুঁড়ের মধ্যে নেই কোন ঐক্য-সূত্র। হয় তরঙ্গমালার মধ্যে এই কুঁড়ে একেবারে বেমানান, নয়ত কুঁড়ের বেড়ার চারপাশের তরঙ্গমালারাই বেমানান। ভেলার উপর যতক্ষণ আছি এই বনের আমেজ-জাগানো ঝুপড়িই বাস্তব সত্য—বরং এই উত্তাল তরঙ্গমালারাই মনে হয় কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু রবারের ডিঙ্গিটা ঠিক উলটোটাই মনে করিয়ে দেয়।

সমুদ্রে বালসা কাঠ ঠিক সমুদ্র-শকুনের মতোই ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে চলে। ভেলার পিছন থেকে ঢেউ ভেঙ্গে পড়লে, আসুক না কেন জল পাটাতনের উপর—ভেলার মাঝখানে শুকনো জায়গায় যেখানে কেবিনটা তৈরি সেখানে জল আসে না—আমাদের আস্থাও টলটলায়মান হয় না। সমুদ্র-বিহার যত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠছে, এই আরামদায়ক খুপড়িতে নিরাপত্তাবোধও ততই নিবিড়তর হয়ে উঠছে। কেবিনের আশপাশ দিয়ে যে ফেনার মুকুটপরা ঢেউগুলো নাচতে নাচতে চলে যায়, তারা আমাদের মনে কোন আতঙ্কের দাগ কাটে না—আমরা যেন চলচ্চিত্রের পর্দায় ছবি দেখছি। ভেলার চারধারে কোন সুরক্ষিত ব্যবস্থা নেই। কেবিনের দেয়াল ভেলার কিনারা থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে অবস্থিত। আমরাও সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র দেড় ফুট উঁচুতে আছি। আমাদের মনের ভাবখানা এখন, আমরা যেন সমুদ্র থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে চলে এসেছি—সমুদ্রের বিপদ থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে

বনের মধ্যে একটা কুঁড়েতে বাস করছি। কেবিনের ভিতরে আমরা চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকি—অদ্ভুত দেয়াল-বেড়ার দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে। ছাদটা বাতাসে আন্দোলিত শাখা-প্রশাখার মতো মুচড়োয়, ওঠানামা করে—নাকে নেই কাঁচা কাঠ, বাঁশ ও শুকিয়ে-যাওয়া নারকেল পাতার বনজ গন্ধ।

মাঝে মাঝে রাতের বেলা রবারের ভিঙ্গি চেপে সমুদ্র থেকে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি নিজেদের। কয়লা-কালো সমুদ্র চারদিকে ফুলেফেঁপে বয়ে যাচ্ছ, সমুদ্রের বুকে তারাদের ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত। প্ল্যাংকটনের ঝিকিমিকি। সহজ সরল পৃথিবী। অন্ধকারে শুধু তারার মালা। খ্রীস্টের জন্মের আগের-না পরের, এই ১৯৪৭ সন—হঠাৎ যেন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আমরা বেঁচে আছি এবং বেশ জোরের সঙ্গেই বেঁচে আছি। বুঝতে পারছি, যান্ত্রিক যুগের আগেও মানুষ পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে বেঁচে ছিল। বরং আধুনিক কালের মানুষের চেয়ে তাদের জীবন ছিল আরও সম্পূর্ণ—ঐশ্বর্যপূর্ণ। বিবর্তন বা সময়ের অস্তিত্বই যেন লোপ পেয়েছে। যা বাস্তব, যা এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ, তা যেন আজ—যা চিরদিন ছিল এবং চিরকাল থাকবে, তার মতোই সত্য। অসংখ্য তারার জটলায় এবং অসীম, ছেদহীন অন্ধকারে আমরা যেন ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি।

কন-টিকি একবার ঢেউয়ের মাথায় উঠছে আবার খাদে নামছে। পিছনে মসীকৃষ্ণ জলরাশি যা আমাদের ও কন-টিকির মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করছে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে কন-টিকির চারপাশে এক অপার রহস্যময় পরিবেশ রচিত হয়। শক্ত ঝকঝকে কাঠের কাণ্ডের দুপাশে সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জের ঝালর, মিশকালো স্ক্যাণ্ডেনেভীয় জলদস্যুদের জাহাজের পালের মতো চৌকো পাল, একটা বাঁশের অমসৃণ খুঁপরি, ভেলার মাঝামাঝি জায়গায় রাখা মোমবাতির হলদেটে আলো—সবকিছু মিলে একটা পরীর রাজ্যের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাস্তবতার সঙ্গে ছিটেফোঁটা মিল নেই। মাঝেমাঝে কালো সমুদ্র ভেলাটাকে চোখের সামনে থেকে নিঃশেষে মুছে দেয়—আবার দেখা দেয় তারাদের পটভূমিকায় কালো ছায়ার মতো। ঝকঝকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে।

যখন এই একান্ত নিঃসঙ্গ ভাসমান ভেলাটাকে দেখি—মনের পটে ভেসে ওঠে এই ধরনের আর-এক ভেলাবহরের ছবি। অর্ধবৃত্তাকারে ভেসে চলেছে দিক চক্রবালের দিকে। প্রথম মানুষেরা ডাঙ্গার খোঁজে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে ছিল। আশাবাদী ছিল তারা। টুপাক খুপানকুই সমগ্র পেরু ও ইকুয়াডোরকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে এনেছিল। যেদিন স্পেনীয়রা সে-দেশ আক্রমণ করে, সেদিন সে লোকজন নিয়ে সহস্রাধিক বালসা কাঠের ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগরের ডাঙ্গার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। সমুদ্রে দ্বীপের অস্তিত্ব আছে এ রকম জনশ্রুতি শুনেছিল তারা। দুটো

দ্বীপ খুঁজে পেয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। সে-দ্বীপ গ্যালাপাগোস দ্বীপ। আটমাস পরে সে আর তার বহু সঙ্গী আবার ইকুয়াডোরে ফিরে এসেছিল ভেলা বেয়ে। কন-টিকি ও তাঁর অনুগামীরা এই ভাবেই একদিন বহুশত বছর আগে সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের ফিরে আসার কোন কারণ ছিল না।

আবার আমরা ভেলার ডেকে লাফিয়ে উঠে পড়তাম—বাঁশের পাটাতনের উপর আলোক-বর্তিকার চারপাশে গোল হয়ে বসতাম। পনেরশত বছর আগে পেরু থেকে যাত্রা করেছিল যে-সমুদ্র-বিহারীরা, তাদেরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল—সেই কথা নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে যেতাম। পালের গায়ে দাড়িওয়ালা মানুষের বিরাট ছায়া পড়ত। সেই সঙ্গে মনে পড়ত পেরুর আর একদল শ্বেতকায় শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষদের। মেক্সিকো থেকে মধ্য আমেরিকায়, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা হয়ে একেবারে পেরু পর্যন্ত তারা সেখানকার পৌরাণিক কাহিনী ও স্থাপত্যশিল্পে স্থায়ী আসন রেখে গেছে। ইনকাদের আসার আগে এই রহস্যময় সভ্যতা যেন যাদুদণ্ডের এক আঘাতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এখান থেকে এবং আবার হঠাৎ সেই সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল পশ্চিমের নির্জন দ্বীপপুঞ্জে—যেখানে এখন চলেছি আমরা। প্রাক সভ্যতার এই ভ্রাম্যমান মশাল-বাহকেরা কি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপার থেকে এসেছিল? সেই সুদূর অতীতে একদিন একই পদ্ধতিতে অতি সাধারণ ভাবে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ থেকে মেক্সিকো উপসাগরে এসেছিল কি তারা সমুদ্রের স্রোত ও অয়নবায়ুর আনুকুল্যের প্রসাদে ভেলায় ভাসতে ভাসতে? আমরা আজ যে-দূরত্ব অতিক্রম করতে চলেছি, তার তুলনায় সে-দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম। আমরা আর নিজেদের সমুদ্রে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পরিত্যক্ত কেউ-কেটা মনে করি না।

অনেক পর্যবেক্ষকের ধারণা আর তাদের ধারণার স্বপক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঝুড়ি ঝুড়ি কারণও আছে—মেক্সিকোর অ্যাজটেক্স থেকে পেরুর ইনকাদের মধ্যে যে মহান ভারতীয় সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল—তার মূলে বস্তুত পূবদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের হঠাৎ হঠাৎ আগমনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের সাধারণভাবে বলা যায় এশিয়ার পশু শিকারী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রায় কুড়ি হাজার বছর আগে তারা সাইবেরিয়া থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, মেক্সিকো পেরু পর্যন্ত একদা যে উচ্চ সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল, তার ক্রমবিস্তারের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি নেই। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যতই গভীরে খনন কার্য চালাচ্ছে, এদের শিক্ষাসংস্কৃতির উচ্চতর পরিচয়ও মিলছে—শেষ পর্যন্ত এমন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে পৌঁছান গেছে যা থেকে প্রমাণিত যে প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আদিম সংস্কৃতির কোন সংযোগ-সূত্রই ছিল না। তার ভিত্তি এখানে নয়—অন্যত্র।

সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মেরু ও অরণ্য অঞ্চলে—যেখানে প্রশান্তমহাসাগর পেরিয়ে সভ্যতার স্রোত এসে প্রথম ধাক্কা মেরেছিল। অথচ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই, অতীতে যেমন বর্তমান কালেও সভ্যতা বিকাশের পরিবেশ সবসময় অনুকূল ও সহজলভ্য।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও সেই একই সভ্যতার বিকাশ দেখা যায়। পেরুর নিকটতম দ্বীপ—ইস্টার দ্বীপ। দ্বীপটি জঙ্গলহীন শুষ্ক, মাটি অনুর্বর। প্রশান্তমহাসাগরের এশিয়া থেকে সুদূরতম দ্বীপ এটি। অথচ এখানেও সেই সভ্যতার বিকাশ পরিলক্ষিত।

আমাদের যাত্রা-পথের অর্ধেকটা অতিক্রান্ত। এই দূরত্ব পেরু থেকে ইস্টার দ্বীপের দূরত্বের সমান। রূপকথার দ্বীপটি আমাদের দক্ষিণে অবস্থিত। পেরুর উপকূল ভাগের মাঝামাঝি একটা জায়গা থেকে দৈবাৎ আমরা যাত্রা করেছি। ভেলা যাত্রীরাও সচরাচর এ রকম জায়গা থেকেই যাত্রা করত। আরও দক্ষিণে কন-টিকির ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী তিয়াহুয়ানাকো থেকে যদি যাত্রা করতাম, একই বাতাসের আনুকূল্য পেতাম কিন্তু সমুদ্রের স্রোতের ধারা এদিকে দুর্বলতর। এখানকার বাতাস ও স্রোত—দুই মিলে আমাদের ইস্টার দ্বীপের দিকেই নিয়ে যেত।

১০০° পশ্চিম অতিক্রম করতেই আমরা পলিনেশীয় সমুদ্র এলাকায় পড়ে গেলাম। আমাদের তুলনায় পলিনেশীয় ইস্টার দ্বীপ পেরুর অধিকতর কাছাকাছি। প্রাচীনতম দ্বীপ-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রথম ফাঁড়ির সঙ্গে এক রেখায় এসে গেছি আমরা। সূর্য আকাশ পথ থেকে নেমে সুদূর পশ্চিমে সমুদ্রে তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাত্রি আগত—ভাস্বর পথ ধরে চলেছি আমরা। মৃদুমন্দ অয়নবায়ু ইস্টার দ্বীপের অদ্ভুত রহস্যময় গল্পে প্রান সঞ্চার করে। নৈশ আকাশ সময়ের ধারণাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। আমরা বসে বসে গল্পে মশগুল হয়ে উঠি। পালের গায়ে শ্মশ্রুমণ্ডিত দানবদের মাথায় ছায়া নাচতে থাকে। কিন্তু তখন আরও সুদূর দক্ষিণে ইস্টার দ্বীপে পাথরে গড়া বৃহত্তর দানব মূর্তি—থুতনিতে শ্মশ্রু প্রলম্বিত শ্বেতকায়দের চেহারা নিয়ে সদর্পে দাঁড়িয়ে থাকে—যুগ যুগ সঞ্চিত রহস্যের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন।

১৭২২ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপীয়রা প্রথম এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে—সেদিনও তারা এই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ইতিমধ্যে বাইশটি পলিনেশীয় যুগ পেরিয়ে এসেছে। ইস্টার দ্বীপের প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়—বর্তমান অধিবাসীরা সেদিন বড় বড় ক্যানু চড়ে এই দ্বীপে অবতরণ করে দ্বীপের আদিবাসীদের সবংশে নিশ্চিহ্ন করে। এই আগন্তুকরা আরও পশ্চিম থেকে এই দ্বীপে এসেছিল। কিন্তু ইস্টার দ্বীপের প্রচলিত কাহিনী অনুসারে এরা নাকি সুদূর উদয়-ভানুর দেশ থেকে আগত। কিন্তু দক্ষিণ

আমেরিকা ছাড়া সেদিকে আর কোন দেশই নেই। অজ্ঞাত স্থানীয় স্থপতিদের অতীতে নির্মূল করায় ইস্টার দ্বীপের এই দানবীয় মূর্তিগুলো প্রাচীন কীর্তির অনির্ণেয় রহস্যের প্রতীক হয়ে আছে। এখানে-সেখানে বৃক্ষহীন দ্বীপের ঢালু দেশে বিরাট বিরাট মূর্তিগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই অপূর্ব অতিকায় মূর্তিগুলো পাথর খোদাই করে তৈরি। প্রতিটি চেহারা মানুষের। তিন চার তলা বাড়ির সমান উঁচু। একটিমাত্র পাথর কুঁদে তৈরি করা। কি ভাবে সেদিনের স্থপতিরা এই বিরাট বিরাট পাথরগুলো দূরতম স্থান থেকে এনেছিল, তাদের রূপ দিয়েছিল,—তার-পর তাদের যথাস্থানে দাঁড় করিয়েছিল? যেন এসব কোন সমস্যাই ছিল না তাদের কাছে। মাটি থেকে ছত্রিশ ফুট উঁচু অনেক মূর্তির মাথায় লাল পাথরের বিরাট পাগড়ির আকারের আলাদা গোল পাথর বসিয়েছিল ভারসাম্য বজায় রেখে। এসবের অর্থই বা কি? এই অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্থপতিদের কি ধরনের বিশেষ যান্ত্রিক জ্ঞান ছিল যার সাহায্যে এই সব দুরূহতম সমস্যার সমাধান করেছিল? অথচ আধুনিক কালের কুশলীতম যন্ত্রবিদেরাও একাজ করতে হিমসিম খাবে।

যদি এই সব টুকরো টুকরো ব্যাপার একত্র গ্রথিত করি, পেরুর ভেলাওয়ালাদের পটভূমিকায় দেখলে ইস্টার দ্বীপের রহস্য খুব সম্ভবত অনির্ণেয় নয়। প্রাচীন সভ্যতা এই দ্বীপে এমন অনেক চিহ্ন রেখে গেছে, সময়ের করাল দ্রংষ্ট্রা আজও তা ধ্বংস করতে পারে নি।

ইস্টার দ্বীপ একটি সুপ্রাচীন আগ্নেয়গিরির শীর্ষে অবস্থিত। প্রাচীন সভ্য নাগরিকরা যে ধাপ বাঁধানো রাস্তা তৈরি করেছিল, তা চলে গেছে একেবারে তটদেশের ধার পর্যন্ত—যেখান থেকে লোকে নৌকোয় ওঠা-নামা করে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, যে-দ্বীপের চারধারে জল-রেখা সেদিনও যেখানে ছিল, আজও সেখানেই আছে। কোন সলিল সমাধিপ্রাপ্ত দেশের অবশিষ্টাংশ এ নয়। এটি একটি ছোটখাট জনবসতিহীন পুরো দ্বীপ। শুধু ছোট আর জনবিরলই নয়, আজকের মতো অতীতেও সংস্কৃতির আবাসস্থল ছিল যার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নেই।

কীলকাকার দ্বীপটির পূর্ব কোণে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আর সেই জ্বালামুখের গহ্বরে রয়েছে ভাস্কর্য শিল্পীর অপূর্ব পাথরের খনি ও কারখানা। আজও ঠিক সেই অবস্থায় আছে—অতীতের শিল্পী ও ভাস্কররা যে-অবস্থায় রেখে গিয়েছিল শতাধিক বছর আগে, যখন তারা আততায়ীর আক্রমণে প্রাণভয়ে পালিয়ে ছিল দ্বীপের পূব দিকের শেষ প্রান্তে। দ্বীপের আদি অধিবাসী আর পলিনেশীয়দের মধ্যে সেদিন যে রক্তক্ষয়ী মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে জয়ী হয়েছিল পলিনেশীয়রা আর আদিবাসীদের আবালবৃদ্ধ জনতাকে হত্যা করে একটা খানায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

হঠাৎ শিল্পীদের কাজে বিঘ্ন ঘটায় ইস্টার দ্বীপের একটি কাজের দিনের ঘটে পূর্ণ ছেদ এবং তা থেকে কাজের দিনের স্পষ্ট আভাসও পাওয়া যায়। চকমকি পাথরের মতো শক্ত পাথরের কুঠারগুলো এলোমেলো এখানে-ওখানে কাজের জায়গায় ছড়ানো। এর থেকে প্রমাণিত হয় এই অগ্রসর জাতির লোকেরা কন-টিকির ভাস্করদের মতোই লোহার ব্যবহার জানত না। তারাও যখন পেরু থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারাও আণ্ডিজ উপত্যকায় ফেলে গিয়েছিল বিরাট বিরাট পাথরের মূর্তি। দু-জায়গাতেই পাথরের খনি দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে রূপকথার শ্বেতকায় শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষরা তিরিশ ফুটেরও বেশি দীর্ঘ পাথরের চাঁই কেটে এনেছে পাহাড়ের গা থেকে—পাথরের চেয়েও শক্ত পাথরের কুঠার দিয়ে। এই সব পাথরের চাঁইগুলোর ওজন অনেক অনেক মন। তাদের পাহাড় থেকে এবড়ো-খেবড়ো পথের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—তারপর তাদের যথাস্থানে খাড়া করে বসিয়ে অতিকায় মানুষের মূর্তি গড়া হয়েছে, অথবা একটা চাঁইয়ের উপর আর একটা চাঁই বসিয়ে রহস্যময় দেয়াল ও ভবনশ্রেণী নির্মাণ করেছে তারা।

যেখানে কাজ শুরু করেছিল সেখানে অনেক মূর্তি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আজও পড়ে আছে ইস্টার দ্বীপের জ্বালামুখের দেয়ালের কুলঙ্গীতে। এসব দেখে বোঝা যায়, কি ভাবে বিভিন্ন স্তরে কাজ হত। ভাস্কররা যখন প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, তখন যে বৃহত্তম মানুষের মর্তিটি প্রায় শেষ করে এনেছিল, তার দৈর্ঘ্য হবে ছেষট্টি ফুট। মূর্তিটিকে শেষ করে যদি যথা স্থানে বসিয়ে দিতে পারত, এই বিপুলাকায় দানবের মাথাটা আটতলা উঁচু সৌধের মাথায় এসে ঠেকত। প্রত্যেকটা মূর্তি এক একটি পাথর কুঁদে গড়া। ভাস্করদের কাজের জায়গায় যে-সব মূর্তি শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেছে, তা দেখে বোঝা যায় অনেক লোক একত্রিত হয়ে কোন একটি মূর্তি গড়েনি। প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিভিন্ন লোকের একক কাজ। দক্ষিণ আমেরিকার পাথরের মূর্তি-গুলোর মতোই ইস্টার দ্বীপের মূর্তি দেয়াল-গাত্রে শায়িত অবস্থায় থাকে—হাত দুটো বাঁকিয়ে পেটের উপর বিন্যস্ত অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি খুঁটিনাটি অংশ সম্পূর্ণ হলে কর্মশালা থেকে দ্বীপের চারদিকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হত তাদের। শেষ অবস্থায় পাহাড়ের কুলঙ্গিতে পাথরের গায়ে একটা সরু শিরার সঙ্গে যুক্ত থাকে মূর্তিটা। তারপর সেই শিরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মূর্তিটাকে চারপাশে গণ্ডশৈল স্থাপনা করে খাড়া করে রাখা হত যাতে না পড়ে যায়।

এইসব মূর্তিগুলো পাহাড়েব সানুদেশে বহন করে নিয়ে এসে বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখা হত। বেশ কিছু বৃহত্তম মূর্তি জ্বালামুখের দেয়ালের উপর দিয়ে পরিবাহিত করে, এবড়ো-খেবড়ো স্থানের উপর দিয়ে বহু মাইল দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর বিভিন্ন পাথরের বেদীর উপর বসানোর পর বাকি

থাকত মূর্তিগুলোর মাথার উপর লাল পাথরের পাগড়ির আকারের গোলাকার চাঁই স্থাপনা করা। পরিবহন-পদ্ধতি রহস্যময় ঠেকলেও একথা অস্বীকার করার তো উপায় নেই যে তাদের স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভাস্কররা যারা পলায়ন করেছিল, আণ্ডিজ পর্বতমালায় সম আকারের অনেক পাথরের মূর্তি ফেলে গিয়েছিল তারা। সবকিছু দেখে মনে হয় তারা নিপুন শিল্পী ছিল।

ইস্টার দ্বীপের একশিলা স্তম্ভ ও মূর্তিগুলো বিপুলকারে, সংখ্যায় অগুণিত ও ভাস্কর-দের একটা নিজস্ব শিল্পপ্রতিভা ছিল—এসত্য স্বীকার করে নিলেও সেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সভ্যতার ফসল প্রতিভাধর মানুষেরাই আমেরিকার সন্নিকটস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে দৈত্যাকৃতি মূর্তিগুলো গড়েছিল। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একশিলা মূর্তিগুলো কর্মশালা থেকে দূর-দূর স্থানে নীত হয়েছে। মারকুয়েসাসে আমি গুজব শুনেছি সেখানকার লোকের মুখে—বিরাট বিরাট স্তম্ভ কিভাবে দূর-দূর স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং টঙ্গাটাবুর বিরাট তোরণের উপর বসান হয়েছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে একই লোকেরা একই পদ্ধতিতে ইস্টার দ্বীপের মূর্তিগুলোও গড়েছে ও স্থানান্তরে নিয়ে গেছে।

খাদের মধ্যে ভাস্কর্যের কাজ শেষ করতে দীর্ঘ সময় লাগত কিন্তু কুশলী শিল্পীর সংখ্যা সীমিত ছিল। একটা মূর্তি গড়ার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুত শেষ করে ফেলা হত। একাজে লোক লাগত অনেক। সে-যুগে ইস্টার দ্বীপে মাছ পাওয়া যেত প্রচুর—পেরুর লাল আলুর চাষও হত বিশেষ ভাবে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস—দ্বীপের প্রাচুর্যের দিনগুলোতে সাত থেকে আট হাজার লোক সেখানে খেয়ে-পরে সুখে দিনগুজরাণ করতে পারত। হাজার লোকের পক্ষে সেই ভারী ভারী মূর্তিগুলো কুলঙ্গি থেকে বের করে খাড়া জ্বালামুখের দেয়ালের উপর দিয়ে বাইরে টেনে নিয়ে আসা এমন কিছু কঠিন ব্যাপারই নয় আর দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে পাচশ লোকই যথেষ্ট।

লেবু জাতীয় ফলের বাকল ও উদ্ভিদের আঁশ দিয়ে বিনুনী পাকিয়ে এমন শক্ত দড়ি তৈরি করা হত, যা ঘষটানিতে ছিঁড়ে যেত না। কাঠের বাক্সে মূর্তিগুলো শুইয়ে বাক্সগুলোকে টারোর মূল চটকে পিচ্ছল করে নেওয়া ছোট ছোট গণ্ডশৈল ও লম্বা লম্বা কাঠের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। সেই প্রাচীন সভ্য মানুষরা দড়ি কাছি বুনতে যে সুদক্ষ ছিল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে পেরু পর্যন্ত প্রত্যেকেই তা জানত। ইউরোপীয়রা যখন এই সব জায়গায় প্রথম পদার্পন করে তারা শতাধিক গজ প্রশস্ত বেগবতী জলধারা ও পাহাড়ের খাদের উপর কত ঝুলন্ত দড়ির সেতু দেখেছে। মানুষের কোমরের সমান পুরু বিনুনী-করা দড়ির সেতু।

পাথরের অতিকায় মূর্তিগুলো যথাস্থানে পেঁছলে তাদের দাঁড় করানো আর-এক

সমস্যা হয়ে দেখা দিত। পাথর ও বালি দিয়ে একটা ঢাল তৈরি করা হত প্রথমে —যেদিকটা কম খাড়া সেদিক দিয়ে পা ধরে মূর্তিটাকে টেনে তোলা হত তার উপর —মূর্তিটা চূড়োয় পৌছলে খাড়া ধারের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে মূর্তিটা নিচে নামিয়ে দেওয়া হত। পা দুটো সদ্য খোঁড়া একটা গর্তে ঢুকে যেত। সেই হেলান সমতল তখনও থাকে দৈত্যাকায় মূর্তির পিছনে ঠেকনো হিসেবে। একটা বাড়তি বেলনাকার পাথর মূর্তির মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে অস্থায়ী পাথরের হেলানো সমতলটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এই ধরনের ঢালু সমতল ইস্টার দ্বীপের অনেক জায়গায় তৈরি অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে বিরাট বিরাট মূর্তির অপেক্ষায়—যে-মূর্তি আর আসেনি কোনদিন। প্রযুক্তি-কৌশল সত্যিই প্রশংসার্হ। প্রাচীন যুগের মানুষদের বুদ্ধিবৃত্তি লঘু করে না দেখলে এর মধ্যে রহস্যের কারিকুরি কিছুই নেই। তাছাড়া তখন সময় ও লোকবলের কোনই অভাব ছিল না।

কিন্তু কেন তারা এই অতিকায় মূর্তি তৈরি করেছিল? কেনই বা তারা জ্বালামুখ থেকে চার মাইল দূরে আর একটা পাথরের খনিতে যেত লাল পাথরের সন্ধানে, যা ঐ মূর্তিগুলোর মাথায় চাপান হত? দক্ষিণ আমেরিকা ও মারকুয়েসাস দ্বীপের মূর্তিগুলো সবই এই লাল পাথরের—সেখানকার অধিবাসীদের বহু দূর-দূর প্রান্তে যেত হত পাথরের খোঁজে। পলিনেশিয়া ও পেরুতে এই লাল পাথেরের উষ্ণীষ শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য ছিল।

এবার দেখা যাক—এই মূর্তিগুলো কাদের? এই দ্বীপে প্রথম ইউরোপীররা যারা এসেছিল, তারা সমুদ্রের তটদেশে রহস্যময় শ্বেতকায় মানুষ দেখেছিল। কিন্তু এই ধরনের লোকদের পক্ষে যা স্বাভাবিক, দীপবাসীদের মধ্যে তার একটু বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছিল। দেখেছিল অনেকের মুখেই ঢেউ খেলান প্রলম্বিত দীর্ঘ দাড়ি। যারা রক্ষা পেয়েছিল, প্রথম দ্বীপবাসীদের পরবর্তী বংশধর এরা। অনেকেই জানাল তাদের পূর্ব-পুরুষদের গায়ের রঙ সাদাই ছিল, আবার কারুর কারুর গায়ের রঙ বাদামীও দেখা যেত। তারা হিসেব করে দেখাল, বাইশ যুগ আগে শেষের দল অন্যত্র কোথাও থেকে পলিনেশিয়ায় এসেছিল। কিন্তু প্রথম যারা এই দ্বীপে এসেছিল বড় বড় নৌ যানে চেপে, সে প্রায় সাতান্ন যুগ আগে। পূর্ব থেকে যারা এসেছিল, তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল লম্বকর্ণ। তারা কৃত্রিম উপায়ে তাদের কান লম্বা করত, কানের লেতির সঙ্গে ভারী কিছু ঝুলিয়ে। সেগুলো প্রায় কাঁধ স্পর্শ করত। এই রহস্যময় লম্বকর্ণরা নিহত ও নিশ্চিহ্ন হয়, যখন খর্বকর্ণরা দ্বীপ আক্রমণ করে। ইস্টার দ্বীপের সব প্রস্তর মূর্তির কান ঝুলে একেবারে কাঁধে এসে ঠেকেছে—ভাস্কররা নিজেরাই তো ছিল লম্ব কর্ণ।

পেরুতে ইনকাদের যেসব লোক-কাহিনী প্রচলিত, তা থেকে জানা যায় সূর্য-

দেবতা কন-টিকি যে শ্মশ্রুমণ্ডিত শ্বেতকায়দের উপর রাজত্ব করতেন, তাদের ইনকারা বলত লম্বকর্ণ। কারণ তাদের কানকে কৃত্রিম উপায়ে লম্বা করা হত—কানের লেতি এসে ঠেকত একেবারে কাঁধ পর্যন্ত। ইনকারা জোর দিয়ে বলেছে কন-টিকির লম্বা কর্ণ প্রজারাই আণ্ডিজ পর্বতমালার পরিত্যক্ত দৈত্যকায় মূর্তিগুলো গড়েছে। পরে এরা আক্রান্ত, বিতাড়িত বা নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে ইনকাদের হাতে। লেক টিটিকাকার একটি দ্বীপে এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এক কথায়ঃ কন-টিকির শ্বেতকায় লম্বকর্ণরা পেরু থেকে পালিয়ে যায় পশ্চিম দিকে—তাদের বিরাট বিরাট মূর্তি গড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে। টিকির লম্বকর্ণরা ইস্টার দ্বীপে এসেছিল পূব থেকে। এই ভাস্কর্যে তাদেরও কুশলতা অনস্বীকার্য। তারা এসেই এই শিল্প কর্মে সমগ্র প্রাণমন ঢেলে লেগে যায়। সেরা শিল্প সৃষ্টি করতে ক্রমোন্নতির যে প্রয়াস প্রয়োজন, তার ন্যূনতম চিহ্নও পাওয়া যায় না ইস্টার দ্বীপে।

দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে যে সব মূর্তি দেখা যায় তাদের মধ্যে আকৃতিগত যথেষ্ট মিল লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে যে একশিলা স্তম্ভ আছে তাদের পরস্পরের মধ্যে এই ঐক্য তত প্রকটিত নয়। মার-কুয়েসাস দ্বীপ ও তাহিতিতে যেসব মূর্তি দেখা যায় তাদের গোষ্ঠী হিসেবে টিকি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এরাই এই দ্বীপের পূর্বপুরুষ হিসেবে সম্মানিত এবং মৃত্যুর পর দেবত্বে উন্নীত। ইস্টার দ্বীপের মূর্তিগুলোর মাথায় কেন লাল পাথরের উষ্ণীষ বসানো—তার রহস্যও এর মধ্যে নিহিত। ইউরোপীয় অভিযানে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এমন বহু মানুষের ও পরিবারের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের চুল লাল—গায়ের রঙ সাদা। দ্বীপবাসীদের স্বীকৃতি অনুসারে যারা এই দ্বীপে প্রথম অবতরণ করেছিল, এগুলো তাদের মূর্তি। কোন কোন দ্বীপে বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় লোকেরা মূর্তির গায়ে রং মেখে সাদা করে ফেলে, মাথার চুল রঞ্জিত হয় লাল রঙে। এসবই পূর্বপুরুষদের অনুকরণে। ইস্টার দ্বীপে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে উৎসবের প্রধান প্রবক্তা মাথার চুল কেটে লাল রঙে রঞ্জিত করে। দ্বীপের অতিকায় মূর্তির লাল উষ্ণীষের পাথর এমনভাবে খোদাই করা—যা স্থানীয় জনসাধারণের কেশ রচনার অনুরূপ। মাথার উপর গোলাকার খোঁপা, যেমন মানুষের মাথার চুল বেণীবদ্ধ করে মাথার পিছনে খোঁপার আকারে স্থাপনা করা হয়।

ইস্টার দ্বীপের মূর্তিগুলোরও কান লম্বা। কারণ ভাস্কররা নিজেরাই লম্বকর্ণের অধিকারী ছিল। বিশেষ লাল বর্ণের পাথর বাছাই করে তারা মূর্তির মাথায় বসিয়েছিল উষ্ণীষের আকারে—কারণ শিল্পীদের চুলও লাল! মুখের থুতনি ছুঁচালো ও একটু প্রলম্বিত। কারণ শিল্পীরা দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত ছিল। শ্বেতকায়দের মুখাকৃতিগত বিন্যাস অনুযায়ী মূর্তিদেরও ছিল তীক্ষ্ণ নাক, সরু ঠোঁট। কারণ ভাস্কররা তো ইন্দোনেশীয়

গোষ্ঠীভুক্ত লোক নয়। মূর্তিগুলোর মাথা বিরাট আকারের কিন্তু সেই তুলনায় পা অপেক্ষাকৃত ছোট। হাত দুটো পেটের উপর বিন্যস্ত। দক্ষিণ আমেরিকায় এই ধরনের মূর্তি গড়ার রেওয়াজ ছিল সে-যুগে। আর প্রত্যেকটি মূর্তির কোমরে থাকত একটি কোমর-বন্ধনী। এটাও একটা বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণ। লেক টিটিকাকায় কন-টিকির রাজ্যের যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেখানে প্রতিটি মূর্তির কোমরে এই প্রতীক কোমর-বন্ধনী দেখা যায়। সূর্য-দেবতার রামধনু কোমর-বন্ধনীর প্রতীক চিহ্ন। মান গেরেভা দ্বীপে একটি প্রবাদ প্রচলিত—সূর্য-দেবতা এই রহস্যময় কটি-বন্ধ কোমর থেকে খুলে ফেলেছিলেন—পরে কটি-বন্ধ বেয়েই মানগেরেভা দ্বীপে অবতরণ করেছিলেন তাঁর শ্বেতকায় সন্তান সন্ততিদের নিয়ে। পেরুর মতো এই সব দ্বীপেও সূর্যকেই তাদের আদি পুরুষ হিসেবে কল্পনা করা হয়।

নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে ভেলার পাটাতনের উপর বসে আমরা ইস্টার দ্বীপের এইসব অদ্ভুত ঐতিহাসিক উপকথা নিয়ে আলোচনা করতাম। পলিনেশিয়ার গভীর অন্তঃপুরে স্থির লক্ষ্যের দিকে আমাদের নিয়ে চলেছে বালসা-ভেলা। এরপর মানচিত্রে নামছাড়া ইস্টার দ্বীপের কোন চিহ্নই আর দেখতে পাব না। পূব দেশাগতদের এত স্মারক-চিহ্ন ইস্টার দ্বীপের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে ঐ নামের মধ্যেই তার ইংগিত মিলবে।

মানচিত্রে ইস্টারদ্বীপ স্থান পেয়েছে—কারণ জনৈক ওলন্দাজ ইস্টার সানডেতে দৈবাৎ ঐ দ্বীপটি 'আবিষ্কার' করেছিল। আমরা ভুলেই গেছি, দ্বীপবাসীরা অর্থাৎ যারা ঐ দ্বীপে বাস করত, তাদের বাড়িঘরদোরের নাম করণের মধ্যেই অনেক অর্থবহ ইংগিত লুকানো আছে। এই দ্বীপের কম করেও তিনটি নাম পলিনেশিয়ায় প্রচলিত।

একটা সুপ্রচলিত নাম হল টি-পিটো-টি-হেনুয়া—যার অর্থ হল 'দ্বীপেরও নাভি-কুণ্ড'। এই কাব্যিক নামটির জন্য, আরও পশ্চিম দিকের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ইস্টার দ্বীপ একটা বিশেষ মর্যাদার স্থান পেয়েছে! দ্বীপের পূর্বউপকূলে 'লম্বকর্ণরা' যেখানে প্রথম অবতরণ করেছিল, সেই ঐতিহ্যিক অবতরণ-ক্ষেত্রে খুব সতর্কভাবে নির্মিত একটি পাথর আছে, যাকে বলা হয় 'সোনালী নাভি-কুণ্ড'। আর এটাই ইস্টার দ্বীপের নাভি-কুণ্ড হিসেবে বিবেচিত। কাব্যিক গুণান্বিত পলিনেশীয়রা পূর্বদিকে পেরুর সব থেকে কাছাকাছি এই দ্বীপে নাভি-কুণ্ডটি নির্মাণ করেছিল যা তাদের পশ্চিম দিকের দ্বীপাবলির নাভি-চক্র রূপে পরিগণিত—কাজেই এর একটা প্রতীক অর্থ আছে। আমরা তো জানি পলিনেশীয়রা এই দ্বীপের আবিষ্কারকে 'দ্বীপের জন্ম' হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। কাজেই সব দ্বীপের মধ্যে ইস্টার দ্বীপকে তাদের দ্বীপের নাভি-কুণ্ড হিসেবে গণ্য করবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। এটাই তো ওদের মাতৃভূমির সঙ্গে একমাত্র সংযোগ-সূত্র।

ইস্টার দ্বীপের দ্বিতীয় নাম হল রাপানুই—যার অর্থ হল বড় 'রাপা' আর 'রাপা-

ইটি' হল ছোট রাপা। এই দ্বীপটি ইস্টার দ্বীপ থেকে বহুদূরে পশ্চিমে অবস্থিত, আর আকারে সমগোত্রও। কাজেই এটাই সাধারণ নিয়ম যে প্রথম আবিষ্কারকে সব থেকে বড় বলা আর পরবর্তীদের 'নতুন' বা 'ছোট' বলা—এমন কি আকারে সমান সমান হলেও। ছোটরাপার অধিবাসীরা আজও এ ঐতিহ্য বহন করে আসছে যে তাদের পূর্বপুরুষরা বড়রাপা অর্থাৎ পূবের ইস্টার দ্বীপ থেকে আগত, আর ইস্টার দ্বীপের জীবন-যাপন প্রণালী আজও ধরে রেখেছে তারা তাদের জীবনে। ইস্টার দ্বীপ আমেরিকার সব থেকে কাছে—কাজেই পূব থেকেই বহিরাগতরা যে এসেছিল তারাও প্রমাণ পাওয়া যায় এর থেকে।

প্রধান দ্বীপ অর্থাৎ ইস্টার দ্বীপের তৃতীয় ও শেষ নাম হল 'মাটা-কাইট-রাণী' অর্থাৎ 'স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ চোখ'। প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর মনে হয়। কারণ ইস্টার দ্বীপ অন্যান্য উঁচু দ্বীপ অর্থাৎ তাহিতি, মারকুয়েসাস, হাওয়াই-এর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিচু। কাজেই এদের তুলনায় ইস্টারদ্বীপ আকাশমুখী হতে পারে না। কিন্তু 'রাণী' অর্থাৎ স্বর্গ পলিনেশীয়দের কাছে দ্বৈত অর্থের প্রতীক। এটা তাদের পূর্ব পুরুষদের মাতৃভূমি—সূর্যদেবতার পবিত্র আবাসভূমি, টিকির পরিত্যক্ত পার্বত্য-সাম্রাজ্য। কাজেই সমুদ্রের হাজার হাজার দ্বীপের মধ্যে সব থেকে পূবের দ্বীপটিকে 'স্বর্গের দিকে প্রসারিত চক্ষু' বলে যে অভিহিত করা হয়েছে—তা খুবই অর্থবহ। আরও মজার ব্যাপার হল—পলিনেশিয়ায় 'মাটা-রাণী' কথাটার সমার্থক শব্দ হল 'স্বর্গের চোখ'। এটা পেরুর একটা জায়গার নাম। ইস্টার দ্বীপের বিপরীত দিকে পেরুর প্রশান্তমহাসাগরীয় উপকূলের একটি বিশিষ্ট স্থান। আণ্ডিজের কন-টিকির বিধ্বংস নগরীর পদপ্রান্তে অবস্থিত স্থানটি।

ইস্টার দ্বীপের রোমাঞ্চের নানা ব্যাপারের আলোচনায় আমরা আবিষ্ট হয়ে পড়লাম। তারাভরা আকাশ মাথার উপরে। সেদিনের প্রাগৈতিহাসিক অভিযানের আমরাও যে সহযোগী ছিলাম। টিকির পর থেকে আমরাও যেন একান্ত ভাবে সূর্য ও তারকা-খচিত আকাশের নিচে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি ডাঙার সন্ধানে।

সমুদ্র ও তরঙ্গের প্রতি আমাদের সব ভয়ভাবনা ঘুচে গেছে আর সে-শ্রদ্ধা নেই সমুদ্রের ও তরঙ্গের বিভীষিকার প্রতি। ভেলার সঙ্গে সমুদ্রের কি সম্পর্ক জেনে গেছি আমরা। এমন কি হাঙররা পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন দোসর হয়ে পড়েছে। আমাদের সম্বন্ধে তাদের প্রতিক্রিয়াও জানি আমরা। হাত-হারপুনের আর প্রয়োজন হয় না। এমন কি আমরা যখন ভেলার কিনারায় বসে থাকি, কোন হাঙর ভেলার ধার ঘেঁষে এলেও সরে বসি না। বরং ওরা যখন ধার ঘেঁষে যায় আমরা অনেক সময় হাত বাড়িয়ে ওদের লেজ ধরতে চেষ্টা করি। এ যেন শেষ পর্যন্ত একটা মজাদার খেলায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

বেশ হালকা ভাবেই শুরু করেছিলাম আমরা। যতটা খেতে পারি তার চেয়ে বেশি ডলফিন ধরতাম খুব সহজেই। খাবার যাতে বৃথা অপচয় না হয় এবং বেশ আমোদ আহরণ করা যায়—নিছক সেই উদ্দেশেই বঁড়শি ছাড়াই সুতোয় টোপ বেঁধে জলে ছুঁড়ে দিতাম। উড়ুক্কু মাছ সুতোয় বেঁধে জলে ফেলে টেনে আনতাম। দেখা মাত্র লাফিয়ে এসে গপ করে গিলে ফেলত উড়ুক্কু মাছ। এইভাবে দু জনকেই টেনে আনতাম ভেলার কাছে। শুরু হয়ে যেত সার্কাসের খেলা। যদি একটা ডলফিন রণেভঙ্গ দিত খেলায় আর একটা ডলফিন ছুটে আসত। আমরা খুব আমোদ পেতাম এ খেলায়। অবশ্য ডলফিনরাই শেষ পর্যন্ত পেয়ে যেত মাছটা।

এরপর হাঙ্গরদের নিয়েও একই ধরনের খেলার পুনরাভিনয় করলাম। ছিপের সুতোর শেষপ্রান্তে হয় একটুকরো মাছ থাকত—নয়ত প্রায়ই পুঁটলিতে বাঁধা নানা খাবারের ঝটতি-পড়তি। তুণ্ড জলের উপর তুলে ছুটে আসত হাঙ্গর মুখ হাঁ করে খাবারটা মুখে চালান করে দিতে। চোয়ালের কপাট বন্ধ করার আগেই টুক করে টোপটা টেনে বের করে নিতাম মুখ থেকে। হত চকিত প্রাণীটা অবর্ণনীয় নির্বোধের মতো সাঁতরে ছুটে আসত টোপটা ধরবার জন্য—মুখ হাঁ করত। যতবারই টোপটা ধরবার জন্য হাঁ করত, আমরা সরিয়ে নিতাম টোপটা তার নাগালের বাইরে। শেষ পর্যন্ত হাঙ্গরটা ছুটে আসত একেবারে ভেলার কাছে—লাফিয়ে উঠত জল থেকে নাকের কাছে নৃত্যপরা টোপটা ধরতে। অনেকটা ভিক্ষার্থী কুকুরের মতো। চিড়িয়াখানায় হিপোপটেমাসকে খাওয়ানোর বিচিত্র খেলার মতো। ভেলায় চড়ার তিনমাস পরে ডাইআরিতে নিচের এই ঘটনাটা লিখেছিলাম:

আজ যে-হাঙ্গরটা আমাদের অনুসরণ করেছিল তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। দুপুরে খাওয়ার পর টুকিটাকি যা পড়েছিল, সব হাঙ্গরটার হাঁ-করা মুখের ভিতর ঢেলে দিলাম। কিছুটা ভয়ঙ্কর, কিছুটা খোশ মেজাজী, কিছুটা বা বন্ধুভাবাপন্ন কুকুরের মতো আমাদের ভেলার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল হাঙ্গরটা। যতক্ষণ না আমরা ওদের মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছি ওদের হালচাল বেশ খোশ মেজাজীই। একমাত্র স্নানের সময় ছাড়া ওদের আশেপাশে দেখলে খুশিই হই। . . .

একদিন একটা বাঁশের ছিপ নিলাম। ছিপের সুতোর সঙ্গে বেঁধে দিলাম এক পুঁটলি হাঙ্গরের খাবার। ভেলার পাশেই রেখেছি ছিপ ফেলার আগে। এখন একটা ঢেউ এসে ছিপও খাবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বাঁশের ছিপটা ভাসতে ভাসতে ভেলার পিছন দিকে কয়েকশ গজ দূরে চলে গেছে। হঠাৎ ছিপটা জলের মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—তারপর তীর বেগে ছুটে আসতে লাগল ভেলার পিছু পিছু। আগে যেখানে যেভাবে ছিল, ঠিক সেইভাবে সেখানে থাকাই যেন উদ্দেশ্য। ছিপটা যখন দুলতে দুলতে ভেলার পাশে এসে পৌছল, দেখতে পেলাম একটা দশ ফুট লম্বা হাঙ্গর

জলের তলা দিয়ে সাঁতরে চলেছে। হাঙ্গরটা খাবারের থলিটা গিলে ফেলেছে কিন্তু সুতোটা কেটে ফেলেনি। ছিপটা আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রমশঃ হাঙ্গরদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলেও ওদের মুখের ভিতরে তীক্ষ্ণ ক্ষুরের মতো ধারাল যে পাঁচ ছ' সারি দাঁত ওত পেতে আছে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন নুটকে একটা হাঙ্গরের সঙ্গে সাঁতার কাটতে হয়েছিল। কাউকেই সাঁতার কাটতে কাটতে ভেলার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত না। দুটো কারণ আছে তার। এক স্রোতের টানে ভেলা থেকে দূরে সরে যেত পারে। আর সমুদ্র হাঙ্গর অধ্যুষিত বলে। কিন্তু একদিন সমুদ্রকে অস্বাভাবিক শান্ত দেখা গেল আর হাঙ্গররা যারা আমাদের অনুসরণ করছিল, তাদের ভেলার পাটাতনের উপর তুলে ফেলা হয়েছে। কাজেই ঝটপট সমুদ্রে ডুব দিয়ে নেবার অনুমতি দেওয়া হল। নুট জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ডুবে অনেক দূরে চলে যিয়েছিল। মাস্তুলের উপর থেকে দেখতে পেলাম নুটের চেয়ে আকারে বড় একটা কালো ছায়া জলের তলা দিয়ে তার দিকে ভেসে আসছে। যাতে না ঘাবড়ে যায় তাই আমরা খুব একটা হৈ-চৈ না লাগিয়ে তাকে সাবধান করে দিলাম। নুট ভেলার পাশে এসে ভুস করে ভেসে উঠল জলের উপর। কিন্তু যে-ছায়াটা দেখেছিলাম সেটা তার চেয়ে ঢের বেশি দ্রুতগামী। একই সময়ে তারা দু জনে ভেলার পাশে এসে উপস্থিত হল। নুট যখন ভেলার উপর উঠছিল ছ-ফুট লম্বা একটা হাঙ্গর তার পেটের তলা দিয়ে একেবারে ভেলার পাশে এসে থামল। নুটকে না-কামড়ানোর জন্য হাঙ্গরটাকে একটা ডলফিনের মাথা উপহার দিলাম।

সাধারণত দেখার বদলে গন্ধই হাঙ্গরদের লোভের উদ্রেক করে সব থেকে বেশি। আমরা জলে পা ডুবিয়ে পরীক্ষা করেছি। তারা সাঁতরে চলে আসে আমাদের কাছে—তারপর নিঃশব্দে লেজ দুলিয়ে কেটে পড়ে। কিন্তু জলে যদি এক ফোঁটা রক্ত পড়ে—এই যখন আমরা কাটা মাছ জলে ধুই—হাঙ্গরের পাখনা অমনি সজীব হয়ে ওঠে। বেশ দূর দূর থেকে নীল বোতলের মতো হাঙ্গররা সেখানে জমায়েত হতে থাকে। আমরা যদি হাঙ্গরের নাড়ীভুঁড়ি জলে ছুঁড়ে দেই তারা যেন পাগল হয়ে ওঠে—উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে সেদিকে ধাবিত হয়। তারা স্বজাতির নাড়ীভুঁড়িও হিংস্রের মতো গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে। এই সময় আমরা যদি জলে পা ডোবাই হাঙ্গররা রকেটের মতো তেড়ে এসে যেখানে পাটা ঝোলান ছিল, সেখানের কাঠের গায়ে দাঁত বসিয়ে দেবে। হাঙ্গরের মেজাজ ভীষণ পরিবর্তনশীল। নিজেদের আবেগের দয়ার উপর একান্ত নির্ভর করে তারা।

হাঙরদের সঙ্গে আমাদের শেষ যে-সংঘর্ষ হয়েছিল, তা হল ওদের লেজ নিয়ে টানাটানি করার ব্যাপারে। প্রাণিজগতে লেজ ধরে টানাটানি করা সব থেকে ঘৃণ্য পর্যায়ের খেলা বলে বিবেচিত। হয়ত সত্যি! কিন্তু কেউ তো এ পর্যন্ত হাঙরের লেজ টেনে দেখেনি। সত্যি কথা বলতে কি এটা একটা বেশ আমুদে খেলা।

হাঙরের পুচ্ছ ধরবার আগে তাকে আমরা টুকিটাকি কিছু খেতে দেই। খাবার খেতে ওরা মুখটা জলের উপরে বাড়িয়ে দেয়। সাধারণত খাবারটা একটা পুঁটলিতে বেঁধে ওদের মুখের সামনে নাচাতে থাকি। সোজাসুজি হাতে করে মুখে খাবার পুরে দেওয়া খুব একটা মজার খেলা হয় না। পোষা কুকুর বা ভাল্লুককে এভাবে খাবার খাওয়াতে গেলে কুকুর বা ভাল্লুক দাঁত দিয়ে মাংস কামড়ে ধরে। টেনে ছিঁড়ে খাবারটা মুখে পুরে দেয়। এইভাবে চলে যতক্ষণ না সবটা খাবার শেষ হয়। কিন্তু একটা বড় ডলফিনের মাথাটা হাঙরের মুখের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে ধরে রাখলে হাঙর ছুটে এসে খপ করে মাথার খানিকটা মুখে পূরে কুচ করে কেটে নেয়—টানাটানির কোন সুযোগই পাওয়া যায় না। হঠাৎ দেখা যায় হাতে ধরা ডলফিনের অর্ধেকটা মাথা উবে গেছে—বাকিটা শুধু পড়ে আছে হাতে। দেখেছি ডলফিনের মাথা ছুরি দিয়ে দু-ভাগ করা বেশ কঠিন, অথচ পলকের মধ্যে হাঙর ত্রিভুজাকার করাতের মতো দাঁত দিয়ে করাতটানা করে মাথার পিছনের অংশটা কুচ করে কেটে নেয় হাড়গোড় সব সুদ্ধ।

খাওয়া সাঙ্গ করে হাঙররা যখন নিঃশব্দে কেটে পড়ে, যাওয়ার সময় পিছনের লেজটা জলের উপরে তুলে নাচিয়ে টুপ করে ডুবে যায়। এই সময় লেজ পাকড়ানো কিছুমাত্র কঠিন নয়। হাঙরের চামড়া শিরীষ কাগজের মতো খসখসে। তাছাড়া লেজের অগ্রভাগ খাঁজকাটা বলে ধরার পক্ষেও বেশ সুবিধে। একবার শক্ত করে ধরতে পারলে হাতের মুঠি থেকে ফসকে পালানো খুবই কঠিন। নিজেকে সামলে নেবার আগেই হাঙরটাকে কষে ঝাঁকুনি লাগাই—যতটা পারা যায় লেজের অংশ ভেলার উপর টেনে তুলি। দু-এক মুহূর্ত হাঙরটা বুঝতেই পারে না কি হয়েছে। তারপর শুরু হয় গা মোচড়ানো—লড়ালড়ি। কিন্তু উত্তেজনার লেশ মাত্র থাকে না। লেজের সহায়তা ছাড়া হাঙর গতিবেগ পায় না। হাঙরের অন্য পাখনাগুলো জলে ভারসাম্য বজায় রাখতে, গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে মাত্র। কয়েকবার মরিয়া হয়ে গা ঝাড়া দেয়। এই সময় বেশ শক্ত করে লেজটা চেপে ধরতে হয়। হাঙরটা কেমন যেন নিরাশ ও উদাস হয়ে পড়ে।

হাঙরটা শান্তশিষ্ট হয়ে যায়—আর কি ঘটবে, পরবর্তী অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। সবশক্তি প্রয়োগ করে হাঙরটাকে তখন ভেলার উপর টেনে তোলা কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়। ভারী দেহের অর্ধেকটা ভেলার উপর টেনে তুলেছি,

সেই সময় দেখে মনে হবে এই বুঝি ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ভীষনভাবে গা নাড়া দিয়ে মাথাটা জল থেকে তুলে ভেলার উপর নিয়ে আসে। আমরাও তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চেষ্টা করি, যাতে না ও আমাদের পা কামড়ে ধরতে পারে। এখন আর হাঙরটার খুশ মেজাজ নেই। ভীষণভাবে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে কেবিনের দেয়ালের গায়ে—লেজটাকে ব্যবহার করে কামারের হাতুড়ির মতো। এবার ইস্পাতের মতো মাংসপেশী অলস বসে নেই। বিরাট মুখ ব্যাদন করে সামনে যা পাচ্ছে তাই কামড়ে ধরছে। হয়ত ঘটনাটা এ রকমও দাঁড়ায়—আছাড়ি-পিছাড়ি করতে করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাঙরটা ভেলার পাটাতন থেকে ছিটকে পড়ে জলে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় এই লজ্জাকর হেনস্থার পর। বেশিরভাগ সময় হাঙরটা পাটাতনের উপর দাপাদাপি করতে করতে ভেলার গোড়ার দিকে চলে যায়। আমরা হয়ত ততক্ষণে লেজের মধ্যে একটা ফাঁস গলিয়ে দিয়ে বেঁধে ফেলি তাকে, অথবা হিংস্র দাঁত কডমড়ানি বন্ধ হয়ে যায়।

ভেলার উপর হাঙর দেখলে তোতাপাখিটা ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়ত। সেও উড়ে বেরিয়ে আসত বাঁশের কেবিনের ভিতর থেকে। তাড়াতাড়ি কেবিনের তাল-পাতার চালে একটা নিরাপদ আসনে আশ্রয় নিয়ে বসত। মাথা ঝাঁকাত, অথবা চালের কিনারায় ডানা ঝটপটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিত দারুণ উত্তেজনায়। তোতাপাখিটাও ইতিমধ্যে চমৎকার নাবিকে পরিণত হয়েছে। সব সময় কটর-মটর করছে—নয়ত হাসছে। আমরা এখন নিজেদের সাত জন নাবিক বলি—ছ'জন মানুষ আর একটি সবুজ তোতা। কাঁকড়া জোহান্‌স নিজেকে গর্তে গুটিয়ে রাখে। ওকে একটা শীতল শোণিত আনুষঙ্গিক একটা কিছু বলে গণ্য করি। রাত এলে তোতাপাখিটা নিজের থেকেই খাঁচায় ঢুকে পড়ে। বাঁশের কেবিনের ভিতরে ঝোলান থাকে খাঁচাটা। কিন্তু দিনের বেলা পাখিটা সব সময় পাটাতনের উপর নেচে কুঁদে বেড়ায়। কখনও বা পালের দড়ি ধরে ঝুলতে থাকে—তখনই চলে সব থেকে চমৎকার দড়াবাজির খেলা।

সমুদ্র যাত্রার গোড়ার দিকে মাস্তুলের দড়িতে জায়গায় জায়গায় বকলস বেঁধে নিয়েছিলাম, কিন্তু পরে দেখা গেল বকলসের ঘষটানিতে দড়ির ক্ষতি হচ্ছে। এরপর আমরা দড়িরই গ্রন্থি বেঁধে নিয়েছিলাম। রোদে বা বাতাসে যখন দড়িতে টান পড়ত বা দড়ি শিথিল হয়ে আসত, আমরা সবাই হাত লাগাতাম মাস্তুলটাকে ঠিক মতো ধরে রাখতে—যাতে না লোহার মতো কঠিন গড়ান কাঠের দণ্ডটা লাফিয়ে উঠতে পারে পাটাতন থেকে বা দড়িদাড়া ছিঁড়ে না পড়ে যায়। বিশেষ সঙ্কট অবস্থায় আমরা যখন দড়ি টানছি সবলে, তোতাপাখিটা তখন উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠত—'হপ্। হপ! হো-হো-হো, হো-হো-হো।' ওর ডাক শুনে আমরা যদি হাসতাম তোতাটাও

হেসে কুটোপাটি হত। নিজের চাতুরীতে মশগুল হয়ে মাথা দোলাত অথবা মাস্তুলের দড়িতে ডানা ঝটপটিয়ে পাক খেত।

গোড়ার দিকে পাখিটা রেডিও-অপারেটারদের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা হয়ত কানে রহস্যময় ফোন লাগিয়ে রেডিয়োর কাছে মশগুল হয়ে বসে আছে—হয়ত বেতার মারফত ওকাহামার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। হঠাৎ ফোনটা স্তব্ধ মৃত হয়ে গেল। রেডিয়োর নবটা যতই ঘোরাঘুরি করুক আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তোতাপাখিটা কখন যে এ্যায়ারইঅ্যালের তার কেটে দিয়েছে কেউ লক্ষ্যও করেনি। বিশেষ করে গোড়ার দিকে যখন বেলুনের সাহায্যে এয়্যারইঅ্যালটাকে শূন্যে তোলা হত, তখনই এই দুষ্কর্ম করতে লোভাতুর হয়ে উঠত বেশি। একদিন তোতাটার ভীষণ অসুখ করল। খাঁচায় বসে লাফালাফি করে। বেশ কয়েকদিন খাবারই মুখে তুলল না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তোতার বিষ্ঠায় এয়্যারইঅ্যালের তারের সোনালী টুকরো ঝকঝক করছে। রেডিও-অপারেটারের তখন অনুতাপ হল। অপকর্মের জন্য তোতাকে রেগে গিয়ে অনেক গালমন্দ করেছে। এরপর থেকে তোতার সঙ্গে টরস্টেইন আর হুটের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তোতাটাও রেডিয়োর কোণ ছাড়া আর অন্য কোথাও ঘুমোবে না। তোতার মাতৃভাষা স্পেনীয় ছিল, যখন ও ভেলায় আসে। যেদিন থেকে টরস্টেইনের নরওয়েজীয় ভাষায় হাসি ঠাট্টার অনুকরণ করতে লাগল, সেদিন থেকে তোতার কথায়ও নরওয়েজীয় টান লক্ষ্য করতে লাগলাম। বেণ্টেরও তাই ধারণা।

আমরা দু মাস ধরে তোতাটার রহস্যপ্রিয়তা ও আমোদপ্রিয় আচরণের তারিফ করে আসছি। একদিন মাস্তুলের দড়ি বেয়ে নিচে নামছিল, হঠাৎ বিরাট একটা ঢেউ এসে ভেলার পাটাতনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। পাখিটাও যে পাটাতনের উপর পড়ে গিয়েছিল সে-কথাটা যখন জানতে পারলাম, বড্ড দেরি হয়ে গেছে তখন।

কন-টিকিকে ঘোরানোও যাবে না—থামানোও যাবে না। ভেলা থেকে কোন কিছু পড়ে গেলে সেটাকে পেতে ভেলার মুখ ফেরানো চলবে না। নানা অভিজ্ঞতায় এই সত্যটাই প্রমাণিত হয়েছে।

তোতাকে হারিয়ে প্রথম সন্ধ্যায় মনটা ভারি বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। আমরাও তো জানি রাত্রে একাকী পাহারা দিতে দিতে কোনমতে যদি জলে পড়ে যাই, আমাদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে। কাজেই নিরাপত্তার ব্যবস্থাটাকে সুদৃঢ় করতে হয়েছে—কোথাও যেন একটুও ফাঁক না থাকে। রাতের পাহারাদারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। দু মাস তো ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। ভয় এই আত্মতুষ্টি মন থেকে মুছে ফেলতে বাধ্য করল। একটা অসতর্ক পদক্ষেপ, একটা অপরিণামদর্শী আচরণ—সবুজ তোতা যেখানে যাত্রা করেছে আমাদেরও সেখানে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

এমন কি দিনের বেলাতেও।

আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি উটপাখির ডিম বা সাদা মাথার খুলির মতো কাট্‌ল মাছের সাদা খোলক নীল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চলেছে। মাত্র একবারই একটা স্কুইডকে ভেলার নিচে কিলবিল করতে দেখে ছিলাম। ভেলার পাশ দিয়ে তুষারের মতো সাদা বল ভেসে যেতে দেখে ভাবলাম রবাবের ডিঙ্গি চেপে তাদের ধরব। চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু বিধি বাম—কোনবারই সফল হতে পারলাম না।

তোতাপাখিটা ভেসে যাওয়ার পর থেকে রেডিয়োর কোণটা কেমন খালিখালি ঠেকত। আমরা ক্রমশ এই শোক সামলে উঠলাম। পরের কয়েকদিন অনেক হাঙ্গর ধরেছি। হাঙ্গরের পেটে তোতার কালো চঞ্চু দেখতে পেয়েছি। তাছাড়া টানির মাংস ও অন্যান্য নানা অদ্ভুত জিনিস তো ছিলই। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষায় ধরা পড়ল, কালো চঞ্চু বলে যা ভ্রমোৎপাদন করেছিল, তা আর কিছুই নয় চঞ্চুর মতো দেখতে কাট্‌ল মাছ মাত্র।

ভেলায় চড়ার প্রথম দিন থেকেই রেডিও-অপারেটারদের রেডিওস্টেশান নিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। হুমবল্ড স্রোতের পাল্লায় পড়ায় ব্যাটরি থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল গড়াতে লাগল। রেডিও অতিসূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াশীল—উত্তাল তরঙ্গের হাত থেকে যন্ত্রপাতি রক্ষা করার জন্য ক্যানভাসের কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হল। এরপর সমস্যা দেখা দিল ভেলার উপর এয়্যারইঅ্যাল খাটানো নিয়ে। ঘুড়ির সাহায্যে এয়্যারই-অ্যাল উঁচুতে পাঠাতে চেষ্টা করা হল। কিন্তু যতবারই চেষ্টা করে, দমকা বাতাসের পাল্লায় কবলিত হয়ে ঢেউয়ের চুড়োয় পড়ে ঘুড়ি অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। এরপর বেলুনের সাহায্যে উপরে ওঠাতে চেষ্টা করা হল। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলের রোদের তাপে বেলুন ফুটো হয়ে চুপসে গেল। চুপসনো বেলুন সমুদ্রে সলিল সমাধি লাভ করল। তারপর তোতাটাকে নিয়েও বিপদ দেখা দিল। তাছাড়া একপক্ষ কাল আমাদের হুমবল্ড স্রোতের আওতায় কাটাতে হয়েছে, আণ্ডিজ অঞ্চলের ঘাতপ্রতিঘাতহীন মৃত অঞ্চল ছেড়ে আসার পর। এ অঞ্চলের ছোট ছোট বায়ু তরঙ্গ অকেজো প্রাণহীন, যেমন শূন্য সাবানের বাক্সে বায়ুর অবস্থা।

তবে একদিন রাত্রে এই ছোট তরঙ্গ নিজের পথ করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। টরস্টেইনের আহ্বান-সঙ্কেত লস এঞ্জেলসের এক রেডিও অপারেটারের রেডিয়োতে ধরা পড়ে। সে নিজের ঘরে বসে সুইডেনের এক রেডিও অপারেটারের সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টা করছিল। ছেলেটি প্রশ্ন করে বসল, আমাদের কি ধরনের সেট। তার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে সে টরস্টেইনকে জিজ্ঞেস করল—কে সে, কোথায় থাকে। যখন শুনল টরস্টেইন প্রশান্তমহাসাগরে একটা ভেলার উপর বাঁশের কেবিনে বাস করে, তখন প্রশ্নের একেবারে ঝড় বয়ে গেল। টরস্টেইনকে অনেক বিস্তারিত খবর দিতে

হল। লোকটি জানাল, তার নাম হাল—বউয়ের নাম আন্না। বউ জন্মসূত্রে সুইডিশ। সে আমাদের বাড়ির লোকজনদের জানিয়ে দেবে, আমরা সমুদ্র বক্ষে আছি—এবং বেঁচেবর্তে আছি।

লস এঞ্জেলসের অগণিত জন সাধারণের মধ্যে আম্বাত, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মুভি ক্যামেরার অপারেটর—নাম হাল—একমাত্র জানতে পারল আমরা কোথায় অবস্থান করছি, আমরা নিরাপদে আছি। এই অদ্ভুত চিন্তায় আমরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তারপর থেকে হ্যারাল্ড কেমপেল ও তার বন্ধু ফ্রাঙ্ক কুয়েভাস প্রতিরাত্রে ভেলা থেকে রেডিও-সংবাদের জন্য প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকত। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া-অফিসের অধিকর্তার কাছ থেকে দুটো প্রাত্যহিক সাংকেতিক বার্তার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাত। এ এমন জায়গার বিরল খবর, যেখানকার কোন পরিসংখ্যাই নেই। এরপর মুট আর টরস্টেইন অন্য আরও অনেক রেডিও-অপারেটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিল। তাদের মারফত নরওয়েতে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা পাঠাত—নটোডেনের এজিল বর্গের কাছেও।

আমরা তখন মাঝদরিয়ায়। একদিন আমাদের রেডিও-কর্নারে নোনাজলের আবির্ভাবে স্টেশানের কাজকর্ম একদম বন্ধ হয়ে গেল। যন্ত্র কুশলীরা সারাদিন সারারাত সলডার করার লোহা প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। দূর পাল্লার রেডিও-রসিকদের ধারণা হয়ে গেল আমাদের ভেলার চরম দিন আসন্ন। হঠাৎ রাত্রে ইথারে সঙ্কেত-ধ্বনি পাওয়া গেল। তারপর রেডিও স্টেশানে সর্বক্ষণ বোলতার গুঞ্জন ধ্বনির মতো ঝমঝম আওয়াজে কান ঝালাপালা। একই সময়ে কয়েকশ আমেরিকান অপারেটার আমাদের আহ্বানের জবাব দিতে শুরু করেছে।

কেউ যদি রেডিও-অপারেটারের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে, তার অভিজ্ঞতা হবে সে বুঝি বোলতার বাসার উপর বসে আছে। জায়গাটা সমুদ্রের জলে স্যাঁতস্যেতে—জল কাঠের যে-কোন ফুটিফাটা দিয়ে ঢুকে পড়ছে ভিতরে। এমন কি যেখানে অপারেটার বসে সেই বালসাকাঠের উপর রবারের তাল পেতে বসলেও বিদ্যুতের শক লাগবে পাছায়, যেমন মোরস কি-তে আঙুলের ডগার ছোঁয়া লাগলে ঝনঝনিয়ে উঠবে হাত। এই সুসজ্জিত কোণ থেকে আমরা কেউ যদি পেনসিল চুরি করতে চেষ্টা করি, হয় মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে—নয়ত পেনসিলের সিসের মুখে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠবে। একমাত্র টরস্টেইন, মুট আর সবুজ তোতা বিদ্যুৎপৃষ্ঠ না হয়ে কোনমতে এঁকে বেঁকে চলাফেরা করতে পারে এখানে। আর বাকি আমরা বিপদ-এলাকা চিহ্নিত করে কার্ডবোর্ডের প্রাচীর তুলে দিলাম জায়গাটা আলাদা করতে।

একদিন রাত্রে মুট বাতির মিটমিটে ক্ষীণ আলোয় রেডিও-কর্ণারে বসে রেডিও নিয়ে খুটখাট কি কাজ করছিল, হঠাৎ সে আমার পা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, সে

এখন অসলোর সীমানার বাইরে একজনের সঙ্গে বাতচিত করছে। নাম তার ক্রিষ্টিয়ান আমুনসেন। ২রা অগাস্ট। আমরা ৬০° ডিগ্রীরও বেশি কোণ ধরে ভূগোলককে বৃত্তাকারে বেষ্টন করে চলেছি। অসলো ভূগোলকের বিপরীত প্রান্তের শেষ দিকে অবস্থিত। সম্রাট হাকোন পরের দিন পচাত্তর বছরে পদার্পণ করবেন। আমরা ভেলা থেকে তাঁর শুভেচ্ছা কামনা করে অভিনন্দন-বার্তা পাঠালাম। পরে ক্রিষ্টিয়ানের কথা আবার রেডিও-তে শোনা গেল। সম্রাট আমাদের সৌভাগ্য ও অভিযানের সাফল্য কামনা করে আন্তরিক বার্তা পাঠিয়েছেন—জানাল সে। ভেলা-জীবনের আর একটা উল্লেখযোগ্য অস্বাভাবিক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমাদের ভেলায় দুটো ক্যামেরা ছিল। সমুদ্রে থাকাকালীন ক্যামেরায় তোলা ছবি ডেভালপ করার মালমশলাও সঙ্গে নিয়েছিল এরিক। প্রথম তোলা ছবি অস্পষ্ট হলে দ্বিতীয়বার ছবি নেবার অসুবিধা ছিল না। তিমি-হাঙ্গরের দর্শনের পর এরিক আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। একদিন নির্দেশ মতো রাসায়নিক পদার্থ সতর্কভাবে জলে মিশিয়ে তোলা ফিলিম ডেভালপ করতে চেষ্টা করল। নিগেটিভগুলো দূর থেকে নেওয়া ফটোগ্রাফের মতো মনে হল—যেন কতকগুলো অস্পষ্ট আঁকিবুকি আর বিন্দুর সমষ্টি। ফিলিমটাই বরবাদ। আমরা উপদেশের জন্য টেলি-সঙ্কেত পাঠালাম। হলিউডের কাছে একজন রেডিও-অপারেটার বার্তাটি পেয়ে ল্যাবোরাটরির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। পরে জানাল, আমাদের আলোকচিত্র বড় করার যন্ত্রটি অত্যধিক গরম থাকায় এই বিপর্যয়। কোনমতেই ৬০° ডিগ্রীর চেয়ে উষ্ণতর জল যেন ব্যবহার না করি। তাহলে নিগেটিভে ঐ রকম আঁকিবুকি দেখা যাবে।

এই অমূল্য উপদেশের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালাম। আমাদের আশেপাশে সব থেকে ঠাণ্ডা যা তা হল সামুদ্রিক স্রোত—তারও তাপমাত্রা ৮০° ডিগ্রী। হেরমান হিমায়নযন্ত্র-বিশারদ। আমি তাকে পরিহাসছলে জলের তাপমাত্রা ৬০° ডিগ্রীতে নামিয়ে আনতে বললাম। সে ফোলান রবারের ডিঙ্গির ছোট কারবলিক অ্যাসিডের শিশিটা ব্যবহার করার জন্য ধার চাইল। তারপর স্লিপিং ব্যাগ ও উলের ভেস্ট ঢাকা দিয়ে একটা কেতলীতে জল ঢেলে কি ভোজবাজির খেলা খেলল সেই জানে—হঠাৎ দেখা গেল হেরমানের ঘন দাড়িতে তুষার-কনা ঝিকিমিকি করছে আর কেতলীতে রয়েছে এক চাঁই সাদা বরফ।

এরপর আলোকচিত্র ডেভালপ করে অপূর্ব ফল পেল এরিক।

কন-টিকিতে অবস্থান কালে গোড়ার দিকে বেতারে ছোট ছোট তরঙ্গ মারফত নানা ভৌতিক কথাবার্তা শুনতে পেতাম। সে-সব শোনাও একটা বিলাস ছিল আমাদের পক্ষে। ভেলার নিচে সমুদ্র-তরঙ্গ অতীতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। পনেরশ' বছর আগে যেমন, আজও তেমনি ভেলাকে পশ্চিম দিকে স্থির লক্ষ্যে

নিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে আবহাওয়া একটু এলোমেলো হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে ঝুপঝাপ বৃষ্টি হচ্ছে। এবার আমরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের এলাকার নিকটবর্তী হচ্ছি। অয়ন বায়ুর গতি-পরিবর্তনও হয়েছে। যতদিন না আমরা নিরক্ষীয় জল-স্রোতের এলাকায় পুরোপুরি প্রবেশ করলাম, ততদিন অয়নবায়ু একটানা অগ্নি কোণ থেকে বইছিল। এবার গতি পরিবর্তন হয়েছে—শুধু পূব মুখো বাতাস বইছে। ১০ই জুন তারিখে ভেলার গতি সম্পূর্ণ উত্তরমুখো হয়ে পড়ল—দক্ষিণে ৬°১৯´ অক্ষাংশাভিমুখী। আমরা এখন নিরক্ষরেখার এত কাছে এসে পৌঁছেছি যে, মনে হল মারকুয়েসাস দ্বীপপুঞ্জের সব থেকে উত্তরাঞ্চলের উপর দিয়ে সমুদ্রগর্ভে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাব—ডাঙ্গার আশা সুদূর-পরাহত। কিন্তু অয়ন বায়ু আরও ঘুরে পূব থেকে ঈশান কোনের দিকে মোড় নিয়েছে—আমাদেরও বক্ররেখায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল দ্বীপ-রাজ্যের দিকে।

প্রায়ই এমনও ঘটতে লাগল—দিনের পর দিন বাতাস ও সমুদ্রের কোন পরিবর্তন দেখা যেত না। অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে একমাত্র রাতে ছাড়া কার যে দাঁড়ে পাহারা থাকার কথা ভুলেই গেলাম। আর রাতেও একজনই পাহারায় থাকত। এই সময় দাঁড়টাকে তুলে শক্ত করে বেঁধে রাখা হত আর কন-টিকির পাল সবসময় বাতাসে ফুলে থাকত—আমাদেরও আর দড়িদড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হত না। রাত্রে যাকে পাহারা দিতে হত, সে কেবিনের দরজার সামনে হাত গুটিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকত—তাকিয়ে থাকত তারাভরা আকাশের দিকে। আকাশে তারারা যদি স্থান পরিবর্তন করত, অমনি সে উঠে গিয়ে দেখত,—দাঁড় না পাল—কিসের পরিবর্তন হয়েছে, কে সরে গেছে নিজের নির্দিষ্ট স্থান থেকে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধনুকাকৃতি আকাশের ছাদের বুকে দুর্বার গতিতে তারাদের এগিয়ে যাওয়া দেখে ভেলা চালানো যে কত সহজ—তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রাতে লক্ষ্যবস্তু বলতে আর অন্য কিছুই তো নেই। রাতের পর রাত আকাশের বুকে বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের কোথায় অবস্থিতি হবে জানতাম আমরা। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি এলে উত্তরদিকে দিকচক্রবাল থেকে কালপুরুষ এমন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উদিত হল যে ভয় পেলাম আমরা, হয়ত ধ্রুবতারাকে আর দেখতে পাব না। সচরাচর দক্ষিণ দিক থেকে এসে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ধ্রুবতারার দর্শন মেলে। কিন্তু যে-মুহূর্তে ঈশান কোণ থেকে অয়ন বায়ু বইতে শুরু করল, কালপুরুষও অস্তমিত।

প্রাচীন পলিনেশীয়রা কুশলী নাবিক ছিল। তারা দিনে সূর্য আর রাতে তারাদের দেখে নৌ-চালনা করত। সৌরজগতের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর। তারাও জানত পৃথিবী গোলাকার। নিরক্ষরেখা, উত্তর ও দক্ষিণ গ্রীষ্মমণ্ডল সম্বন্ধে নিগূঢ় ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন নামকরণ করেছিল নক্ষত্রদের। হাওয়াই-এ

তারা লাল লাউয়ের খোলার গায়ে সমুদ্রের নকশা আঁকত। অন্যান্য দ্বীপেও চাটাইয়ের বাখারির গায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্রের ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল। সেই মানচিত্রে দ্বীপ বোঝাতে খোলক এঁটে দিত আর বিশেষ ধরনের স্রোতধারা বোঝাতে সেঁটে দিত গাছের ছাল। পাঁচটা গ্রহকে চিনত পলিনেশীয়রা। তাদের বলত ভ্রাম্যমান নক্ষত্র। স্থির নক্ষত্র থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা। এই ভ্রাম্যমান নক্ষত্রদের প্রায় দুই শতাধিক নামকরণ করেছিল। পলিনেশীয়দের যে কোন অভিজ্ঞ নাবিক জানত—আকাশের কোন্ অংশে কখন কোন্ নক্ষত্রের উদয় হবে। বছরের বিভিন্ন সময়ে এবং রাত্রির বিভিন্ন নামে আকাশের কোন্ কোন্ বিভিন্ন অংশে অবস্থান করবে। তারা এও জানত—তাদের দ্বীপের উপরে কোন্ নক্ষত্রটা সবচেয়ে তুঙ্গে অবস্থান করবে। বছরের পর বছর, রাতের পর রাত যে-নক্ষত্রটা দ্বীপের উপর তুঙ্গী হয়, তার নাম অনুসারেই দ্বীপের নামকরণ করা হয়েছে।

নক্ষত্রখচিত আকাশটা একটা ঝিকিমিকি কম্পাসের মতো পূব থেকে পশ্চিমে আবর্তিত হয়—এ তথ্য তারা জানত। তারা আরও বুঝত—মাথার উপরে যে-সব নক্ষত্রদের দেখতে পাওয়া যায়, উত্তর বা দক্ষিণে কত দূরে অবস্থান করেছে তারা, তা যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত তাদের। পলিনেশীয়রা এই দ্বীপাঞ্চলে আসার পর অভিযান চালিয়ে জেনে নিয়েছে, তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি কতদূর। আমেরিকার নিকটতম সমস্ত অঞ্চল তাদের সীমানার এলাকা। সব জানা হয়ে গেলে কতকগুলো দ্বীপের মধ্যে তারা যুগ যুগ ধরে সংযোগ-সূত্র অক্ষুন্ন রেখেছে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় তাহিতির প্রধানরা হাওয়াই দ্বীপে এসেছিল সূর্য ও নক্ষত্রদের দেখে উত্তর মুখো অভিযান চালিয়ে। মাথার উপর নক্ষত্রদের দেখেই বুঝতে পারে হাওয়াই-এর অক্ষাংশের কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। তারপর সমকোণে বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকে সোজা এগিয়ে যায়। এক সময় পাখির মেলা আর মেঘের খেলা দেখে বুঝতে পারবে কোথায় দ্বীপপুঞ্জের অবস্থিতি।

পলিনেশীয়রা কোথা থেকে জ্যোতির্বিদ্যায় এমন বিপুল জ্ঞান ও নির্ভুল কাল গণনার পদ্ধতি বা পঞ্জিকা আবিষ্কার করেছিল? নিশ্চয়ই পশ্চিমের মালয়ীদের কাছ থেকে নয়। কিন্তু সেই প্রাচীন অদৃশ্য হয়ে যাওয়া 'শ্বেতকায় শ্মশ্রুওয়ালারা'—যারা আমেরিকা, আজটেক, মায়া ও ইনকাদের বিস্ময়কর সংস্কৃতির অভিজ্ঞান দান করেছিল—তারা কিন্তু অদ্ভুত কাল গণনার পদ্ধতির পথিকৃৎ ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম ছিল। সে-যুগে ইউরোপের লোকেরাও এ ব্যাপারে পারদর্শিতায় তাদের সমকক্ষ ছিল না। পেরুতে যেমন পলিনেশিয়াতেও তেমনি কাল গণনার পদ্ধতি এমনভাবে বিন্যস্ত যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারারা যেদিন প্রথম দিকচক্রবালে আবির্ভূত হয়, ঠিক সেই দিন থেকে বছরের প্রথম দিন গণনারও শুরু। উভয় জায়গাতেই এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারারা

কৃষিকাজের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গণ্য।

পেরুতে স্থলভাগ ক্রমশ প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ঢালু হয়ে এসেছে। সেখানে আজও মরুবালিকণায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি সুপ্রাচীন মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। যে রহস্যময় সুসভ্য জাতির লোকেরা পাথর কেটে অতিকায় মূর্তি খোদাই করেছিল, সপ্তর্ষিমণ্ডলের উদয়ের দিন থেকে বর্ষ গণনা শুরু করেছিল—এ তাদেরই পুরা-কীর্তি। যেদিন প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালিয়েছিলেন কন-টিকি, তিনিও নক্ষত্রদের গতিবিধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

২রা জুলাই। রাতের প্রহরী তারাভরা আকাশের তারাদের নিরীক্ষণ করে করে আর শান্ত হয়ে বসতে পারছিল না। প্রবল বাত্যা বইছে। সমুদ্রও বিশ্রী উত্তাল হয়ে উঠেছে। এর আগের কয়েক দিন ঈশান কোণ থেকে হালকা বাতাস বয়েছে। রাত গভীর হলে উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় চারদিক ঝকমক করত। টাটকা বাতাস উঠে ভাসিয়ে নিয়ে যেত ভেলা। একটা কাঠের টুকরো ভেলার সামনের দিকে ছুঁড়ে দেই। টুকরোটার ভেলার পাশ দিয়ে যেতে কত সেকেণ্ড লাগে, তাই গুণে ভেলার গতিবেগ মাপি। এইভাবে ভেলার গতিবেগের একটা রেকর্ডও রাখা হয়েছে। গড়পরতা হিসেব হল, বার থেকে আঠারটা কাঠের টুকরো—ভেলার উপরের কিচির মিচির থেকে যতটুকু অনুধাবন করা গেল, এখন কমে দাঁড়িয়েছে ছয় টুকরোয়। ভেলার পিছনে ফসফরাসের দ্যুতি নিরবচ্ছিন্ন চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে।

কেবিনের ভিতরে চারজন নাক ডাকাচ্ছে। টরস্টেইন রেডিও নিয়ে ব্যস্ত। আমি আছি দাঁড়ে। রাত দুপুরের ঠিক একটু আগে এক অস্বাভাবিক বিরাট তরঙ্গ ভেলার পিছন দিক থেকে এসে আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত করে ভেঙ্গে পড়ল। প্রথম তরঙ্গের পর ফেনায়িত চূড়া বিশিষ্ট আরও দুটো তরঙ্গ। ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ জায়গাটা যদি অতিক্রম করে না যেতাম, এটাকে একটা বিপজ্জনক তরঙ্গের উৎক্ষিপ্ত ফেনময় প্রচণ্ড বারিরাশির তাণ্ডব বলে ভাবতাম। যখন প্রথম তরঙ্গের প্রাচীরটা এগিয়ে আসে আমি সবাইকে সতর্ক করে দিতে আর্ত চিৎকার করে উঠেছিলাম। পরবর্তী অবস্থার মোকাবিলা করতে ভেলাটা ঠিকমতো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে ভেলার গতিমুখ সবলে ঘুরিয়ে দিলাম।

যখন প্রথম তরঙ্গটা এসে আঘাত করেছিল ভেলার পিছন দিকটা ধাক্কা খেয়ে একপাশে ছিটকে গিয়েছিল। অবশ্য তরঙ্গ চূড়োয় উঠে পড়েছিল ভেলাটা। তরঙ্গের চূড়োর তখন ভগ্নদশা। চারিদিক ফেনায় আবিল। হিস হিস গর্জন। আমরা তখন ফেনায়িত গুরুভার জলরাশি পার হয়ে এসেছি। ভেলার দু পাশ উৎক্ষিপ্ত জলরাশি ভিজিয়ে দিয়েছে। আর বিরাট তরঙ্গটা ভেলার তলা দিয়ে পার হয়ে গেছে। ঢেউ চলে যাওয়ার সময় ভেলার সামনের দিকটা উঁচু হয়ে উঠেছিল। তারপর আমরা দুই

তরঙ্গের মাঝখানের গভীর খাতে গড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে পড়ল ভেলার পিছন দিকটা। মুহূর্তেই পরবর্তী ঢেউয়ের প্রাচীর এসে হাজির। ঢেউ উঁচু হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভেলাও উঁচু হয়ে উঠল শূন্যে। আর স্বচ্ছজলরাশি পিছন দিক থেকে এসে ভেঙ্গে পড়ল আমাদের উপর। আমরা ছিটকে এসে পড়লাম ভেলার কিনারায়। এর ফলে ভেলাটা তরঙ্গের পাশাপাশি হয়ে গেল। দ্রুত তার মুখ ঘোরানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। পরবর্তী তরঙ্গ এসে হাজির। ডোরাকাটা ফেনারাশির ভিতর থেকে মাথা জাগিয়ে উঠল ঝকঝকে তরঙ্গের প্রাচীর। আমাদের কাছে এসে যখন পৌছল, প্রাচীরের ধার ধ্বসে যাওয়া শুরু হয়ে গেছে, ঢেউ যখন গড়িয়ে গেল, আমার আর তখন কিছুই করার ছিল না। আমি কোন মতে কেবিনের ছাদের বেরিয়ে আসা বাঁশটা সবলে আঁকাড় ধরে ঝুলে রইলাম শূন্যে। শ্বাসরুদ্ধ করে রইলাম। হঠাৎ মনে হল আমরা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দোদুল্যমান হয়ে আছি। চারপাশে শুধু ফেনিল গর্জায়মান জলের ঘূর্ণী। মুহূর্তের মধ্যে আমরা ও কন-টিকি আবার জলের উপর অবতরণ করলাম—অশান্তগতি তরঙ্গকে পিছনে ফেলে এলাম। এরপর শান্ত হয়ে এল ঢেউয়ের দল। তিনটে বিরাট তরঙ্গের প্রাচীর সামনের দিকে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে দেখতে পেলাম।

চাঁদের আলোয় দেখলাম পিছনে একটা নারকেলের মালা ডুবছে, ভাসছে—এইভাবে চলেছে।

শেষ ঢেউটা কেবিনকে ভীষণ ভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে টরস্টেইন রেডিও-কর্ণারে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেই শব্দে বাকিরাও জেগে ওঠে ভয়ে। দুটো কাঠের মঝেখান থেকে আর কেবিনের দেয়ালের ফাঁকফোঁকর দিয়ে সবেগে জল ঢুকে পড়েছে ভিতরে। কেবিনের বাঁ পাশের দুর্বল চাটাইয়ের বেড়া খুলে হাঁ হয়ে গেছে—দেখাচ্ছে ঠিক ছোট, জ্বালামুখের মতো। ভেলার সামনের দিকে ডুবুরী-ঝুড়িটা পড়ে আছে মুখ থুবড়ে আর ভিতরে যা ছিল সব চারদিকে ছত্রাখান। কোথা থেকে আচমকা এই তিনটে ঢেউ এসেছিল নিশ্চিত করে বলতে পারব না। হয়ত সমুদ্রের তলায় কোথাও কোন বিক্ষোভ ঘটেছিল—যা প্রায়ই ঘটে থাকে এখানে।

দু-দিন পরে আমরা প্রথম ঝড়ের সম্মুখীন হলাম। অয়ন বায়ু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঝড়ের সূত্রপাত। অখণ্ড নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। হঠাৎ কোথা থেকে ঘন কালো মেঘপুঞ্জ দক্ষিণে দিগন্ত-রেখার কাছ থেকে পাক খেয়ে উপরে উঠতে লাগল। তারপর অপ্রত্যাশিত দিক থেকে দমকা হাওয়া তেড়ে আসতে লাগল। দাঁড়ীর পক্ষে একা দাঁড় নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। যে-দিক থেকে হাওয়া বইছিল সেই দিকে অর্থাৎ আমরা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ভেলার পিছন দিকটা সেই মুখো ফেরালাম। সঙ্গে সঙ্গে পালে হাওয়া লেগে পেট ফুলে উঠল টানটান হয়ে। পর মুহূর্তেই ভিন্ন দিক থেকে

তেড়ে এল বায়ু—চুপসে গেল পেট। চোখের পলকে পালটা ঘুরে গিয়ে মাস্তুলের উপর আছড়ে পড়ল। ভেলার মালপত্তর ও যাত্রীদের পক্ষে ঘনিয়ে উঠল মহাবিপদ। কিন্তু পরমুহূর্তেই যেদিকে ঘনঘটার শুরু, হঠাৎ সেই দিক থেকে আবার তেড়ে এল বাতাস। এবার মেঘপুঞ্জ গড়িয়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে। বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে ঝড়ের উগ্রমূর্তি নিয়ে প্রকট হল।

অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ের মধ্যে দেখতে না দেখতে চার পাশে সমুদ্র ফুলেফেঁপে পনের ফুট উঁচু হয়ে উঠল আর দুটো ঢেউয়ের মাঝের খাদ থেকে ঢেউ-এর চুড়ো উঁচু হয়ে উঠল কুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট। ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফুঁসছে ঢেউ। আমাদের ভেলা যখন এই খাদে পড়েছিল, ভেলার মাস্তুল প্রায় চুড়ো ছুঁইছুঁই করছিল। ডেকের উপর সব কটি হাত কোন কিছু আঁকড়ে ধরার জন্য ঝটাপটি করছিল যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে। বাতাস থেকে থেকে কেবিনের দেয়াল ভীষণভাবে নাড়া দিচ্ছিল। চারদিকে শুধু তীব্র শাসানি আর গর্জন, যেমন পালমাস্তুল দড়িদড়ায় টানাটানি ও হৈ-হুজ্জুতি চলছিল এক নাগাড়ে।

আমাদের রেডিও-স্টেশানটা রক্ষা করার জন্য কেবিনের বাঁ পাশ ও পিছন দিকের দেয়াল ক্যানভাসে ঢেকে দেওয়া হল। যে-সব মালপত্তর আলগা ছিল তাদের ও পালটাকে নামিয়ে বাঁশের পাটাতনের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নেমে এল। সমুদ্র ভয়াল আকার ধারণ করেছে। চারদিকে শুধু ভেঙ্গে পড়ছে সাদা ফেনিল ঢেউ-এর চূড়ো। দীর্ঘ ঢেউ-এর পিছনে বাতাসের মুখে ডোরাকাটা ফেনার কুচির পথ-রেখা দেখা যাচ্ছে। সর্বত্র যেখানে ঢেউ-এর চূড়ো ভেঙ্গে পড়ছে নিচের দিকে, নীলচে-কালো সমুদ্রের বুকে এখানে-ওখানে ক্ষতস্থানের মতো খাবলা-খাবলা সবুজ জলধারা গ্যাঁজলা কাটছে বকবক করে। ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুড়োও গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়া লোনা জলের ধারা নিয়ে বায়ুতাড়িত মেঘ ভাসছে মাথার উপর। দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরালে বয়ে যাওয়া ঝড়ো হাওয়ায় গ্রীষ্মদিনের বৃষ্টিধারা ভেঙ্গে পড়ছে আমাদের মাথায়—চাবুকের মতো আঘাতে জর্জরিত করছে সমুদ্রের বুক। সমুদ্রকে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। চুল ও দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির জল মুখে ঢুকে পড়ছে। কটুতিক্ত স্বাদ। আমরা উলঙ্গ প্রায় হয়ে ডেকের উপর হামাগুড়ি টেনে পরখ করে দেখে বেড়াচ্ছি সাজসরঞ্জাম দাঁড়টার যথাযথ আছে কিনা। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে চলেছি অবিরাম।

দিগন্তের কাছে জমায়েত হওয়া ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রথম যখন আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল, সবারই মুখে-চোখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ঝড় যখন উন্মত্ত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের উপর, কন-টিকি সবকিছু নিরুদ্বেলিত প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করায়, ঝড় হয়ে দাঁড়াল আমাদের কাছে একটা উত্তেজনাময় খেলা মাত্র। আমরাও এই প্রচণ্ড উন্মত্ততায় উল্লাসে মেতে উঠলাম। বালসা-ভেলা এই ঝড়ো

পরিস্থিতির অতি দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে লাগল। একটাই লক্ষ্য তার ছিল, তা হল, সব সময় কর্কের মতো ঢেউ-এর চুড়োর উপর ভেসে থাকা আর গর্জায়মান ভারী জলরাশি যেন ভেলার কয়েক ইঞ্চি নিচে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে পাহাড়ের সঙ্গে সমুদ্রেরও অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। এ যেন ঝড়ের মধ্যে সুউচ্চ পার্বত্য মালভূমির—ধূসর, অনাবৃত উষর প্রান্তরে অবস্থান করা। আমরা এখন গ্রীষ্মমণ্ডলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি। ধূমায়মান সমুদ্র-বক্ষে একবার ঢেউ-এর চুড়োয় উঠছি, আবার নামছি। আমাদের মনে একটাই চিন্তা অধিকার করে আছে, আমরা তুষার-ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছি।

এই সময় দাঁড়ে যে কর্তব্যরত থাকে, সে সব সময় সজাগ থাকে—চোখ কান খুলে রাখে। সব থেকে খাড়া ও উঁচু ঢেউ যখন সামনের দিকে ভেলার অর্ধেকটা পেরিয়ে চলে আসে, ভেলার পিছনের অংশ জল থেকে শূন্যে উঠে পড়ে, কিন্তু পর মুহূর্তেই পরবর্তী চুড়োয় ওঠার জন্য জলের নিচে ডুবে যায়। প্রথম ঢেউ ভেলার সম্মুখ ভাগ শূন্যে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের ঢেউ এসে পড়ে। এইভাবে ঢেউয়ের ঝাঁক নিরবচ্ছিন্ন গতিতে একের পর এক আসতে থাকে। যে দাঁড়ে থাকে, তাকে অস্বাভাবিক রকম গুরুভার বারিরাশির চাদর সগর্জনে আবৃত করে ফেলে কিন্তু পর মুহূর্তেই ভেলার পশ্চাদ্‌ভাগ শূন্যে উঠে পড়ে—পলকে বন্যার জল কাঁটা চামচের দুটো কাঁটার ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়ার মতো ভেলার দুপাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমরা হিসেব করে দেখেছি সাধারণ অবস্থায় দুটো সর্বোচ্চ তরঙ্গের আসা-যাওয়ার মধ্যে সময় লাগে মাত্র সাত সেকেণ্ড আর চব্বিশ ঘণ্টায় আমরা দুশ টন জল কেটে অগ্রসর হই। কিন্তু এসব কারুর নজরেও পড়ে না। কারণ যে দাঁড়ে থাকে তার খালি পায়ের চারপাশ আর ভেলার তলা দিয়ে বয়ে যায় অবিরাম বারিপ্রবাহ। কিন্তু ঝড়ের সময় চব্বিশ ঘণ্টায় দশ হাজার টনের বেশি জলধারা ভেলার পশ্চাৎ ভাগের ডেকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। দু থেকে তিন কিউবিক গজের উপর দিয়ে কয়েক গ্যালন জল চলে যায়—মাঝে মাঝে প্রতি পাঁচ সেকেণ্ড অন্তর আরও বেশি পরিমাণও জল বয়ে যায়। কানে তালা-লাগানো শব্দে জল ভেঙে পড়ে ভেলার উপর—দাঁড়িকে কোমর জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে যেন খরস্রোতা নদীতে উজান বেয়ে চলেছে —তার মনের ভাবটা তখন এই রকম। ভেলাটা এই ধাক্কায় মুহূর্তের জন্য শিহরিত হয়ে ওঠে। ততক্ষণে যার নিষ্ঠুর ধাক্কায় সচকিত হয়ে উঠেছিল, ডুবিয়ে দিয়েছিল তার পশ্চাৎ ভাগ, সেই জলধারা কখন পাটাতনের উপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে প্রবল উচ্ছ্বাসে।

হেরমান সর্বক্ষণ বায়ুর গতিমাপক যন্ত্র নিয়ে ঝড়ো হাওয়ার গতিবেগ মেপে চলেছে। চব্বিশ ঘণ্টার পর ঝড়ের গতিবেগ হ্রাস পেল। তখনও বেশ জোরেই বই

ছিল বাতাস—সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ধারা বর্ষণ। আমাদের ভেলা পাল তুলে ছুটে চলেছে পশ্চিম দিকে। চারপাশে ফুঁসছে সমুদ্র। উত্তাল সমুদ্রের সুউচ্চ তরঙ্গ বিক্ষোভের সময় বায়ুর গতিবেগের নির্ভুল হিসেব নিতে যখনই সম্ভব মাস্তুলের উপর উঠে বসে সে। মাথার দণ্ডটা অনবরত ঘূরপাক খায় কিন্তু সেখানে চেপে বসে থাকতে তাকে যথাশক্তি চেষ্টা করতে হবেই।

আবহাওয়া অনেকটা ধাতস্থ হয়ে এল। অর্থাৎ বিরাট একটা মাছ হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলেছিল আমাদের চারপাশে। ভেলার চারদিকে ভেলার তলায় কিলবিল করছে হাঙ্গর, টানি, ডলফিন—কিছু হতভম্ব বনিটোও। বাঁচা-মরার নিরন্তর লড়াই চলেছে। জলের উপর ধনুকের মতো পিঠ বাঁকিয়ে রকেটের গতিতে ছুটে যাচ্ছে মাছেরা। জোড়ায় জোড়ায়—একে অন্যকে তাড়া করছে। ভেলার চার-পাশের জল হামেশাই রক্তে লাল হয়ে উঠছে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা হল টানি আর ডলফিনরা। বিরাট ঝাঁক বেঁধে আসছে ডলফিনরা। সচরাচর যেমন দেখা যায়, তার চেয়ে বেশি দ্রুতগামী ও সতর্ক। টানিরাই প্রধানতঃ আক্রমণকারী। প্রায়ই একশ থেকে দু'শ পাউণ্ড ওজনের এক একটা মাছ বাতাসে লাফিয়ে উঠছে—মুখে থাকে ডলফিনের একটা রক্তাক্ত মুণ্ডু। বিচ্ছিন্ন কোন ডলফিন টানির ভয়ে ছুট লাগালেও ডলফিনের ঝাঁক সূচ্যগ্র জমিও ছাড়তে নারাজ—যদিও অনেকেরই ঘাড়ের কাছে গভীর ক্ষত। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মাঝে মাঝে হাঙ্গররা পর্যন্ত রাগে অন্ধ হয়ে উঠছে। তারা টানিদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত—যাকে পারছে ধরছে। হাঙ্গররা টানিদের বড় শত্রু।

শান্তিপ্রিয় ক্ষুধে পাইলট মাছেরা এ তল্লাট থেকে তখন হাওয়া—কারুর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। হয় ভয়ঙ্কর টানিরা তাদের খেয়ে ফেলেছে, অথবা তারা ভেলার নিচে কাঠের খাঁজে গা ঢাকা দিয়েছে। নয়ত সমরাঙ্গন থেকে বহুদূরে সটকে পড়েছে। জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে কোন কিছু দেখার সাহস হল না আমার।

আমি একটা বিশ্রী ধাক্কা খেয়েছিলাম। পরে নিজের বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থার কথা ভেবে হাসি চাপতে পারিনি। ভেলার পিছন দিকে আমি তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছিলাম অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগে ব্যস্ত। আমাদের এই নিভৃত মলমূত্রাগারে একটু-আধটু জলস্ফীতির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত সবাই। হঠাৎ ভীষণ ঠাণ্ডা ও ভারী কিছু একটা থেকে আমার অনাবৃত পশ্চাৎ দেশে অপ্রত্যাশিত আঘাতে আমাকে একেবারে হকচকিয়ে দিল। হয়ত কোন হাঙ্গর মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরেছে পাছায়। আমি মাস্তুলের দড়ি ধরে তখন উপরে উঠে পড়তে ব্যস্ত—একটা বিশ্রী ধারণা নিয়ে যে নিশ্চয়ই কোন হাঙ্গর আমার পাছায় কামড়ে ধরে ঝুলছে। হেরমান তখন দাঁড়ে বসেছিল। সে তো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। কোন মতে হাসি সামলে বলল, একটা একশ 'ষাট পাউণ্ড ওজনের বিরাট টানি মাছ আমার উলঙ্গ পাছায় সাঁ

করে সপাটে আঘাত করেছে পাশ থেকে। এরপর হেরমান ও টরস্টেইন যখন দাঁড়ে ছিল, এই মাছটাই ভেলায় লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিল, দুবার তো ভেলার পিছন দিকে বসবার কাঠের গুঁড়ির আসনের উপর উঠেও পড়েছিল। কিন্তু আমরা তার পিচ্ছিল দেহটা ধরবার আগেই সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এরপর বেশ মোটাসোটা একটা হতচকিত বনিটো ঢেউ-এর সঙ্গে পাটাতনের উপর এসে পড়ে। এইভাবে আগের দিন একটা টানিকেও ধরেছি। এবার জলের এই রক্তাক্ত এলোমেলো অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে আমরা মাছ ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার ডাইয়ারিতে লেখা আছে :

প্রথমে ছ-ফুট লম্বা একটা হাঙ্গরকে বঁড়শি গেঁথে পাটাতনের উপর তোলা হল। আবার বঁড়শি জলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আট ফুট লম্বা একটা হাঙ্গর সেটাকে গিলে ফেলল। তাকেও উপরে টেনে তুললাম। এরপর বঁড়শি ফেলা হলে ছ-ফুট লম্বা আর একটা হাঙ্গব ধরা পড়ল। তাকে টেনে আনার সময় ভেলার কাছাকাছি আসতেই বঁড়শি থেকে ছাড়ান পেয়ে এক ডুবে অদৃশ্য। সঙ্গে সঙ্গে আবার বঁড়শি জলে ছুঁড়ে ফেলা হল। একটা ফুট আটেক লম্বা হাঙ্গর বঁড়শির কাছে এগিয়ে এল। চলল তুমুল লড়ালড়ি। সবে তাব মাথাটা ভেলার পাটাতনের উপর টেনে তুলেছি এমন সময় হাঙ্গরটা দড়ি ছিঁড়ে জলের তলায় তলিয়ে গেল। পরক্ষণেই নতুন বঁড়শি বের করা হল—সাতফুট লম্বা একটা হাঙ্গরকে বঁড়শি গেঁথে ভেলার উপর টেনে তুললাম। এদিকে ভেলার পিছন দিকে পিচ্ছিল কাঠের উপর এভাবে মাছধরা বেশ বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। তিনটে ধৃত হাঙ্গর বার বার মাথা বাড়িয়ে কামড়াতে চেষ্টা করছে—যদিও আমাদের ধারণা হয়েছিল এরা বুঝি কখন আক্কা পেয়েছে। আমরা হাঙ্গর তিনটেকে ভেলার সামনের দিকে টেনে এনে এক জায়গায় গাদা করে রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা বড় টানিকে বঁড়শিতে গেঁথে ফেলা হল। এটাকে পাটাতনের উপর টেনে তুলতে হাঙ্গরের তুলনায় ঢের বেশি হুজ্জতি করল। বেশ মোটা ও ভারী—আমরা কেউই টানিটাকে একা পাটাতনের উপর টেনে তুলতে পারলাম না।

সমুদ্রে ভয়ঙ্কর মাছেরা গিস গিস করছে। তাদের পিঠ দেখতে পাচ্ছি। আর একটা হাঙ্গরকে বঁড়শিতে গাঁথা হয়েছিল—ভেলায় টেনে তোলার আগেই সেটা বঁড়শি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। এরপর একটা পাঁচফুট হাঙ্গরকে টেনে তুললাম। তারপর আরও একটা ছ-ফুট। এরপব সাতফুট লম্বা আর একটা হাঙ্গর বঁড়শি-গাঁথা হল।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভেলার ডেকের উপর নড়াচড়া করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। বড় বড় হাঙ্গরগুলো পথ রোধ করছে। তারা ডেকের উপর পাগলের মতো লেজ আছড়াচ্ছে, কখনও বাঁশের কেবিনের গায়ে সপাটে আঘাত হানছে—কামড়াতে চেষ্টা করছে। ঝড়ের পর আমরা যখন মাছ ধরতে নামি, আমাদের তো

হা-ক্লান্ত অবস্থা। কোন্ হাঙ্গরটা মরে গেছে, কোন্টা বেঁচে আছে এখনও বুঝতেই পারছি না—এত বিভ্রান্ত আমরা। কিন্তু কারুর কাছে এগোলেই ছোবল মারতে চেষ্টা করে পাগলের মতো। যেগুলো বেঁচে আছে, বিড়ালের মতো সবুজ চোখ নিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে আক্রমণের উদ্দেশে। নটা হাঙ্গর ডেকের উপর ইতস্ততঃ ছড়ানো। ভারী সুতো টানাটানি আর দৈত্যগুলোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে পাঁচঘণ্টা পরিশ্রমের পর মাছ ধরায় ইস্তফা দিলাম শেষ পর্যন্ত।

পরের দিন মাত্র গোটা কয়েক টানি আর ডলফিনের দেখা মিলল। কিন্তু হাঙ্গরের সংখ্যা অগুণতি। আমরা আবার হাঙ্গর ধরতে লেগে গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বন্ধ করে দিতে হল। নতুন ধরা হাঙ্গরদের রক্ত যতই জলে গড়িয়ে পড়ছে, রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঝাঁকের পর ঝাঁক হাঙ্গর এসে ভেলার কাছে লাফালাফি শুরু করে দিল। আমরা সবকটা রক্তাক্ত ও বিশ্রী আহত হাঙ্গরকে জলে ফেলে দিয়ে পাটতনের রক্তটক্ত সব ধুয়ে মুছে ফেললাম। নতুন সোনালী হলুদ বাঁশের চাটাই বেশ কয়েক প্রস্থ পাটাতনের উপর বিছিয়ে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললাম।

পরে যখনই এইসব সন্ধ্যার কথা ভাবি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে রক্তধারা আর হিংস্র লোভাতুর হাঙ্গরের ছবি—মুখ হাঁ করে যেন গিলতে আসছে। হাঙ্গরের মাংসের গন্ধও নাকে লেগে থাকে। হাঙ্গর খাওয়া যায়—খেতে কড জাতীয় সামুদ্রিক মাছের মতো স্বাদ। টুকরো করা হাঙ্গরের দেহ চব্বিশ ঘণ্টা সমুদ্রের জলে ভিজিয়ে রাখলে দেহ থেকে অ্যামোনিয়া জাতীয় পদার্থ ক্ষরিত হয়। কিন্তু হাঙ্গরের তুলনায় বনিটো ও টানির মাংস খেতে ঢের বেশি সুস্বাদু।

সেদিন সন্ধ্যায় সর্বপ্রথম কানে এল আমাদের মধ্যে কে একজন বলছে—আর বেশি দেরি নেই, শীগগিরই তালীবৃক্ষ শোভিত দ্বীপে সবুজ ঘাসের বিছানায় হাতপা টান টান করে ছড়িয়ে শুতে পারব। আঃ কি আরামের হবে তা! ঠাণ্ডা মাছ আর উত্তাল সমুদ্র দেখতে দেখতে চোখে হেদিয়ে উঠেছে।

আবহাওয়া আবার আগের মতো শান্তমূর্তি ধারণ করেছে। কিন্তু আগের মতো আর নির্ভরযোগ্য বা অপরিবর্তনীয় নয়। হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড দাপটে দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে, যা একেবারে হিসেব-নিকেশের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে মুষল ধারা-বর্ষণ। এই ধারা বর্ষণে খুশিই হই। কারণ আমাদের পানীয়-জলের বেশির ভাগ খারাপ হয়ে পড়েছে। যে-জল আছে তাতে বদ্ধ জলের দুর্গন্ধ। যখন সব থেকে তীব্র ধারা-বর্ষণ শুরু হয়, আমরা কেবিনের ছাদে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করি। ডেকের উপর উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকি—ভিজতে ভারি আনন্দ হয়। টাটকা বৃষ্টির জলে গায়ের লেগে-থাকা নুন ধুয়ে মুছে যায়।

আবার পাইলট মাছেরা তাদের নির্দিষ্ট স্থানে যথারীতি কিলবিল শুরু করেছে।

তীব্র লড়াইয়ের সময় পালিয়ে যাওয়া পুরানো দল রক্তস্নানের পর আবার ফিরে এসেছে, অথবা নতুন দল কিনা—বলা কঠিন।

২১শে জুলাই। হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। আবহাওয়া ভীষণ থমথমে—পীড়াদায়ক। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি এ কিসের প্রাক সঙ্কেত। পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে কয়েকবার ভীষণ দমকা হাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে আবার ঝির ঝিরে হাওয়া বইতে লাগল। দিকচক্রবালে ভয়াল কালো মেঘের দ্রুত সমাবেশ শুরু হয়ে গেছে। হেরমান বায়ুর গতি মাপার যন্ত্র নিয়ে অনবরত ভিতর-বাহির করছে। প্রস্তুত হয়ে আছে সে আসন্ন পরিস্থিতির জন্য। প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশ ফুট ও আরও কিছু বেশি বায়ুর গতিবেগের মাপ নেওয়া হয়েছে। হঠাৎ টরস্টেইনের স্লিপিং-ব্যাগ ভেলার উপর থেকে জলে উড়ে পড়ে গেল। তারপর পরবর্তী কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে যা ঘটল, তা বলতে যত সময় লাগল তার চেয়ে দ্রুততর বেগে ঘটে গেল।

হেরমান উড়ে যাবার সময় ধরতে চেষ্টা করেছিল ব্যাগটা। কাজটা অবিবেচকের হয়েছিল। কারণ সে-ও ধপাস করে পড়ে গেল জলে। আমরা শুধু দেখতে পেলাম হেরমানের মাথাটা, এক জোড়া আন্দোলিত হাত আর তার চারপাশে অস্পষ্ট সবুজ কি একটা ঘুরপাক থাচ্ছে চক্রাকারে। হেরমান উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করছে ভেলার কাছে আসবার জন্য। ভেলার বামপাশে উত্তাল তরঙ্গে সে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত। দাঁড়ে ছিল টরস্টেইন ভেলার পিছন দিকে আর আমি ছিলাম ভেলার সামনের দিকে। আমরা দুজনেই ব্যাপারটা প্রথম দেখতে পাই। ভয়ে তো তখন আমাদের নাড়ি ছেড়ে যাবার মতো অবস্থা। আমরা আর্ত চিৎকার করে উঠলাম, 'মানুষ জলে পড়ে গেছে'। গলায় যত জোর আছে তত জোরে। আমরা নিকটতম প্রাণরক্ষার সাজসরঞ্জামের দিকে ছুটে গেলাম। অন্যেরা সমুদ্রের গর্জনের জন্য হেরমানের চিৎকার শুনতে পায়নি। কিন্তু মুহূর্তে ডেকের উপর জীবনের চাঞ্চল্য ও ছুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। হেরমান দক্ষ সাঁতারু। বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে যদিও তার জীবন বিপন্ন, তাহলেও হয়ত সে সাঁতরে ভেলার কাছে এসে পৌঁছবে—মহাসর্বনাশ ঘটার আগেই।

টরস্টেইন সব থেকে কাছে ছিল। সে বাঁশের ডোলটা জাপটে ধরল। এটার গায়েই জড়ান আছে দড়ি, যা আমাদের লাইফ বোট অর্থাৎ জীবন রক্ষা করার নৌকো হিসেবে ব্যবহৃত হবে। হাতের নাগালের কাছেই ছিল। এই সামুদ্রিক অভিযানে সর্বপ্রথম এই দড়িটা ব্যবহার করা হল। হেরমান তখন ভেলার পিছন দিকের সঙ্গে এক রেখায় ছিল—তবে কিছুটা দূরে। তার বাঁচার একমাত্র আশা যদি সে দাঁড়ের ফলকটা কোন মতে ধরে ঝুলে থাকতে পারে। সে ভেলার কাঠ ধরতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারল না। এটাই একমাত্র ভরসা ছিল, কিন্তু হাত ফসকে গেল। এখন সে এমন জায়গায় চলে গেল, যেখান থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে আর তাকে বাঁচানোর

কোন সম্ভাবনা নেই। আমি আর বেণ্ট ডিঙ্গি নামালাম জলে। নুট আর এরিক লাইফ-বেণ্ট ছুঁড়ে দিল। কেবিনের ছাদে লম্বা দড়ি সঙ্গে বাঁধা এই লাইফ বেণ্ট সব সময় ঝোলান থাকে সঙ্কট-মুহূর্তের জন্য। হায়, দড়িটা ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপটায় আবার ভেলায় উড়ে এসে পড়ল। চলল কয়েকবার অসফল চেষ্টা। হেরমান তখন দাঁড় থেকে সরে গেছে অনেক দূরে, পাগলের মতো সাঁতরাচ্ছে সে ভেলার সঙ্গে তাল রেখে আসতে। কিন্তু বাতাসের প্রতিটি ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বাঁচার একমাত্র ক্ষীণ আশা ডিঙ্গিটা—যেটাকে এখন আমরা জলে নামাতে পেরেছি। দড়ি ছাড়াই। কিন্তু দড়িটা ব্রেকের কাজ করত—এখন আমরা হয়ত রবারের ভেলাটা তার কাছে নিয়ে যেতে পারব কিন্তু আর কন-টিকির কাছে ফিরে আসতে পারব কিনা, ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে। যাহোক ডিঙ্গিতে তিনজন আরোহীর পক্ষে বাঁচার তবু আশা আছে, কিন্তু একক বাঁচার আশা দূরন্ত।

হঠাৎ নুটকে দেখলাম সরাসরি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক হাতে লাইফ বেণ্ট, দ্রুত সাঁতার কেটে চলেছে। যখন ঢেউ-এর চূড়োয় হেরমানকে দেখি, নুট বেপাত্তা। আবার নুটকে যখন ঢেউ-এর মাথায় দেখি, হেরমানকে কোথাও দেখতে পাই না। হঠাৎ দুটো মাথা এক সঙ্গে হয়েছে দেখতে পেলাম—দুজনে লাইফ বেণ্ট চেপে ধরে আছে। নুট হাত নাড়ছে। ইতিমধ্যে রবারের ডিঙ্গিটাকে ভেলার উপর টেনে তুললাম। আমরা চারজনে মিলে তখন লাইফবেণ্ট-দড়িটা ধরে সবলে টানতে লাগলাম—অমূল্য দুটো প্রাণ বাঁচাতে। এদের দু জনের পিছনে কালো একটা বস্তুর দিকে আমাদের দৃষ্টি আটকে গেল। জলের এই রহস্যময় প্রাণীটা বিরাট একটা সবজে কালো-ত্রিভুজকে ঢেউ-এর চুড়োর উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে। নুট যখন হেরমানের দিকে এগোচ্ছিল, সেও দেখতে পেয়েছিল বস্তুটাকে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল সে। একমাত্র হেরমান জানত—ঐ ত্রিভুজটা হাঙ্গর বা কোন সমুদ্র-দানবের নয়। ওটা হল টরস্টেইনের বায়ু ভরতি ফোলা স্লিপিং-ব্যাগটা। কিন্তু স্লিপিং-ব্যাগটা বেশিক্ষণ আর ওভাবে ফুলে থাকেনি। বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদের দুজনকে নিরাপদে ভেলার উপর টেনে তোলা হল। যে-প্রাণীটা এবার স্লিপিং-ব্যাগটা নিয়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল, সে জানতেও পারল না একটা ভালো শিকার তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

'ভাগ্যিস, আমি ওতে ছিলাম না', বলল টরস্টেইন। এবার সে ছেড়ে দেওয়া দাঁড়টা আবার হাতে তুলে নিল।

কিন্তু এছাড়া সেদিন বিকেলে আর বড় রকমের কোন বুদ্ধি-হারানো বিপদ ঘটেনি। তবে বহুক্ষণ আমাদের মেরুদণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের ভিতর দিয়ে হিমেল জল ওঠানামা করল। ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছি সবাই। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ—ছয়জন ভেলাযাত্রীর কাউকেই আজ হারাতে হয়নি।

নুটকে সেদিন প্রশংসাসূচক অনেক কিছু বলার ছিল। হেরমান ও বাকি সবাইকার সম্বন্ধেও।

কিন্তু যা ঘটে গেছে, সে-সম্বন্ধে আর বেশি চিন্তা করার অবসর ছিল না আমার। কারণ আবার আকাশ মসীকৃষ্ণ ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে প্রভঞ্জনের দাপটও দ্রুত বেড়ে চলেছে। রাত ঘনিয়ে আসার আগেই নবোদ্দমে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। আমরা শেষ পর্যন্ত জীবন-ত্রাতা দড়িটাকে ভেলার পিছন দিকে লম্বা দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে সক্ষম হলাম। কেউ যদি আবার জলে ছিটকে পড়ে— দাঁড়ের পিছনে এমন কিছু রইল যার দিকে সে সাঁতরে যেতে চেষ্টা করতে পারবে। রাত্রি আসার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভেলা ও সমুদ্র হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারে। আর আমরা সেই ভয়াল অন্ধকারে একবার ঢেউ-এর চূড়োয় উঠছি নামছি—এইভাবে দাপাদাপি অবস্থায় ভেসে চলেছি। ক্রুদ্ধ বাতাস হু-হু গর্জনে ছুটে চলেছে, পাল ও পালের দড়ি দুরন্ত বেগে নাড়িয়ে দিচ্ছে অনবরত, মাঝে মাঝে তীব্র আক্রোশে আছাড়ে পড়ছে কেবিনের ছাদে। এই বুঝি সবসুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে জলে ফেলে দেবে—এই ভয়ে-আতঙ্কে কাঁটা হয়ে আছি। কিন্তু ক্যানভাস ও দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধা আছে ভেলার সঙ্গে। কন-টিকি সমুদ্রে ভীষণ দোল খাচ্ছে। ভেলার কাঠগুলো ঢেউ-এর সঙ্গে অনবরত ওঠানামা করছে যন্ত্রের চাবির মতো। সব থেকে বিস্ময়ের কথা, ভেলার কাঠের ফাঁক দিয়ে ফোয়ারার মতো জল বক বক করে ঠেলে উপরে উঠছে। অনেকটা হাঁপরের মতো যার ভিতর দিয়ে স্যাঁত-স্যাঁতে হাওয়া বেগে ওঠানামা করছে।

একটানা পাঁচ দিন এই রকম বিশ্রী আবহাওয়া চলল। কখনও বাতাস ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে— কখনও মন্থর গতিতে। সমুদ্রের বুক কেটে বিরাট উপত্যকা তৈরি হচ্ছে আর সেই উপত্যকা ফেনায়িত ধূসর নীল ঢেউ-এর বাষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চম দিনে আকাশের বুকে ফাটল দেখা দিল—সেই ফাটলে নীলের আভাস ঝলমলিয়ে উঠল। বিশিষ্ট কালো মেঘপুঞ্জ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল চির বিজয়ী নীল আকাশের কাছে। তখনও একটানা ঝড় বয়ে চলেছে। এই ঝড়ে আমাদের হাল গুঁড়িয়ে গেছে—পালও ছিন্নভিন্ন। সেন্টার বোর্ডগুলো আলগা হয়ে গেছে—শাবকের মতো কাঠের গায়ে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। কারণ ভেলার নিচে যে-দড়ি দিয়ে আঁটসাট করে বাঁধা ছিল তারা— ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে গেছে সেই দড়ি। কিন্তু আমরা মানুষ কজন আর রসদ-টসদ এখনও অটুট আছি।

দুটো ঝড়ের আক্রমণের পর কন-টিকির বন্ধন-গ্রন্থিগুলো দুর্বল শিথিল হয়ে পড়েছে যথেষ্ট। ঢেউ-এর খাড়াই-উৎরাই বেয়ে অনবরত ওঠানামা করতে করতে দড়িগুলোর উপর ভীষণ টান পড়েছে—সদা কর্মচঞ্চল কাঠগুলোর গায়ে দড়ি কেটে বসেছে।

ভগবানকে ধন্যবাদ আমরা ইনকাদের প্রচলিত নিয়ম মেনে চলেছি—তারের দড়ি ব্যবহার করিনি। করলে এতক্ষণে দেশালাইয়ের কাঠির মতো কাঠগুলোকে করাত-কাটা করে ফেলত। যদি গোড়াতে হাড়ের মতো শুকনো খটখটে ভাসমান বালসা কাঠ ব্যবহার করতাম, তবে তাহলে সমুদ্রের জলে সংপৃক্ত হয়ে ভেলা তলিয়ে যেত জলের তলায়। টাটকা কাঠের মধ্যে যে প্রাণরস থাকে তাই বালসা কাঠকে দুর্ভেদ্য করে রাখে বলে ছিদ্রবহুল বালসা কাঠের ভিতরে জল ঢুকতে পারে না।

এখন দড়ি এত আলগা হয়ে পড়েছে, যে-কোন মুহূর্তে দুটো কাঠের মধ্যে পা ঢুকে যাওয়ার বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে—আর ঢুকলেই পা মচাং করে ভেঙ্গে যাবে। সামনে বা পিছনে যেখানে বাঁশের বাখারির পাটাতন নেই, সেখানে আমাদের দুটো কাঠের উপর হাঁটু ভেঙ্গে পা ফাঁক করে নিজেকে খাড়া রাখতে হচ্ছে। পিছনের দিকের কাঠগুলো ভয়ঙ্কর পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। যেমন ভিজে সামুদ্রিক আগাছায় কলার পাতা পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। আমরা একটা চওড়া তক্তা দুটো কাঠের উপর পেতে দিয়েছি দাঁড়ে যে থাকবে তার দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু যখন সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেলায় আঘাত করছে, তখন ঠিক মতো খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ছে তার পক্ষে। ভেলার ন-টা বিরাট বিরাট কাঠের বাঁ পাশের একটা এত আলগা হয়ে পড়েছে যে আড়াআড়ি কাঠের গায়ে দিনরাত অনবরত দুম দুম শব্দে আঘাত করছে। মাস্তুলের মাথায় যে আড়াআড়িভাবে লগা বাঁধা আছে দড়ি দিয়ে সেখান থেকে ভয়-জাগানো ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ উঠছে নতুন করে। মাস্তুলে ওঠার যে সিঁড়ি আছে, তা দুটো আলাদা লগার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দাঁড়ের দণ্ডটা দুটো তক্তার মাঝখানে রেখে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে লোহার মতো শক্ত গড়ান কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। এরিক ও বেণ্ট নতুন করে পাল তৈরি করে দিল। কন-টিকি আবার মাথা উঁচু করে পালের বুক ফুলিয়ে পলিনেশিয়ার দিকে এগিয়ে চলল আর দাঁড়টা ভেলার পিছনে নাচতে লাগল মনের খুশিতে। বাতাস মৃদুমন্দ বইছে। সমুদ্র শান্ত, নিস্তরঙ্গ। কিন্তু দুই কাঠের মাঝখানের কাঠের ফলক বা সেণ্টার বোর্ডগুলোকে আর আগের মতো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা গেল না। এরা সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে জলের চাপ সহ্য করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। ভেলার তলায় ঢুকে দড়ি পরীক্ষা করাও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে—কারণ দড়ির গা সম্পূর্ণ আগাছায় ঢেকে গেছে। সমস্ত বাঁশের পাটাতন তুলে দেখা গেল তিন জায়গায় ভেলার প্রধান দড়ি ছিঁড়েছে—দলামলা পাকিয়ে মালপত্তরের ঘষটায় দড়ির এই দুরবস্থা। কাঠের কাণ্ডগুলো প্রচুর জল শুষে নিয়েছে দেখলেই বোঝা যায়। তবে মাল পত্তরের ভার অনেক হালকা হয়ে পড়ায় এ বিপদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলাম না। আমাদের পানীয় জল ও খাবার-দাবার বেশির ভাগটাই ফুরিয়ে এসেছে। রেডিও-

অপারেটারদের ড্রাই ব্যাটারির অবস্থাও তথৈবচ।

যাহোক ঝঞ্ঝাবাত্যার পর এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—আমাদের আর এভাবে খুব বেশি-দিন সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে হবে না। দ্বীপের দূরত্ব খুব বেশি নয়। এবার যে-সমস্যা দেখা দিল তা হল, আমাদের অভিযানের কি ভাবে সমাপ্তি ঘটবে। পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কন-টিকি একদিন সুনিশ্চিত কোন কঠিন শিলাগাত্রে বা কোন অনড় পদার্থের গায়ে সজোরে ধাক্কা খেয়ে থেমে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাতে তো আমাদের অভিযানের সুষ্ঠু সমাপ্তি হল না। আমাদের অভিযানের সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি হবে তখনই, যখন প্রত্যেকে আমরা বহাল তবিয়তে নিরাপদে অবতরণ করব পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কোন একটি দ্বীপে।

শেষ ঝঞ্ঝা কাটিয়ে আসার পর ভেলা শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছতে পারবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। আমরা এখন মারকুয়েসাস ও তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জের ঠিক মাঝামঝি কোথাও এসেছি। এর অর্থ—আমরা এই দুই গোষ্ঠীর কোন দ্বীপের কারুরই দর্শন না পেয়ে সোজা এগিয়ে যেতে পারব। মারকুয়েসাস দ্বীপপুঞ্জের নিকটতম দ্বীপটি আমাদের কাছ থেকে তিনশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আর তুয়ামোতুর নিকটতমটি তিনশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এদিকে বাতাস ও স্রোতের মতিগতিও অনিশ্চিত। সাধারণভাবে পশ্চিমমুখো চলেছে এই দুই গোষ্ঠীর দ্বীপের মাঝখান দিয়ে দুয়ের—মধ্যে ব্যবধানও সুবিশাল।

উত্তর-পশ্চিমের নিকটতম দ্বীপটির নাম—ফাতুহিভা। জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতসঙ্কুল ছোট্ট দ্বীপ। এখানেই আমি সমুদ্র-উপকূলে কাঠের পাঁজার ছোট্ট কুটীর তৈরি করে বাস করেছি। বুড়োর মুখ থেকে শুনেছি তাদের প্রাচীন বীরশ্রেষ্ঠ টিকির কত গল্প। এখন কন-টিকি যদি সেই উপকূলে ভেড়ে, অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। বুড়োর সঙ্গে হয়ত দেখা হবে না। সে নিশ্চয়ই বহুদিন আগে লোকান্তরিত হয়েছে। তার সত্যিকার টিকির সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে আর এক জগতে। মারকুয়েসাস দ্বীপের পর্বতশ্রেণীর দিকে ভেলা যদি এগিয়ে যায়, দেখতে পাবে দ্বীপপুঞ্জের স্বল্পসংখ্যক দ্বীপগুলো এক সারিতে দূরে দূরে অবস্থিত আর সমুদ্রের তরঙ্গ খাড়া পাহাড়ের গায়ে অপ্রতিহত গতিতে ভেঙ্গে পড়ছে অনবরত। আমাদের সবসময় সতর্ক দৃষ্টি মেলে সজাগ থাকতে হবে, যদি সঙ্কীর্ণ খাঁড়ির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় উপত্যকার দিকে। তটদেশ অতি সঙ্কীর্ণ—এক চিলতে মাত্র জায়গা।

তুয়ামোতু গোষ্ঠীর প্রবাল দ্বীপের দিকে অগ্রসর হয় যদি ভেলা, এখানে দেখা যাবে বহু দ্বীপের জটলা—সমুদ্রের অনেকখানি জায়গায় জুড়ে। কিন্তু এই দ্বীপপুঞ্জকে বলা হয় নিচু বা বিপজ্জনক দ্বীপপুঞ্জ। কারণ সমগ্র সংগঠনটি প্রবাল প্রাণীর দেহনিঃসৃত চুনজাতীয় পদার্থের তৈরি। কোথায় যে বিপজ্জনক প্রবাল দ্বীপ জলের নিচে ঘাপটি মেরে

আছে, কেউ জানে না। আর দেখা যাবে তালীবৃক্ষ শোভিত বলয়াকার দ্বীপ এখানে ওখানে, যার মাঝখানে আছে উপহ্রদ। এই দ্বীপগুলোও জলের উপর ছয় থেকে দশ ফুট মাত্র মাথা জাগিয়ে উঠেছে। এই দ্বীপগুলোকে আবার বেষ্টন করে আছে প্রবাল প্রাচীর। যেন এই দ্বীপের পাহারাদার। জাহাজের পক্ষে ভীষণ বিপজ্জনক সারা এলাকা। প্রবাল কীটেরা এই বলয়াকার দ্বীপ বা অ্যাটলগুলো গড়েছে ধরে নিলেও মারকুয়েসাস দ্বীপপুঞ্জ মূলত নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির ধ্বংসাবশেষ। এই দুই গোষ্ঠীর দ্বীপেই বাস করে পলিনেশীয় জাতির লোকেরা। দু-জায়গারই রাজকীয় গোষ্ঠীর পরিবাররাও টিকিকেই পূজো করে তাদের আদি পুরুষ বলে।

৩রা জুলাই। তখনও আমরা পলিনেশিয়া থেকে হাজার মাইল দূরে। প্রকৃতিই একমাত্র আমাদের বলতে পারে যেমন একদিন বলেছিল পেরুর প্রথম ভেলাযাত্রীদের—কোথায় সমুদ্রে স্থলভাগের অস্তিত্ব আছে। পেরুর উপকূল থেকে বেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে আসার পর প্রথম আমরা সমুদ্রবিহারী শঙ্খচিলের ছোট ছোট ঝাঁক দেখতে পেয়েছি। তারা ১০০° ডিগ্রী পশ্চিমে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু ৩রা জুলাই ১২৫° ডিগ্রী পশ্চিমে আবার তাদের দেখতে পেলাম। এরপর থেকে হামেশাই তাদের ছোট ছোট দলে দেখতে পেতাম। কখনও আকাশের বুকে, কখনও বা তীর বেগে নেমে আসছে ঢেউয়ের চূড়োয়। ডলফিনের হাত থেকে রেহাই পেতে যে-সব উড়ুক্কু মাছ বাতাসে ছিটকে উঠছে, তাদের ছোঁ মেরে আক্রমণ করছে। এইসব পাখিরা নিশ্চয়ই আমাদের ভেলার পিছু পিছু আমেরিকা থেকে আসছে না! ধরে নিতে হবে এদের দেশ কাছাকাছি সামনে কোথাও হবে।

১৬ই জুলাই। প্রকৃতি নিজেকে আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা দিল। সেদিন একটা ন-ফুট লম্বা হাঙ্গরকে ভেলার উপর টেনে তোলা হয়েছে। তার পেটের ভিতরে একটা হজম না-হওয়া তারামাছ পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই সমুদ্রউপকূলের কোথাও থেকে সংগৃহীত।

পরের দিন পলিনেশিয়ার দ্বীপ থেকে সোজাসুজি আসা প্রথম আগন্তুকের সাক্ষাৎ পেলাম।

ভেলা-বিহারীদের পক্ষে আজ এক মহা উৎসবের দিন। পশ্চিমে দিগন্ত-রেখার উপরে দুটো গণ্ডমূর্খ নিচু দিয়ে উড়ে এসে আমাদের মাস্তলের উপরে চক্রাকারে ঘুর পাক খেতে লাগল। পাখি দুটোর বিস্তৃত ডানার পরিধি পাঁচ ফুট হবে। তারপর ডানা মুড়ে তারা জলের উপর বসল—আমাদের ভেলার পাশেই। ওদের দেখামাত্র তীরবেগে ছুটে এল ডলফিনরা। বিরাট পাখিদুটোর চারপাশে কিলবিল করতে লাগল কিন্তু কেউই অপরকে আঘাত করল না। এরাই প্রথম অগ্রদূত যারা আমাদের পলিনেশিয়ার সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে। বিকেলেও ডাঙায় ফিরে গেল না—সমুদ্রের জলেই

বিশ্রাম নিতে লাগল। মাঝরাতের পরেও তাদের কর্কশ চিৎকার শুনতে পেলাম—তখনও তারা মাস্তুলের চারপাশে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

এবার যে উড়ুক্কু মাছেরা পাটাতনের উপর এসে উড়ে পড়ল, তারা আকারে বড় এবং ভিন্ন জাতের। ফাতুহিভার উপকূলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে এদের দেখেছি আমি। আরও তিন দিন ও তিন রাত ধরে আমরা ফাতু হিভার দিকে সোজা এগিয়ে গেলাম। এবার ঈশান কোণ থেকে তীব্র বেগে বাতাস বইতে শুরু করল—আমাদের ভেলাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তুয়ামোতুর দিকে। এবার আমরা সত্যিকার দক্ষিণী নিরক্ষীয় স্রোতধারার গণ্ডী ছাড়িয়ে এলাম। আর প্রবাহমান সমুদ্র-স্রোতের উপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। এক দিন যে-দিকে তাদের প্রবাহিত হতে দেখা যায়, পরদিন আর তাদের পাত্তা মেলে না সেদিকে। স্রোতধারা অদৃশ্য নদীর মতো চারদিকে শাখা-প্রশাখান্বিত হয়ে প্রবাহিত হতে পারে। স্রোতের বেগ তীব্র হলে ঢেউ উঁচু হয়ে ওঠে। জলের তাপমাত্র ডিগ্রী খানেক নেমে যায়। এরিকের হিসেব করা নির্দিষ্ট অবস্থানের পার্থক্য অনুযায়ী স্রোতের গতিপথের ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পলিনেশিয়ার প্রবেশমুখে বাতাস যেন অনুমতি-পত্র দিয়ে বলল, 'এগিয়ে যাও'। উপহার দিল এক দুর্বল স্রোতধারা। এই স্রোতের গতি মরু অঞ্চলমুখী—দেখে তো ভয়ে আঁতকে উঠলাম আমরা। বাতাসও একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ছে না। আমাদের সমগ্র যাত্রাপথে এরকম অভিজ্ঞতা কখনই হয়নি। বাতাসের গতি খুব মন্থর হলে আমরা ছেঁড়া ন্যাকড়া-ট্যাকড়া যা পেতাম তাই খাটিয়ে দিতাম—যতটুকু বাতাস সংগ্রহ করা যায়। এমন একটা দিনও যায়নি যে আমরা পিছু হটেছি আমেরিকার দিকে। চব্বিশ ঘণ্টায় সব থেকে কম দূর এগিয়েছি—মাত্র নয় মাইল। তবে এই যাত্রাপথে ভেলার চব্বিশ ঘণ্টায় গতিবেগের গড়পরতা হিসেব হল সাড়ে বিয়াল্লিশ মাইল।

যা হোক শেষ মুহূর্তে অয়ন বায়ু আমাদের একেবারে পরিহার করেনি। আবার নবোদ্যমে কাজে নেমে পড়ল— এগিয়ে এল আমাদের সাহায্যে। ভগ্নপ্রায় ভেলাটাকে ধাক্কা মেরে নিয়ে চলল পৃথিবীর এক বিস্ময়কর অংশের দিকে।

যতই দিন যেতে লাগল বিপুল সংখ্যায় সমুদ্র-চারী পাখি দেখতে পাচ্ছি। তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে আমাদের মাথার উপরে নানান দিকে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যার মুখে অস্তমিত হতে সূর্য পাটে বসেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পাখিগুলো কেন যেন ভীষণ আবেগ প্রমোদিত হয়ে উঠেছে। তারা উড়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। আমাদের বা উড়ুক্কু মাছের দিকে কোন খেয়ালই নেই তাদের। মাস্তুলের মাথা থেকে দেখলাম—যেদিক থেকে এসেছিল ঠিক সেই দিকে সোজা এগিয়ে চলেছে। হয়ত

তারা উঁচু থেকে এমন কিছু দেখেছে, যা আমরা দেখতে পাইনি। হয়ত বা তারা সহজ প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে চলেছে। যা হোক, তারা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতো সোজা উড়ে চলেছে নিকটতম দ্বীপের দিকে—তাদের প্রজনন ক্ষেত্রের দিকে।

পাখিরা যে-দিকে উড়ে গেল আমরাও সেই দিকে ভেলার গতিমুখ ফেরালাম। অন্ধকার হয়ে গেলেও শুনতে পেলাম, তখনও পিছনে পড়েছিল যারা, তীব্র চিৎকারে তারাভরা আকাশ মুখরিত করে উড়ে চলেছে একই দিকে—সেদিকে এখন আমরাও চলেছি। অদ্ভুত রহস্যময় রাত। কন-টিকির যাত্রাপথে চাঁদ তৃতীয়বার প্রায় পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ তৃতীয় পূর্ণিমা তিথির দিকে।

পরের দিন আরও অনেক পাখি আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। কিন্তু আমরা সন্ধ্যার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ওদের প্রতীক্ষায় রইলাম না। এইসময় দিগন্ত রেখার উপরে অদ্ভুত এক নিথর মেঘপুঞ্জ দেখতে পেলাম। উলের আঁশের মতো ফ্যাসফেঁসে মেঘ দক্ষিণ থেকে আসছে আকাশের খিলান পার হয়ে কিন্তু অয়নবায়ুর ধাক্কায় পশ্চিমে দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তারা। ফাতু হিভার উপর অয়নবায়ু-তাড়িত চঞ্চল মেঘের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। কন-টিকির মাথার উপর দিয়েও কত দিন-রাত উড়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু নৈঋর্ত কোণে দিগন্ত-রেখার উপর নিঃসঙ্গ মেঘপুঞ্জ নিশ্চল হয়ে আছে গতিহীন ধোঁয়ার স্তম্ভের মতো, অথচ অয়নবায়ু চালিত মেঘের দল উড়ে চলে যাচ্ছে—এদৃশ্য কখনও চোখে পড়েনি। পলিনেশীয়রা জানত, এরকম মেঘের নিচেই থাকে স্থলভাগ। বিষুব অঞ্চলের সূর্যের তাপে গরম বালি রুটিসেঁকা হয়ে ওঠে—তপ্ত বালির সংস্পর্শে বাতাসও উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়, কিন্তু উপরের ঠাণ্ডা বায়ুস্তরের সংস্পর্শে এলে বাতাসের বাষ্পীয় অংশ আবার ঘনীভূত হয়ে পড়ে।

আমরা ঐ মেঘের দিকে এগিয়ে চলেছি। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মেঘও অদৃশ্য হয়ে গেল। বাতাস অচঞ্চল। দাঁড়টা শক্ত করে বেঁধে রাখলাম—কন-টিকি বিনা সাহায্যেই এগিয়ে চলেছে। দাঁড়ীর কাজ হল এখন মাস্তুলের মাথার তক্তার উপর বসে থাকা আর লক্ষ্য করা কোথাও ডাঙ্গার কোন চিহ্ন-টিহ্ন দেখা যায় কি না। বসার তক্তাটা ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে গেছে—চিকচিক করছে।

সারা রাত ধরে মাথার উপর পাখিদের কলকাকলি কানে তালা লাগিয়ে দেবার যোগাড় করল। চাঁদ প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার হয়ে উঠেছে!

॥ ৭ ॥

৩০শে জুলাইয়ের আগের রাত্রিতে কন-টিকির চারপাশে এক অভিনব ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। হয়ত মাথার উপর কানে তালা-লাগানো সামুদ্রিক পাখির এই চিৎকার-চেঁচামেচি একটা নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তারই আভাস দিচ্ছে।

পাখিদের নানা কণ্ঠের বিচিত্র চিৎকার উন্মত্ত প্রলাপের মতো শোনালেও প্রাণহীন দড়ির ক্যাঁচ-ক্যাঁচানির তুলনায় এ অনেকটা পার্থিব মনে হল। যে তিনটি মাস পিছনে ফেলে এলাম সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে শুনেছি, একমাত্র এই দড়ির ঘ্যাস-ঘ্যাস আওয়াজ। মাস্তুলের মাথার উপর থেকে দেখলে চাঁদকে আরও বড়—আরও গোলাকার মনে হয়। মনের কল্পলোকে দেখতে পাচ্ছি—তালীবৃক্ষের পাতায় চাঁদের কিরণ এসে পড়েছে—একটা আতপ্ত রোমাঞ্চের সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের ঠাণ্ডা মাছের গায়ে এমন পীত আলো কখনও ঝড়ে পড়তে দেখা যায় নি।

ছটার সময় মাস্তুলের মাথা থেকে বেণ্ট নেমে এলেন। হেরমানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে কেবিনের ভিতরে ঢুকে গেলেন। হেরমান যখন কিচমিচ শব্দকরা, দোলখাওয়া মাস্তুলের মাথায় উঠে বসল, তখন সবে প্রভাতের ঘুম ভেঙ্গেছে। দশ মিনিট পরেই হেরমান আবার দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। নেমে এসে আমার পা ধরে টানাটানি করতে লাগল।

'বাইরে এস, তোমার দ্বীপকে দেখবে চল'!

হেরমানের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। আমি এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। বেণ্টও আমার পিছন পিছন এলেন। তিনি তখনও ঘুমিয়ে পড়েন নি। আমরা পিঠে-পিঠি প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করে যেখানে মাস্তুলের দণ্ড দুটো আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা তার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। আমাদের চারপাশে পাখির মেলা। আকাশের গায়ে একটা আবছা বেগুনী নীল আবরণ—মিলিয়ে-যাওয়া রাতের শেষ চিহ্ন। কিন্তু পুবে সারা দিগন্তের কোলে একটা রক্তাভ আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে। আর দূরে দক্ষিণ-পুবে রক্ত লাল পটভূমিকায় একটা ক্ষীণ ছায়া। অনেকটা নীল পেন্সিলের দাগের মতো সমুদ্রের কিনারায় কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়েছে।

ডাঙ্গা! দ্বীপ! ক্ষুধিত দৃষ্টি দিয়ে আমরা দৃশ্যটা যেন গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম, বাকিদেরও ঘুম থেকে জাগালাম। তারা প্রায় হোঁচট খেতে খেতে ঘুম-জড়ানো চোখে বাইরে বেরিয়ে এল। চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ভেবেছে আমাদের ভেলা বুঝি তীরে ভেড়বার যোগাড় করেছে। দূরে দ্বীপের দিকে কলকাকলি মুখরিত পাখির ঝাঁক আকাশের বুকে একটা সেতু রচনা করেছে। তীক্ষ্ণ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দিগন্তের লাল পটভূমিকায়। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তের পটভূমিকা লাল থেকে সোনার বর্ণ ধারণ করেছে। নতুন দিনের শুভ সূত্রপাত।

আমাদের প্রথম ভাবনা হল—দ্বীপটা যেখানে থাকা উচিত সেখানে নেই। দ্বীপটা তো আর ভেসে ভেসে সরে যেতে পারে না। আমাদের ভেলাটাই তাহলে রাতের বেলা উত্তরমুখো স্রোতের পাল্লায় নিশ্চয় পড়েছে। একবার সমুদ্রের দিকে চোখ বুলালেই তরঙ্গের গতিপথ দেখে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। রাতের

অন্ধকারে আমরা সুযোগ হারিয়েছি। আমরা এখন যেখানে আছি, বাতাস কিছুতেই ভেলাটাকে দ্বীপের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে দেবে না। তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জের চারপাশে স্থানীয় প্রবল সামুদ্রিক স্রোতের আনাগোনা—যা দ্বীপের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সব দিকেই আবর্তিত হয়ে উঠছে। লেগুন ও প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে জোয়ার-ভাঁটার সময় আসা-যাওয়া করা সমুদ্রের ঊর্মিমালার প্রচণ্ড সংঘাতে এই স্রোতের পরিবর্তন ঘটে নানা দিকে।

আমরা জলে দাঁড় ফেললাম কিন্তু ভালো ভাবেই জানি, ব্যর্থ এ চেষ্টা। সাড়ে ছটার সময় সূর্য সমুদ্র থেকে উঠে সোজা ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে এগোতে লাগল। বিষুব অঞ্চলে এটাই রীতি। দ্বীপটা এখনও কয়েক মাইল দূরে রয়েছে—দেখাচ্ছে যেন দিগন্তের কাছে এক ফালি বন গুঁড়ি মেরে পড়ে আছে। সঙ্কীর্ণ হালকা রঙয়ের সমুদ্র-সৈকতের পিছনে গাছগুলো গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছ-গুলো এত ছোট যে মাঝেমাঝেই সমুদ্রের ঢেউয়ের পিছনে হারিয়ে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ান্তর। এরিকের মানচিত্রের মতে দ্বীপটার নাম পুকা পুকা। তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জের প্রথম সীমান্ত ফাঁড়ি। 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্র যাত্রার নির্দেশিকা—১৯৪০,' আমাদের সঙ্কলিত দুটে স্বতন্ত্র মানচিত্র আর এরিকের 'নিজস্ব পর্যবেক্ষণ—সব কিছু মিলিয়ে দ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে চার রকম আলাদা আলাদা মত পাওয়া গেল। তবে আশেপাশে আর কোন দ্বীপ না থাকায় স্থির সিদ্ধান্তে এলাম, আমাদের দেখা দ্বীপটাই পুকা পুকা দ্বীপ।

ভেলার উপর কোন উচ্ছৃঙ্খল মন্তব্য শোনা গেল না। পালটা সুবিন্যস্ত করে খাটিয়ে দাঁড় ফেলা হল। মাস্তুলের মাথায় ও ডেকের উপর অবাক দৃষ্টি মেলে সবাই দাঁড়িয়ে। হঠাৎ অসীম সার্বভৌম সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে উঠেছে একটা ডাঙ্গা। এবার মনে হল—আমরা এতদিন অনাদি অনন্ত চক্রাকার দিগন্তের কেন্দ্রে ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াইনি। মাসের পর মাস আমরা সোজা এগিয়ে চলেছি এক রেখায়। মনে হল দ্বীপটা বুঝি গতিশীল। হঠাৎ যে নীল ও শূণ্য সমুদ্রের বৃত্তে ঢুকে পড়েছি—তার কেন্দ্রে আছে আমাদেব চিরস্থায়ী আবাস। দ্বীপটা যেন আড়া-আড়িভাবে আমাদের এলাকা ছাড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে পূর্ব দিগন্তের দিকে। অবশেষে পলিনেশিয়ায় পৌছতে পেরেছি—এমনি একটা উষ্ম পরিতৃপ্ত ভাবনায় সবার মন ভরে উঠেছে। মাঝেমাঝে আবছা নৈরাশ্যও ছায়া ফেলছে মনে—তবে তা ক্ষণস্থায়ী। ওটা বুঝি কোন দ্বীপ নয়—দ্বীপের মায়া মরীচিকা। এই মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা অনন্তকাল ধরে ভেসে চলেছি সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে!

সূর্য ওঠার ঠিক পরে দ্বীপের নাভি-কেন্দ্রের বাঁ দিক থেকে গাছের মাথার উপর [illegible] কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠছে দেখতে পেলাম। আমাদের দৃষ্টি ঐ ধোঁয়ার

কণ্ডলীকে অনুসরণ করতে লাগল। ভাবলাম, দ্বীপবাসীরা ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশের ব্যবস্থা করছে। আমরা তখন ভাবতেই পারিনি স্থানীয় অধিবাসীদের ফাঁড়ির লোকেরা আমাদের দেখতে পেয়েছে। তারাই ঐ ধোঁয়ার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে দ্বীপে আসার আহ্বান জানিয়ে। সাতটা নাগাদ বোরাও কাঠ পোড়ানোর ক্ষীণ গন্ধ এসে নাকে ঝাপটা মারল। লোনা হয়ে যাওয়া নাসারন্ধ্রে শুড়শুড়ি দিতে লাগল। মুহূর্তে ফাতু হিভা দ্বীপের সমুদ্র-সৈকতে আগুন জ্বালানোর ঘুমিয়ে-থাকা স্মৃতি জেগে উঠল। আধ ঘণ্টা পরে সদ্য কাটা গাছের ও বনের গন্ধ পেলাম। দ্বীপটা ক্রমশঃ যেন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে—আমাদের পিছনে থাকায় মাঝেমধ্যে সেখান থেকে ক্ষীণ ঝিরঝিরে হাওয়া আসছিল। মিনিট পনের পরে আমি আর হেরমান মাস্তলের মাথায় উঠে দাঁড়ালাম—সবুজ পাতা ও শ্যামলিমার আতপ্ত গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে বুক ভরিয়ে দিতে লাগল। এই তো পলিনেশিয়া! তরঙ্গ ভঙ্গের মধ্যে তিরানব্বুইটি লবণাক্ত দিন অতিবাহিত করার পর এই প্রথম সুন্দর শুষ্ক মাটির গাঢ় গন্ধের স্বাদ পেলাম। বেণ্ট তাঁর স্লিপিংব্যাগে সুগভীর নিদ্রায় আবার নাসিকা গর্জন করে চলেছেন। এরিক টরস্টেইন কেবিনের ভিতরে চিত হয়ে শুয়ে—আপন চিন্তায় বিভোর। নুট ডেকের উপর এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। গাছগাছালির পাতার সুবাস নিচ্ছে নাকে আর ডাইয়ারির পাতা ভরে ফেলছে লেখায়।

সাড়ে আটটার পর পুকাপুকা আমাদের পিছনে সমুদ্রে অন্তর্হিত হয়ে গেল। প্রায় বেলা এগারটার সময় মাস্তলের মাথায় চেপে দেখলাম—পূবে দিগন্তের উপরে একটা ক্ষীণ নীল রেখা ভাসছে। তারপর সে-রেখাটাও অদৃশ্য হয়ে গেল। আকাশের বুকে উঠছে গুটি গুটি নিশ্চল জলদ মেঘপুঞ্জ। পুকা পুকা কোথায় অবস্থান করছে এ তারই নির্দেশিকা। পাখির ঝাঁকও অদৃশ্য। তুলনামূলক ভাবে তারা দ্বীপের প্রতিবাত দিকে উড়ে যেতে ভালোবাসে। সন্ধ্যাসমাগমে ভরপেট খেয়ে যখন ঘরমুখো হয়, তখন বাতাস তাদের অনুকূলেই প্রবাহিত হয়। ডলফিনরা এখন বিরলদৃশ্য হয়ে পড়েছে। ভেলার নিচে পাইলট মাছের সংখ্যাও হাতে গোণা যায়।

সেদিন রাতে বেণ্ট একটা চেয়ার টেবিলের জন্য বড়ই আকুতি প্রকাশ করলেন। কখনও চিত হয়ে, কখনও বা উপুর হয়ে একভাবে পড়তে বড়ই ক্লান্তি ধরে গেছে। এখনও তিনখানা বই পড়া শেষ করতে বাকি আছে। কাজেই এখন ডাঙ্গার দেখা না পেলে খুশিই হতেন তিনি। টরস্টেইনের হঠাৎ আপেল খাওয়ার ভারি লোভ হতে লাগল। রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি স্পষ্ট পেঁয়াজ ও মাছের কুচির প্রাণহরা সুস্বাদু গন্ধ পেয়েছি। কিন্তু দেখলাম একটা-ময়লা শার্ট থেকে গন্ধটা আসছে।

পরের দিন দেখতে পেলাম—দুটো রেল-ইঞ্জিনের বাষ্প উদগিরণের মতো দুটো নতুন মেঘ উঠে আসছে দিগন্তের নিচ থেকে। মানচিত্র থেকে জানতে পারলাম দুটো

প্রবাল দ্বীপ থেকে ঐ মেঘ সঞ্চারিত হচ্ছে। দ্বীপ দুটোর নাম ফানগাহিনা আংগাটাউ। আংগাটাউ-এর উপর সঞ্চারিত মেঘ আমাদের অনুকূল মনে হল। কারণ বাতাস জোরে বইতে শুরু করেছে—আমরাও ভেলাকে দ্বীপের দিকেই চালিত করলাম—সবেগে দাঁড় বাইতে লাগলাম ছপ ছপ করে। পলিনেশিয়ার অপূর্ব শান্তি ও স্বাধীনতা আমাদের মন-প্রাণ ভরিয়ে দিল। কন-টিকির বাঁশের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে জীবনটা সেদিন এত মধুময় ঠেকছিল যে, যাই কিছু ঘটুক না কেন আমাদের সমুদ্র অভিযানের যবনিকা পাতের আর যে দেরি নেই, তারই সুনিশ্চিত অনুভূতি মনকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলল।

তিন দিন তিন রাত আংগাটাউ-এর মাথার উপর মেঘের দিকে ভেলাটাকে চালনা করে নিয়ে চলেছি। অপূর্ব আবহাওয়া। শুধু দাঁড়ের উপর নির্ভর করে চলেছি। সমুদ্র-স্রোত আমাদের সঙ্গে কোনরকম ছলচাতুরী করেনি। চতুর্থ দিন সকালে টরস্টেইন চার থেকে ছ-ঘণ্টা পাহারার কাজের পর হেরমানকে দায়িত্ব-ভার থেকে অব্যাহতি দিল। কার্যভার বুঝিয়ে দেবার সময় হেরমান তাকে জানাল চাঁদের আলোয় সে একটা নিচু দ্বীপের বহিরেখা দেখতে পেয়েছে। সূর্য উঠলে একটু পরেই টরস্টেইন কেবিনের দরজা দিয়ে ভিতরে মুখ গলিয়ে বলল, 'সামনেই ডাঙ্গা'!

আমরা সবাই ডেকের উপর ছুটে এলাম। যা দেখতে পেলাম তাই দেখে সবগুলো পতাকা উত্তোলন করলাম। প্রথমে ভেলার পিছনে নরওয়ের পতাকা আর মাস্তুলের মাথায় ফরাসী পতাকা তুলে দিলাম। ফরাসী পতাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্য—এটা একটি ফরাসী উপনিবেশ। শীগগিরই ভেলায় যত দেশের পতাকা ছিল উড়িয়ে দেওয়া হল—টাটকা অয়ন বায়ুতে আমেরিকা ব্রিটেন পেরু ও সুইডেনের পতাকাগুলো পত্ পত্ করে উড়তে লাগল। এ ছাড়াও আছে অভিযাত্রী ক্লাবের পতাকা। কন-টিকি যে নতুন বেশে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে এতে আর কোন দ্বিমত নেই আমাদের মনে। দ্বীপটা এবার আমাদের গতি পথের আদর্শস্থানে অবস্থানে করছে। চারদিন আগে সূর্যোদয়ের সময় পুকাপুকাকে যেখানে দেখা গিয়েছিল সেখানে থেকে কিছু দূরে। আমাদের পিছনে আকাশের গায়ে সূর্য উঠতেই দ্বীপের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের পটে সবুজের উজ্জ্বল দীপ্তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এ আর কিছুই নয় চারধারে প্রবাল প্রাচীর বেষ্টিত লেগুন বা উপহ্রদের নিশ্চল বুকে সবুজের প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই রকম উপহ্রদ বেষ্টিত বলয়াকার অ্যাটল বা প্রবাল দ্বীপের মরীচিকা হাজার হাজার ফুট উঁচুতে মহাশূন্যে দেখা যায়। দিগন্তের পারে সত্যিকার দ্বীপের দর্শন মেলার বহু আগেই অতীতে সমুদ্র-বিহারীরা এই রকম দ্বীপের ছবি দেখতে পেত।

এবার আমরা ভেলার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ভার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে তুলে নিলাম। এবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্বীপের ঠিক কোন্ অংশে ভেলা ভেড়াব। এবার

আমরা বিচ্ছিন্ন গাছের মাথা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আলাদা আলাদা পরপর গাছের গুঁড়িও দেখতে পাচ্ছি। সূর্যের আলো গাছের গুঁড়িতে পড়ে ঝিকমিক করছে। গুঁড়িগুলো ঘন ছায়াঢাকা পাতার পশ্চাদ্‌পটে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা জানতাম আমাদের ও দ্বীপের মাঝখানে কোথাও মগ্ন চড়া আছে। এই নিরীহ দ্বীপের দিকে যা কিছু আসবে তার জন্য যেন ওত পেতে আছে সংগোপনে। এই প্রবাল প্রাচীর জলের গভীরে নিমজ্জিত। পূব থেকে আসা ফুলে-ওঠা ঢেউয়ের সারি এই মগ্ন প্রাচীরের উপর এলেই প্রচণ্ড জলরাশি ভারসাম্য হারিয়ে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, পরমুহূর্তেই আছড়ে পড়ছে নিচে—সঙ্গে সঙ্গেই উঠছে তীব্র গর্জন ও ফেনিল উচ্ছ্বাস। কত জাহাজ এই নিমজ্জিত তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জের প্রবাল প্রাচীরের ভয়াল আকর্ষণের টানে পড়ে প্রাচীর গাত্রে আঘাত খেয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

সমুদ্র থেকে এই শঠতাপূর্ণ ফাঁদের কোন হদিসই পাইনি। ঢেউ-এর গতির সঙ্গে তাল রেখে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। সামনে শুধু দেখতে পাচ্ছি ধনুকের মতো বাঁকা ঝিকিমিকি ঢেউয়ের পর ঢেউ দ্বীপের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামনে ধাবমান দীর্ঘ তরঙ্গমালার পৃষ্ঠদেশ, যা প্রবাল প্রাচীর ও ফেনিল ডাইনী-নাচ আড়াল করে রেখেছে চোখের সামনে থেকে। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণে দ্বীপের প্রান্ত বরাবর তটরেখা দেখতে পাচ্ছি। ডাঙ্গা থেকে কয়েকশ গজ দূরে সমুদ্রকে দেখাচ্ছে যেন টগবগ করে ফুটছে সাদা বিপুল জলরাশি—অনবরত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে শূন্যে।

দ্বীপের দক্ষিণ অংশ থেকে একটু দূরে ডাইনীর পাকশালার বাইরের ধার ঘেঁষে আমরা চালিয়ে নিয়ে চলেছি আমাদের ভেলা। আশা, সেখানে পৌঁছতে পারলে অ্যাটলের পাশ বরাবর ভেলাটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব দ্বীপের অনুবাতে নির্দিষ্ট বিন্দু ঘুরে, আমরা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আগে একটা জায়গায় পৌঁছব যেখানে জল এত অগভীর যে নোঙরের একটু অদল-বদল ঘটিয়ে ভেসে যাওয়া আটকাতে পারা যাবে। তারপর অপেক্ষা করব যতক্ষণ না বাতাসের গতি পরিবর্তিত হয়ে আমাদের দ্বীপের অনুবাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

দুপুরের দিকে দূরবীনের কাচের ভিতর দিয়ে দেখলাম—উপকূল ভাগে গাছপালা বলতে কচি কচি নারকেল গাছের সারি। মাথার পাতাগুলো গায়ে গায়ে লেগে আছে আর সামনের দিকে তরঙ্গায়িত ঝোপঝাড় ও লতাগুল্মের ঘন সন্নিবেশ। সমুদ্র সৈকতে বড় বড় প্রবালের চাঁই ইতস্ততঃ পড়ে আছে। এ ছাড়া কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই জীবনের—একমাত্র সাদা সাদা পাখিরা নারকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।

বেলা দুটোর সময় আমরা দ্বীপের অতি কাছে এসে পড়লাম—প্রবাল প্রাচীরের ঠিক বাইরে। যতই কাছে আসছিলাম ঢেউ-এর গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম প্রবাল প্রাচীরের গায়ে ভেঙ্গে পড়া অবিরাম জলপ্রপাতের শব্দের মতো। যেন ভেলার ডান পাশে একটা অনন্ত প্রসারী এক্সপ্রেস ট্রেন মাত্র কয়েকশ' গজ দূর দিয়ে সমান্তরালে ছুটে চলেছে। আমরা পর্যন্ত এখন সাদা জলের স্প্রে দেখতে পাচ্ছি—হামেশাই ভেঙ্গে পড়া তরঙ্গের পিছনে ছিটকে উঠছে উর্দ্ধে বাতাসে ঠিক যেখান দিয়ে গর্জায়মান ট্রেনটা ছুটে চলেছে।

একই সময়ে দু-জন দাঁড়ে দাঁড়িয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করছিল ভেলার। বাঁশের কেবিনের পিছনে তারা। তাই সামনের কোন কিছুই ভালো দেখতে পাচ্ছে না। এরিক নাবিকের মতো রন্ধন-বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়ী দুজনকে নির্দেশ দিচ্ছে কোন দিকে এগুতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা—বিপজ্জনক প্রবাল প্রাচীর থেকে ততটুকু দূরে থাকা যতটুকু দূরে থাকা নিরাপদ। মাস্তলের উপর থেকে সর্বক্ষণ নজর রাখা হয়েছে প্রবাল প্রাচীরের কোথাও কোন ফাঁক আছে কিনা যার ভিতর দিয়ে ভেলাটাকে গলিয়ে দিতে পারা যাবে লেগুনে। স্রোতের টানে আমরা প্রাচীরের পাশাপাশি চলেছি। স্রোত আর এখন আমাদের সঙ্গে ছলচাতুরী করছে না। আলগা হয়ে যাওয়া সেন্টার বোর্ডগুলো উভয় পাশেই বাতাসের সঙ্গে ২০° ডিগ্রী কোণ করে দাঁড় বেয়ে চলতে সাহায্য করছে। বাতাস প্রাচীরের পাশাপাশি বয়ে চলেছে।

এদিকে এরিক ভেলাটাকে এঁকে বেঁকে চালিত করতে নির্দেশ দিচ্ছে। জলের টানের দরুণ প্রাচীরের যত কাছে যাওয়া যুক্তিযুক্ত ঠিক তত কাছ বরাবর দিয়ে চলেছে। দড়ির একটা প্রান্ত রবারের ডিঙ্গির সঙ্গে বেঁধে আমি আর হেরমান ডিঙ্গিতে চড়ে বসলাম। ভেলাটা যখন ভিতরের প্রতিবাত গতির মুখে, আমরা দড়ি ধরে এক ঝটকায় ভেলার পিছনে চলে এলাম। এবার গর্জায়মান প্রাচীরের এত কাছে এসে পড়েছি যে কাচ-সবুজ জল-স্ফীতির রূপ দেখতে পেলাম—জলধারা আমাদের দিকে থেকে প্রবাহিত হচ্চে দ্বীপের দিকে। কিন্তু সমুদ্র যখন গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে অর্থাৎ জলরাশি শুষে নিচ্ছে, নিচের দিকে প্রবাল প্রাচীরের উলঙ্গ চেহারাটা অনাবৃত হয়ে পড়ছে চোখের সামনে। দেখাচ্ছে ঠিক মরচে ধরা আকরিক লোহার ভাঙ্গাচোড়া প্রতিবন্ধকের মতো। যতদূর দেখতে পাওয়া গেল কোথাও কোন ফাঁক বা ভিতরে ঢোকার কোন পথ নেই প্রাচীর গাত্রে। এরিক তাই বাঁ দিকের দড়ি টেনে পালকে সঙ্কুচিত করে আনল, কিন্তু ডান দিকের পালের দড়ি আলগা করে দিল আর দাঁড়ীরা সেই ভাবে দাঁড় নিয়ন্ত্রিত করায় কন-টিকির গতিমুখ পরিবর্তিত হল—বিপদ এলাকা থেকে টলতে টলতে সরে এল ভিতরে ঢোকার পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায়।

যতবার কন-টিকি প্রবাল প্রাচীরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছে, ততবারই তাকে

স্রোতের ধাক্কায় সরে আসতে হচ্ছে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে। আমরা দুজন যারা ডিঙ্গিতে ছিলাম ভেলার পিছন দিকে, আমরা তো প্রায় প্রাণটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম। কারণ প্রতিবারই প্রাচীরের এত কাছে এসে পড়ছিলাম যে সমুদ্রের হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য অনুভব করতে পারছিলাম। তরঙ্গ ফুলে ফেঁপে ভয়াল মূর্তি ধারণ করছিল। প্রত্যেকবারই আমরা ভাবছিলাম এরিক বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলছে, ঢেউ-এর কবল থেকে কন-টিকির আর বুঝি মুক্তির আশা নেই—এবার আমরা লাল প্রবাল প্রাচীরের মরণ-ফাঁদে আছড়ে পড়ব। কিন্তু প্রতিবারই এরিকের সুদক্ষ পরিচালনায় এই মারাত্মক টানের বেড়াজাল কাটিয়ে বের হয়ে আসতে পেরেছি। আমরা সব সময়ই দ্বীপের কাছ বরাবর দিয়েই চলেছি—এত কাছাকাছি যে দ্বীপের উপকূলের সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তবুও সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য আমাদের নাগালের বাইরে। দ্বীপ ও আমাদের মধ্যে রয়েছে উত্তাল তরঙ্গের পরিখা—যা এই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

প্রায় তিনটের সময় প্রবাল প্রাচীরের গায়ে একটা বিস্তৃত ফাঁক নজরে এল যার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম কাচের মতো ঝকঝকে নীলাভ লেগুন। অবশেষে উন্মুক্ত হল উপকূলের নারকেল বনের প্রবেশ দ্বার। কিন্তু এই ফাঁকটুকু ছাড়া প্রবাল প্রাচীরের আর সবটাই অটুট ও দৃঢ় আছে। রক্ত লাল করাল দংষ্ট্রা বিকশিত করে ফেনিল তরঙ্গের মধ্যে অশুভ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। দ্বীপে যাবার আর কোন পথ নেই। পিছনে বাতাসের ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা দ্বীপের পাশাপাশি এগিয়ে যেতে থাকায় নারকেল বনের প্রবেশ-পথ বন্ধ হয়ে গেল—বনও ক্রমশ পাতলা হয়ে আসতে লাগল। এবার প্রবাল দ্বীপের অভ্যন্তরের চেহারাটা ভেসে উঠল আমাদের চোখের সামনে। সুন্দরতম উজ্জ্বলতম লবণাক্ত জলের লেগুন—নিঃশব্দ, বিরাট একটা পার্বত্য হ্রদ। হ্রদকে ঘিরে রয়েছে নারকেল গাছ—গাছের মাথা বাতাসে তরঙ্গায়িত। ঝক-ঝক করছে বেলাভূমি—যেখান থেকে জলে নেমে স্নান করা যায়। এই আতিথ্য-বৎসল লেগুনের পাড়েই লোভনীয় সবুজ তালীবৃক্ষ শোভিত দ্বীপটি—দ্বীপের চার ধারে প্রশস্ত অঙ্গুরীয়ের মতো নরম কঙ্করময় বেলাভূমি। দ্বীপের দ্বিতীয় বলয়টি—পরিচালনার তরবারির মতো এই স্বর্গ রাজ্যের প্রবেশ দ্বার রক্ষা করছে।

সারাদিন আমরা আংগাটাউ দ্বীপটি চারপাশ থেকে এলোমেলো ভাবে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অতি কাছ থেকে তার সৌন্দর্য-সুধা পান করলাম কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। সারাদিন নারকেল গাছের মাথায় সূর্যের কিরণ ঝরে পড়েছে। এই তো স্বর্গ! দ্বীপের অভ্যন্তরে শুধু আনন্দ আর আনন্দের রাজ্য। এখন ভেলা চালানোটা রুটিন মাফিক কাজ হয়ে দাঁড়াল। এবার এরিক তার গীটার বের করে আনল—রোদে বারার মস্ত বড় একটা পেরুর টুপি মাথায় দিয়ে ভাবপ্রবন দক্ষিণ সমুদ্রের জনপ্রিয়

সংগীতের স্থর বাজাতে লাগল গীটারে।

বেণ্ট আজকে দুপুরে ভেলার কিনারায় চমৎকার খানা পরিবেশন করলেন। আমরা পেরু থেকে আনা পুরানো একটা নারকেল ভেঙ্গে ভিতরের টাটকা জল পান করলাম দ্বীপের ভিতরে যেসব টাটকা কচি ডাব ঝুলছিল তাদের শুভ কামনা করে। সমগ্র পরিবেশটা অপার শান্তিময়। উজ্জ্বল সবুজ নারকেলের বন, নারকেল গাছের শিকড়গুলো মাটির গভীরে প্রোথিত,—তারা যেন আমাদের দিকে চেয়ে দ্বীপে আসার ইশারা করছে। নারকেল গাছের মাথার উপরে সাদা পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা শান্তির অগ্রদূত। শান্তি বিরাজ করছে কাচ-স্বচ্ছ লেগুনের জলে, নরম বালু-তটে। লাল প্রবাল প্রাচীরের ভয়াল দৃশ্য,— তরঙ্গের কামান গর্জন ও বাতাসে ড্রামের বাদ্যি—সব কিছুই সাগর থেকে আসা আমাদের ছজনকেই এক অদম্য অনুভূতিতে আপ্লুত করে ফেলল। এমন এক অনুভূতি যার স্মৃতি মনের পট থেকে কোনদিন মুছে যাবে না! আমরা যে প্রশান্ত মহাসাগরের আর-এক পাশে পৌঁছেচি—কোন সন্দেহ নেই। পৌঁছেচি প্রশান্ত মহা-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি আসল দ্বীপে। ভেলা থেকে ডাঙ্গায় নামি আর না-নামি, পলিনেশিয়ায় পৌছে গেছি। পিছনে ফেলে এসেছি চিরদিনের মতো বিরাট বিপুল সমুদ্র।

আংগাটাউ থেকে দূরে। আজ একটা পরবের দিন। ভেলার উপর আমার সপ্ত নবতিতম দিবস। সব থেকে বিস্ময়কর হল—নিউইয়র্কে আমরা হিসেব করে দেখেছিলায, যদি আদর্শ আবহাওয়া থাকে পলিনেশিয়ার নিকটতম দ্বীপে পৌছতে সাতানব্বুই দিনই লাগবে।

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা তাল পাতার ছাউনি দেওয়া দুটো কুটীরের পাশ দিয়ে গেলাম। তীরে গাছগাছালির জটলার মধ্যে পড়ে আছে কুটীর দুটো। কিন্তু সেখানে ধোঁয়া বা জীবনের কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না।

সাড়ে পাঁচটায় আময়া প্রবাল প্রাচীরের কাছাকাছি এসে থামলাম। দক্ষিণ প্রান্তের সমস্ত তটভূমি পরিক্রমা শেষ করেছি। এবার দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমায় এসে গেছি প্রায়। শেষ বারের মতো একবার তাকিয়ে দেখতে হবে প্রাচীরের গায়ে কোথাও কোন ঢোকবার পথ পাওয়া যায় কিনা। সূর্য এখন অস্তাচলশায়ী। এত নিচে নেমে এসেছে যে সামনের দিকে তাকাতে আমাদের চোখ যেন ঝলসে গেল। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের শেষ বিন্দু ছাড়িয়ে কয়েকশ' গজ দূরে যেখানে প্রবাল প্রাচীরের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে, সেখানে বাতাসের গায়ে ছোট্ট একটা রামধনু দেখতে পেলাম। এ যেন একটা কালো ছায়ার পটভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। ভিতরে বেলাভূমিতে একগুচ্ছ কালো কালো বিন্দু দেখতে পেলাম। হঠাৎ একটা বিন্দু সচল হয়ে ধীরে ধীরে জলের দিকে এগিয়ে আসতে

লাগল আর বাকি বিন্দুগুলো দ্রুত ছুট দিল বনের দিকে। নিশ্চয় ওরা মানুষ! আমরা প্রাচীরের ধার ঘেঁষে যতদূর সম্ভব ভিতর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলাম সাহসে ভর করে। বাতাস স্তব্ধ। মনে হল—দ্বীপের অনুবাতের আওতায় আসার আর ইঞ্চিখানেক বাকি আছে। দেখলাম, একটা ক্যানু জলে ভাসান হল আর দু জন লোক লাফিয়ে উঠল তাতে। বৈঠা বেয়ে প্রবাল প্রাচীরের অপর পাশ ধরে আসছে। খানিকটা গিয়ে তারা ক্যানুটার মাথাটা বাইরে গলিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ-এর মাথায় উঠে গেল—তারপর প্রবাল প্রাচীরের একটা ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এল বাইরে। ক্যানুটা সোজা এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

তাহলে প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে ওখানে একটা ফাঁক আছে। আমাদের আশা-ভরসার স্থল। তাল গাছের গুঁড়ির মধ্যে সমস্ত গ্রামটা এবার দেখতে পাচ্ছি। ছায়াটা ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে।

ক্যানুর লোকজন আমাদের দিকে হাত নাড়ল। আমরাও সাগ্রহে হাত নেড়ে জবাব দিলাম। তারা জোরসে ক্যানু বাইতে লাগল। এটা এক ধরনের পাল-খাটানোর দণ্ডযুক্ত পলিনেশীয় বাচ-নৌকো। দুজন বাদামী চামড়া লোক চামচের মতো বৈঠা বেয়ে চলেছে। আবার নতুন করে ভাষার বিপত্তি শুরু হবে। ফাতুহিভায় যখন থাকতাম, আমি কয়েকটা মাত্র মারকুয়েসাস বুলি রপ্ত করেছি। কিন্তু পলিনেশীয় ভাষা খুবই দুরূহ। চর্চা না থাকলে মনে রাখা কঠিন।

ক্যানুটা এসে আমাদের ভেলার সঙ্গে ধাক্কা খেল আর লোক দুজন আমাদের ভেলায় লাফিয়ে পড়ল। আমরা বেশ স্বস্তি পেলাম। একজনের মুখ হাসিতে ভরে উঠেছে। বাদামী হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, শুভরাত্রি'।

'শুভরাত্রি'! জবাবে বললাম আমি। আমিও বিস্ময়ে হত চকিত—'ইংরেজি জান?'

লোকটি আবার হেসে মাথা নাড়ল।

'শুভরাত্রি! শুভরাত্রি'!

এই একটি মাত্র বিদেশী ভাষায় তার অধিকার। এর সাহায্যেই সে তার বিনয়ী সঙ্গীর উপর এক হাত নিতে পেরেছে। পিছনে দাঁড়িয়ে সে শুধু মুচকি মুচকি হাসছিল। অভিজ্ঞ সঙ্গীর আচরণে অভিভূত।

দ্বীপের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—'আংগাটাউ'?

'হা-আংগাটাউ'—সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

এরিক বেশ গর্বের সঙ্গে মাথা নাচাল। তার অনুমানই ঠিক।

সূর্য-ই তাকে বলে দিয়েছে কোথায় এসেছি আমরা।

'মেই মেই হি ইয়ুটা,' বললাম আমি।
ফাতু হিভাতে থাকার সময় যেটুকু ভাষা-জ্ঞান অর্জন করেছিলাম তার উপর নির্ভর করে বললাম, 'ডাঙ্গায় যেতে চাই'।

ওরা দু জনই প্রবালপ্রাচীরের অদৃশ্য পথের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। আমরা আর একবার দাঁড় নামিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এই সময় দ্বীপের অভ্যন্তর থেকে নতুন করে দমকা বাতাস ধেয়ে এল। লেগুনের উপর ছোট্ট, একফালি বর্ষণ-মেঘ ছায়া ফেলেছে। বাতাস আমাদের প্রবালপ্রাচীরের ভিতর থেকে বিতাড়িত করবে—এমন ত্রাসজাগানো চেহারা নিয়ে দেখা দিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, কন-টিকি ঠিক দাঁড়ের নির্দেশ মতো কাজ করছে না। বিস্তৃত কোণ সৃষ্টি করে প্রবাল প্রাচীরের ফাঁকের মুখের কাছে যেতে পারবে না। আমরা নোঙর জলে ফেললাম, কিন্তু তলদেশ পর্যন্ত নোঙর পৌঁছল না। দড়িটা লম্বায় ছোট। এবার আমাদের বৈঠার সাহায্য নিতেই হবে আর খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে যাতে না বাতাস আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে। ঝটপট পাল নামিয়ে ফেললাম। প্রত্যেকে হাতে তুলে নিলাম বড় বড় বৈঠা।

স্থানীয় লোক দু জনকেও দুটো বাড়তি বৈঠা দিতে চাইলাম। তারা তখনও আমাদের ভেলার পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের দেওয়া সিগারেট মৌজ করে টানছে। ওরা শুধু জোরে জোরে মাথা নাড়ল। কোন্ পথে যেতে হবে দেখিয়ে দিল। হতবুদ্ধি দেখাল ওদের। আমি ইংগিতে বোঝাতে চাইলাম—এখন আমাদের প্রত্যেককে বৈঠা বাইতে হবে। পুনরাবৃত্তি করলাম—ডাঙ্গায় যেতে চাই। ওদের মধ্যে যে বেশি অগ্রসর অর্থাৎ জানেশোনে, সে বাতাসে হাত আন্দোলিত করে চেঁচিয়ে উঠল—'ব-র-র-র'!

সে যে আমাদের ভেলার ইঞ্জিনটাকে চালিত করতে বলছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওরা ভেবেছে আমরা একটা অদ্ভুত জলযানের উপর দাঁড়িয়ে আছি যার তলার অংশটা জলের গভীরে। আমরা দু জনকে পিছনে নিয়ে গিয়ে কাঠের তলায় ওদের হাত দিয়ে স্পর্শ করিয়ে বুঝিয়ে দিলাম আমাদের জলযানের স্ক্রু বা চালকযন্ত্র-টন্ত্র কিছুই নেই। ওরা একেবারে হতভম্ব। তখুনি সিগারেট নিভিয়ে ফেলে আমাদের পাশে এসে লাফিয়ে বসে পড়ল। আমরা চারজন চারজন করে ভেলার দু পাশে বসে বৈঠা ফেললাম জলে। ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যও সমুদ্রের বুকে টুপ করে ডুবে অদৃশ্য। আর দ্বীপ থেকে আসা দমকা বাতাসও তীব্রতর হয়ে উঠল। আমরা এক ইঞ্চিও এগোচ্ছি মনে হল না। দ্বীপবাসী দু জন ভয়ার্ত হয়ে উঠল। ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজেদের ক্যানুতে এবং মুহূর্তে উধাও। অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমরা আপ্রাণ বৈঠা চালাতে লাগলাম, আবার না সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের।

দ্বীপের উপরও সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া বিস্তার করেছে। এমন সময় চারটে ক্যানু নাচতে নাচতে প্রবাল-প্রাচীরের পিছন থেকে এসে উপস্থিত হল। বেশ কয়েকজন পলিনেশীয়দের ভিড় জমে গেল আমাদের ভেলায়। সবাই আমাদের সঙ্গে করমর্দন করতে উৎসুক। সিগারেট চাই! আমাদের ভেলায় এখন অনেক লোক—যারা স্থানীয় ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কাজেই আমাদের আর দুর্ভাবনার কারণ নেই। ওরা আমাদের কিছুতেই সমুদ্রে ভেসে যেতে দেবে না—আমরা হারিয়ে যাব না সমুদ্রে। আজ সন্ধ্যায় ডাঙ্গায় নামবই! আমরা ঝটপট ক্যানুর পিছনে দড়ি দিয়ে কন-টিকির সামনের কাঠের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম। তারপর ক্যানু চারটে অর্ধবৃত্তাকারে প্রস্তুত হয়ে ভেলার সামনে দাঁড়াল—যেন পাহারাদার চারটে কুকুর। ম্নুট লাফিয়ে ডিঙ্গিতে উঠে পড়ল যেন সমুদ্র-কুকুর দলের সেও একজন। ক্যানু-ওয়ালাদের দলে সেও নিজের স্থান করে নিল। আমরা বাকিরা বৈঠা হাতে ভেলার দুপাশে স্থান নিলাম। এই প্রথম শুরু হল সামনাসামনি পুবেল হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই—যা এতক্ষণ আমাদের পিছন থেকে ঝাপটা মারছিল।

যতক্ষণ না চাঁদ উঠল চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। নতুন করে বাতাস বইতে শুরু করেছে। ডাঙ্গায় দ্বীপবাসীরা ভাঙ্গাছাঁটা ডালপালায় বেশ বড়সড় রকমের আগুন জ্বালিয়েছে। উদ্দেশ্য—প্রবাল প্রাচীরের কোন্ ফাঁক দিয়ে পথ চিনে বের হয়ে আসতে হবে দেখিয়ে দেওয়া। প্রবাল প্রাচীরের অশ্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন হুঙ্কার জলপ্রপাতের গর্জনের মতো অন্ধকারে আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। প্রথম দিকে শব্দ উচ্চকিত থেকে ক্রমশ উচ্চকিততর হয়ে উঠছিল।

যারা আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে তাদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তারা আছে ক্যানুতে—আমাদের ভেলার সামনে। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি তারা গলা ফাটিয়ে গান গাইছে—পলিনেশীয়দের যুদ্ধ-সংগীত, যা রোমাঞ্চ জাগায়। ম্নুটও ওদের দলে আছে। তারও গলা শুনতে পাচ্ছি। এদেশীয় সংগীত যেই সমে এসে থামছে, অমনি ম্নুটের একক কণ্ঠ কানে ভেসে আসছে। সমবেত পলিনেশীয় সংগীতের মধ্যে নরওয়ের নিঃসঙ্গ কণ্ঠের লোক-সংগীত। এই সংগীতের জলসার মধ্যে আমরাও ভেলা থেকে ছুঁড়ে দিলাম আমাদের গানের কলি, 'টম ব্রাউনের খোকার নাকের ডগায় একটা ফুস্কুরি'। একদল সাদা ও বাদামী আদমী সমবেত কণ্ঠে গান ও হাসির উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে বৈঠা চালিয়েছে তীব্র বেগে।

আমরা উত্তেজনায় উদ্দাম হয়ে উঠেছি। সাতানব্বুইটি দিন অতিক্রান্ত। পৌঁছেছি পলিনেশিয়ায়। সেদিন সন্ধ্যায় গাঁয়ে একটা ভোজোৎসব হবে। দ্বীপবাসীরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে—হাসিতে, আনন্দে উল্লসিত। হৈ-হল্লোড়ের প্রচণ্ড আওয়াজ উঠছে। বছরে একবার আংগ্রাটাউতে জাহাজ ভেড়ে। তাহিতি থেকে ছোবয়ার

জাহাজ আসে নারকেল সংগ্রহ করতে। কাজেই আজ রাতে ডাঙায় ঐ আলো ঘিরে বড় দরের একটা ভোজের আয়োজন করা হবে।

কিন্তু ক্রুদ্ধ বাতাস একগুঁয়ের মতো বয়ে চলেছে। বৈঠা চালাতে চালাতে আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টাটিয়ে উঠেছে। অবিরাম লড়াই করে চলেছি আমরা কিন্তু ডাঙার আগুন কোন সময়েই নিকটতর মনে হচ্ছে না। প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়া তরঙ্গের গর্জন সমান ভাবে চলেছে। বিরতির লক্ষণ নেই। এক সময় গানও বন্ধ হয়ে গেল। সবাই নিশ্চুপ। সবই তো হল, আর কি-ই বা করার আছে—একমাত্র বৈঠা চালানো ছাড়া! আগুনের আলো এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, কখনও নিভুনিভু হয়ে আসছে, কখনও বা দপ্ করে জ্বলে উঠেছে আমাদের ভেলার তালে তালে ওঠা নামার সঙ্গে। তিন তিনটে ঘণ্টা কেটে গেল। এখন রাত নটা। ক্রমশ আমরা হার মানতে বসেছি। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

দ্বীপ বাসীদের বোঝালাম দ্বীপ থেকে আরও সাহায্য আসার প্রয়োজন। তারা বোঝাল, তীরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সারা দ্বীপে এই ক্যানু চারটে ছাড়া সমুদ্রে যাবার মতো আর একটিও জলযান নেই।

অন্ধকারের ভিতর থেকে ডিঙ্গিসহ হুটের উদয় হল। তার মাথায় একটা মতলব খেলছে। সে ডিঙ্গি বেয়ে তীর থেকে আরও লোকজন নিয়ে আসতে পারে। পাঁচ ছ'জন ডিঙ্গিতে ঠাসাঠাসি করে বসতে পারবে।

কিন্তু ব্যাপারটা ভারি বিপজ্জনক। স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে হুটের কোন অভিজ্ঞতা নেই। ঐ মসীকালো অন্ধকারে প্রবাল প্রাচীরের সেই ফাঁকে কোনমতেই পৌছতে পারবে না। এবার সে ওদের সর্দারকে সঙ্গে নেবার প্রস্তাব দিল। সর্দার তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমার কাছে প্রস্তাবটা খুব নিরাপদ মনে হল না। কারণ সঙ্কীর্ণ ও বিপজ্জনক প্রাচীরের ফাটলের ভিতর দিয়ে এই ধরনের ডিঙ্গি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন অভিজ্ঞতা নেই সর্দারের। কিন্তু আমি সর্দারকে ডেকে নিয়ে আসতে বললাম। সে তখন অন্ধকারে ক্যানুতে বসে বৈঠা চালাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে তার মুখ থেকে তার অভিমতটা জানতে চাই। এটা সুস্পষ্ট যে, আমরা পিছু হটা কিছুতেই রুখতে পারব না।

হুট সর্দারের খোঁজে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। না হুট, না সর্দার—কারুরই দেখা নেই। আমরা চিৎকার করে ওদের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর শুনতে পেলাম না। শুধু পলিনেশীয়দের হাঁসের প্যাঁক প্যাঁকের মতো একটানা সংগীতের ঐক্যতান ভেসে আসছে। হুট অদৃশ্য অন্ধকারে। কি ঘটেছে তার, এই মুহূর্তে বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না। এই হৈ-হুল্লোড় চেঁচামেচিতে হুট উপদেশের ভুল ব্যাখ্যা করে সর্দারকে নিয়ে তটের দিকে

ডিঙ্গি বেয়ে চলে গেছে। হুট কোথায় তা নিয়ে আমাদের হাঁকডাক ও অন্য আর সব শব্দ প্রাচীরের গা বরাবর আছড়েপড়া তরঙ্গের গর্জনে ডুবে গেল।

আমরা তাড়াতাড়ি একটা মার্স্ বাতি বের করে আনলাম। একজন বাতিটা হাতে করে মাস্তলের মাথায় উঠে গেল। বাতি দেখিয়ে সঙ্কেত করতে লাগল—'ফিরে এস। ফিরে এস।'

কিন্তু কেউই ফিরে এল না।

দুটি লোক হারিয়ে একজন মাস্তলের মাথায় এক নাগাড়ে আলোর সঙ্কেত করে চলেছে—আমরা ক্রমশই পিছু হটছি। বাকিরাও হা-ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভেলার উপর থেকে নানা চিহ্ন জলে ফেলছি। না, আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি—তবে ভুল দিকে। ডাঙ্গার আগুন ক্রমশ ছোট ও ক্ষীণ হয়ে আসছে। তীরে উর্মিভঙ্গের আওয়াজও কম শুনতে পাচ্ছি। যতই আমরা তালবনের আশ্রয় থেকে দূরে সরে আসছি, ততই যেন পুবাল হাওয়ার চিরন্তন বজ্রমুষ্টির নিবিড়তর আলিঙ্গনে আটকা পড়ছি। সমুদ্রে ঠিক যেমন হত, আবার তেমনি অভিজ্ঞতা হতে লাগল। আমাদের আশা-ভরসা নির্মূল হতে চলেছে—আমরা সমুদ্রের বুকেই ভেসে চলেছি। কিন্তু বৈঠা চালানোয় বিন্দু মাত্র শিথিলতা দেখালে চলবে না। যে-কোন ভাবেই পিছনে হটা আটকাতে হবে—যতক্ষণ না হুট নিরাপদে ফিরে আসছে ভেলায়।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। দশ মিনিট। আধ ঘণ্টা। আগুনটা আরও ছোট দেখাচ্ছে। তারপর একেবারে মুছে গেল অন্ধকারে। আমরাও সমুদ্রের খাদে গড়িয়ে পড়েছি। উর্মিভঙ্গের শব্দ দূরাগত কলধ্বনির মতো শোনাচ্ছে। চাঁদ উঠেছে। দ্বীপের নারকেল গাছের মাথার পিছনে চাঁদের চাকতির একটু রোশনাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আকাশ কুয়াশায় ঢাকা। কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন। শুনতে পাচ্ছি দ্বীপবাসীদের বকবকানি। তারা নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করছে। হঠাৎ দেখলাম একটা ক্যানু দড়ি সমুদ্রের জলে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্য তিনটে ক্যানুর লোকেরাও ক্লান্ত—ভীত-ত্রস্তও। আগের মতো সব শক্তি দিয়ে বৈঠা চালাচ্ছে না। কন-টিকি উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছে।

শীগগিরই অন্য ক্যানু তিনটের দড়ি আলগা হয়ে পড়ল—ক্যানু তিনটে ভেলার পাশেই ধাক্কা খেল। একজন দ্বীপবাসী ভেলার পাটাতনের উপর লাফিয়ে পড়ে, মাথা দুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ইয়ুটা (দ্বীপে চললাম)'।

উৎকণ্ঠিত চোখে সে আগুনের দিকে তাকাল। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ অদৃশ্য ছিল। স্ফুলিঙ্গের মতো মাঝে মাঝে আগুনটা দপ করে জলে উঠছিল। উর্মিমালারা নীরব। আমরা দ্রুত ভেসে চলেছি। সমুদ্র যথারীতি গর্জন করে চলেছে। কন-টিকির প্রতিটি দড়ির কিচ কিচ আর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

আমরা দ্বীপবাসীদের সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজে ফস্‌ফস্‌ করে কিছু লিখে একজনের হাতে ধরিয়ে দিলাম। হুটের সঙ্গে দেখা হলে তাকে দিতে বললাম। চিরকুটে লেখা আছে—

'ডিঙ্গিটাকে ক্যান্থর পিছনে বেঁধে দুজন স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ক্যান্থ চেপে এসো। একা ডিঙ্গি করে এসো না'।

উপকারী দ্বীপবাসীদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে—সমুদ্রে ক্যান্থ ভাসানো যুক্তিযুক্ত মনে করলে তারা নিশ্চয়ই হুটকে ক্যান্থতে তুলে নেবে। হুটের পক্ষে একা ডিঙ্গি চেপে ভেসে-যাওয়া ভেলাব নাগাল ধরার আশা পাগলামির নামান্তর হবে।

স্থানীয় অধিবাসীরা চিরকুটটা নিয়ে ক্যান্থ চেপে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ধকারে আমাদের কানে ভেসে এল শুধু প্রথম বন্ধুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের বিনীত অভিনন্দন—'শুভ রাত্রি!'

সাংস্কৃতিক রুচিহীন অন্য দ্বীপবাসীদের শুভেচ্ছা জানানোর গুঞ্জন ধ্বনি উঠল মাত্র। তারপর নেমে এল নীরবতা। নিকটতম ডাঙ্গা থেকে দু হাজার মাইল দূরে যখন ছিলাম, সেদিনের মতো তেমনি নিঃসীম নীরবতা থম থম করতে লাগল।

এই উন্মুক্ত সমুদ্রে বায়ুর চাপের সঙ্গে বৈঠা চালিয়ে আমাদের চারজনের পক্ষে লড়াই করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কিন্তু মাস্তলের মাথা থেকে আলোর সঙ্কেত পাঠানো চালিয়ে যেতে লাগলাম। 'ফিরে এস'—আর এ বার্তা-সঙ্কেত পাঠাতে সাহস হল না। আমরা শুধু মাঝে মাঝে আলোর সঙ্কেত পাঠাচ্ছি। পীচের মতো কালো নিরন্ধ্র অন্ধকার। থেকে থেকে মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের চকিত আভাস পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আংগাটাউ-এর জলগর্ভ মেঘ মাথার উপর চলাফেরা করছে।

রাত দশটায় হুটকে দেখার সকল আশা ছেড়ে দিলাম। আমরা ভেলার ধারে বসে নিঃশব্দে বিস্কুট চিবোচ্ছি। তবে পালা করে মাস্তলের মাথায় উঠে আলোর নিশানা দেখাচ্ছি। কন-টিকির পাল গুটনো।

যতক্ষণ না জানতে পারছি হুট কোথায়, সারা রাত আলোর সঙ্কেত পাঠানো চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে ঊর্মিভঙ্গের কবলে পড়েছে একথা বিশ্বাস করতে রাজি নই। প্রচুর জলরাশি বা ঊর্মিভঙ্গ—যাই হোক না কেন, হুট নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। বেঁচে সে আছেই। সব থেকে জঘন্য হল, প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পলিনেশীয়দের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে থাকতে হবে তাকে। এটাই মস্ত এক অভিশাপের ব্যাপার। যাই হোক এই দীর্ঘ সমুদ্র অভিযানের পর আমরা কিনা আমাদের এক সঙ্গীকে দক্ষিণ সমুদ্রের এক সুদূর দ্বীপে ফেলে রেখে আবার সমুদ্রে ভেসে পড়লাম। যে-মুহূর্তে কোন পলিনেশীয় দন্তপাটি বিকশিত করে হাসি মুখে আমাদের ভেলায় পা রাখবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিতাড়িত করা হবে, নয়ত কন-টিকিতে

আটকে রেখে পশ্চিমে সমুদ্র-অভিযানে টেনে নিয়ে যাব! অবস্থা তখন এতই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে! সে-রাত্রে ভেলার দড়িগুলো এমন ভয়ঙ্কর বিশ্রীরকম কান্নার রোল তুলেছিল যে কারুর আর মুহূর্তের জন্যও দু-চোখের পাতা এক করার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

রাত সাড়ে দশটা। বেন্ট দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন দোলায়িত মাস্তুল থেকে। তাঁর এখন স্থান বদলের পালা। হঠাৎ সবাই সচকিত হয়ে উঠলাম। অন্ধকার সমুদ্রে স্পষ্ট মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি! ঐ তো আবার। পলিনেশীয়দের গলার আওয়াজ—তারা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। আমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সাড়া দিলাম সেই মিশকালো অন্ধকারে। পাল্টা চিৎকারও ভেসে এল। ঐ চিৎকারের মধ্যে ঝুটের গলার আওয়াজও শুনতে পেলাম। উত্তেজনায় আমরা উন্মাদ হয়ে উঠলাম। শ্রান্তিটান্তি মুহূর্তে কোথায় হাওয়া। বজ্রমেঘর দলও পলায়িত। আংগাটাউ থেকে ভেসে চলেই যদি যাই, তাতেই বা কি? সমুদ্রে আরও কত দ্বীপ আছে! ভ্রমণবিলাসী নটা কাঠের ভেলা যেখানে ইচ্ছে ভেসে চলুক—যতক্ষণ আমরা ছ'জন একসঙ্গে আছি। অন্ধকারের বুক চিরে তিনটে ক্যানু ঢেউয়ের চূড়োয় চড়ে দেখা দিল। ঝুট সবার আগে চিরপ্রিয় কন-টিকির বুকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর একের পর এক ছজন বাদামী মানুষ এসে নামল পাটাতনের উপর। কোন কৈফিয়ত দেবার অবসর নেই। দ্বীপবাসীরা নিশ্চয়ই কোন উপহার পাঠিয়েছে—উপহার দিয়েই ফিরে যাবে নিজেদের দ্বীপে। সামনে পথ দেখাতে না আছে আলোর দিশারী—না ডাঙ্গা। নিছক বৈঠার জোরে সমুদ্র ও বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগুতে হবে—যতক্ষণ না দ্বীপের আগুন দেখতে পাবে। আমরা ওদের দু-হাত ভরে খাবার, সিগারেট ও নানা উপহার দিলাম। শেষ বিদায় জানিয়ে প্রত্যেকে আমাদের হাত ধরে গভীর ঝাঁকুনি দিল।

আমরা পশ্চিমে বিপজ্জনক প্রবাল প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। সেজন্য আন্তরিক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগল। ওদের যে সর্দার তার চোখ জলে ভরে এল। আদর করে সে আমার চিবুকে চুমু খেল। ভাগ্যিস আমার মুখ শ্মশ্রুমণ্ডিত ছিল। তারা বিদায় নিয়ে ক্যানুতে চেপে বসল। আমরা ছ'জন ভেলার উপর পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত।

ভেলাকে নিজের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা ঝুটের গল্প শুনতে বসে গেলাম।

ঝুট সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে বেশ ভালো মনেই ডাঙ্গার দিকে যাত্রা করেছিল। সর্দার নিজেও ছোট্ট বৈঠা চালাচ্ছিল প্রবাল প্রাচীরের গায়ে সেই ফাঁকের দিকে। হঠাৎ সে কন-টিকিতে ফিরে আসার জন্য আলোর সঙ্কেত দেখতে পেল। ঝুট বৈঠা-বাহককে ফিরে যাওয়ার কথা ইশারায় বুঝিয়ে দিল। কিন্তু লোকটি তার নির্দেশ

মানতে অস্বীকার করল। এবার হুট তার হাত থেকে বৈঠা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল কিন্তু হাত সরিয়ে নিল সে। চারপাশে প্রাচীরের গায়ে বজ্রনির্ঘোষের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। এ অবস্থায় আর লড়ালড়ির কোন অর্থই হয় না। তারা প্রাচীরের সেই ফাঁকা জায়গার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল। ঢুকে পড়ল অভ্যন্তরে—শেষ পর্যন্ত দ্বীপের একটা কঠিন প্রবাল চাঁই-এর উপর এসে ডিঙ্গিটা আছড়ে পড়ল। একদল দ্বীপবাসী ছুটে এসে ডিঙ্গিটা বেলাভূমির উপর টেনে তুলল। হুট একটা তালগাছের নিচে একলা দাঁড়িয়ে রইল। তাকে ঘিরে বিরাট একটি দল অপরিচিত ভাষায় বকবক করে চলেছে। খালি পা, গায়ের রং বাদামী। এক দঙ্গল মেয়েপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা। সকল বয়সের মানুষ ঘিরে ধরেছে হুটকে। তার পোশাক-আশাকে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছে। নিজেরা ছেঁড়া পুরানো ইউরোপীয় পোশাক পরে আছে, অথচ দ্বীপে কোন শ্বেতকায় মানুষ নেই।

হুট ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চটপটে পুরুষ মানুষকে ডিঙ্গি চেপে যেতে ইশারায় বোঝাতে চেষ্টা করল। এই সময় এগিয়ে এল একজন মোটাসোটা লোক হেলতে দুলতে। হুট বুঝল এই লোকটিই এখানকার দলনেতা, কারণ তার মাথায় ছিল সৈন্যদের একটা টুপি। বেশ চড়া গলায় কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে কথা বলছিল লোকটি। তাকে আসতে দেখে সবাই সরে দাঁড়াল তাকে যাবার পথ করে দিতে। হুট ইংরেজি ও নরওয়েজীয় ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করল, তার লোকের প্রয়োজন, ভেলাটা যাতে সমুদ্রে ভেসে না যায় তার আগে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। হুটের কথা শুনে প্রধানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সে হুটের একটা কথাও বুঝতে পারেনি। ভীষণ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে ঠেলে গাঁয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

গাঁয়ে হুটকে অভ্যর্থনা জানাল কুকুর, শুয়োর আর দক্ষিণ সমুদ্রের সুন্দরী ললনারা। তাদের সঙ্গে আছে টাটকা ফল। হুট যদি এখানে থাকে তার অবস্থান কালকে যথাসাধ্য মধুময় করে তুলতে চেষ্টা করবে! কিন্তু হুটকে প্রলুব্ধ করা যাবে না। তার মনকে অধিকার করে আছে বিলীয়মান ভেলার চিন্তা—যা ক্রমশ পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। বিষাদক্ষুণ্ণ করে তুলছে তার মনকে। স্থানীয়দের উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যায়। ওরা চায় আমাদের সাহচর্য। ওরা জানে সাদা মানুষদের জাহাজে আছে নানা আকাঙ্খিত ভালো ভালো জিনিস। যদি হুটকে আটকে রাখে, বাকিরা ও অদ্ভুত জলযানও নিশ্চয় আসবে এখানে। আংগাটউয়ের মতো ঈশ্বরবর্জিত দ্বীপে কোন সাদা মানুষকে ফেলে রেখে ফিরে যাবে না কোন জলযান।

আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল হুটের। তাড়াতাড়ি ফিরে এল ডিঙ্গির কাছে। পিছনে এল মেয়ে পুরুষের দল—যারা তাকে দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ। তার

আন্তর্জাতিক ভাষায় বক্তৃতা শুনেও অঙ্গভঙ্গি সঞ্চালনের আর ভুল বা বিকৃত অর্থ করার কোন উপায় নেই। এই অন্ধকার রাতেই হুটকে ফিরে যেতে হবে এই অদ্ভুত জলযানে। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে।

দ্বীপের অধিবাসীরা একটা কৌশলের আশ্রয় নিল। তারা আকার-ইংগিতে জানিয়ে দিল বাকিরাও আসছে তটভূমিতে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে। মুহূর্তের জন্য হুট বিব্রত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। হঠাৎ বেলাভূমিতে উচ্চ কণ্ঠের চেঁচামেচি শুনতে পেল। মেয়েরা আর ছোটরা নিভে-আসা আগুনকে আবার প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করছে। বাকি ক্যানু তিনটেও ফিরে এসেছে। তারা হুটের হাতে একটা চিরকুট দিল। হুটের তখন মরিয়া অবস্থা। একা যেন সে সমুদ্রে ভেসে না পড়ে! আর দ্বীপবাসীরাও তার সঙ্গে যেতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল।

ওদের নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত ও সরব কথা কাটাকাটি হতে লাগল। ক্যানু যাত্রী যারা ভেলাটা দেখে এসেছে, তারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে হুটকে এখানে আটকে রেখে কোন লাভ নেই। তাকে আটকে রেখে বাকিদের আসতে বাধ্য করা দুরাশা মাত্র। শেষ পর্যন্ত হুটের প্রতিশ্রুতি ও আন্তর্জাতিক ভাষায় ভীতি প্রদর্শনের ফলশ্রুতি—ক্যানু তিনটের যাত্রীরা আবার হুটকে নিয়ে কন-টিকির খোঁজে যেতে রাজি হল। সেই রাতের মিশকালো অন্ধকারে তারা আবার সমুদ্রে ক্যানু ভাসাল—ক্যানুর পিছনে দড়িতে বাঁধা ডিঙ্গিটা নাচতে নাচতে চলল। আর দ্বীপবাসীরা নিভে-আসা আগুনের ধারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের শ্বেতকায় বন্ধু যেমন হঠাৎ এসে ছিল, তেমনি হঠাৎ-ই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে।

হুট ও তার সঙ্গীরা ভেলার ক্ষীণ আলোর সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছিল—দূরে সমুদ্রের বুকে মিটি মিটি জ্বলছে। পলিনেশীয়দের ক্যানু লম্বা, সরু ও হালকা। দু পাশ শক্ত ও ধারাল—ঠিক ছুরির ফলার মতো জল কেটে অগ্রসর হতে লাগল। যখন ভেলার পাটাতনের উপর আবার পা রাখল, একটা যুগ যেন কেটে গেছে হুটের মনে হল।

'ডাঙ্গায় সময়টা বেশ ভালোই কেটেছে, কি বল?' টরস্টেইনের গলায় ঈর্ষার সুর।

'হুলা-হু ড়িদের দেখতে পেতে যদি তুমি!' হুট টরস্টেইনকে ক্ষ্যাপাতে সুড়সুড়ি দেয়।

আমরা পাল নামিয়ে হাল পাটাতনের উপর তুলে বাঁশের কেবিনে ঢুকে পড়লাম। আংগাটাউ-এর বেলাভূমিতে পড়ে-থাকা গণ্ডশিলার মতো ঘুমে অচেতন হয়ে রইলাম।

তিন দিন ধরে ভেসে চললাম সমুদ্রে। ডাঙ্গার কোন চিহ্নও দেখতে পেলাম না। আমরা অশুভ টাকুম ও রারোইয়া প্রবাল-প্রাচীরের দিকে ভেসে চলেছি। আমাদের সামনে সমুদ্রের বুকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল পরিমিত জায়গা পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভয়াবহ প্রবাল প্রাচীর এড়িয়ে উত্তর দিকে সরে যাবার জন্য

প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। ভালোর দিকেই সবকিছু মোড় নিয়েছিল—হঠাৎ এক রাতে নৈশপ্রহরী কেবিনের মধ্যে ঢুকে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলল।

বায়ুর গতির দিক-পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সোজা টাকুম প্রবাল-প্রাচীরের দিকে চলেছি। বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। কোনকিছু নজরে পড়ছে না। প্রবাল প্রাচীর খুব একটা দূরে হতে পারে না।

সেই দুপুর রাতে যুদ্ধ কালীন মন্ত্রণা সভা বসল। এখন বাঁচা-মরার প্রশ্ন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। উত্তর দিকে যাওয়া এখন অসম্ভব। বরং এখন দক্ষিণ পাশে যাওয়ার চেষ্টা করা যাক। এই পঞ্চাশ মাইলব্যাপী প্রবাল-প্রাচীর অতিক্রম করার আগেই যদি পুবাল হাওয়া বইতে শুরু করে, আমরা উর্মিভঙ্গের কবলে পড়ে যাব—তাদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে।

সবাই একমত হলাম। ভেলাডুবি এড়াতে যা-কিছু করা দরকার সব করা হবে। আমরা কন-টিকির ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকব—মাস্তুলের উপর উঠব না কেউ, কারণ ধাক্কা খেলে পচা ফলের মতো টুপ করে পড়ে যাব শূণ্য থেকে। ঢেউ আমাদের উপর ভেঙ্গে পড়লে মাস্তুলের দড়ি জাপটে ধরে থাকব। দড়ি খুলে রবারের ডিঙ্গিটা খুলে ভেলার উপর টেনে তোলা হল—তাতে একটা জলনিরোধক ছোট্ট একটা বেতার প্রেরক যন্ত্র বেঁধে রাখলাম। কিছু খাবারদাবার, জলের বোতল এবং ওষুধ পত্তরও ডিঙ্গিতে বোঝাই করা হল। আমরা যদি খালি হাতে নিরাপদে প্রাচীর টপকাতে পারি, এরা হয়ত স্বাধীন ভাবে জলে ভাসতে ভাসতে ডাঙ্গায় এসে পৌছবে। কন-টিকির পিছনে লম্বা একটা দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য প্রান্তে একটা ভাসমান কাঠ বেঁধে দিলাম। এটাও হয়ত ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পৌছবে। ভেলাটা প্রাচীরের কোথাও আটকে থাকলে এই দড়ি টেনে তখন তাকে কাছে টেনে আনা যাবে। মন্ত্রণা শেষে পাহারার ভার সেই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়ীর উপর ন্যস্ত করে আমরা আবার কেবিনে ঢুকে পড়লাম।

উত্তুরে হাওয়া যতক্ষণ বইতে থাকল, আমরা ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিত ভাবে প্রবাল-প্রাচীরের বাইরে দিয়ে এগুতে লাগলাম—দূরে দিগন্তের নিচে জলের তলায় ঘাপটি মেরে আছে সে-প্রাচীর আমাদের অপেক্ষায়। কিন্তু একদিন বিকেলের দিকে মন্থর হয়ে এল বাতাসের গতি—এবার দিক বদল করে পুবমুখো বইতে লাগল বাতাস। এরিকের মতে আমরা এত দূর নিচের দিকে চলে এসেছি যে, রারোইয়া প্রাচীরের দক্ষিণাংশের শেষ বিন্দু এড়িয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এটাকে পরিক্রমা করে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের আওতায় ঢুকে পড়তে হবে যাতে না এর পরের প্রাচীরের এলাকায় চলে আসি।

রাত্রি এল। একশ দিন ধরে আমরা সমুদ্রে ভাসছি।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছি। কিছুতেই সুস্থির হতে পারছি না। ঢেউ-এর গতিবিধিতে একটা অস্বাভাবিকতা অনুভব করলাম। এরকম অবস্থায় কন-টিকির হাল-চাল যেমন হওয়া উচিত, এ যেন সেরকম নয়। কাঠগুলোর গতিছন্দে একটা পরিবর্তন অনুভূত হচ্ছে। তীরের দিক থেকে একটা টান-আকর্ষণ আসছে। আমরা ক্রমশ তীরের দিকে এগিয়ে চলেছি। অনবরত ঘর-বার করছি। কখনও ভেলার পাটতনের উপর দাঁড়াচ্ছি—কখনও মাস্তুলের মাথায় উঠছি। কিন্তু একমাত্র সমুদ্র ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছে না। কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতেও পারছি না। নিরুদ্ধ গতিতে এগিয়ে চলেছে সময়।

ভোরের দিকে, ঠিক দুটোর পর টরস্টেইন মাস্তুলের মাথা থেকে দ্রুত তর তর করে নেমে এল নিচে। জানাল, দূরে তালীবৃক্ষ শোভিত ছোট ছোট দ্বীপের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। কোনকিছু না করে আমরা ভেলাটাকে দক্ষিণমুখো চালিত করার জন্য হাল ধরে বসে রইলাম। টরস্টেইন যা দেখেছে ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ ছাড়া কিছু নয়—রারোইয়া প্রবাল প্রাচীরের পিছনে মুক্তোর মালার মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তারা। আমরা উত্তরমুখী স্রোতের কবলে নিশ্চিত পড়ে গেছি।

সাড়ে সাতটায় দিক চক্রবালে তালীবৃক্ষ শোভিত ছোট ছোট দ্বীপের সারি দেখতে পেলাম। সব থেকে দক্ষিণের দ্বীপটা মোটামুটি আমাদের ভেলার সামনে রয়েছে। ভেলার ডান পাশেও দ্বীপ ও তাল গাছের সারি দিগন্তবরাবর বিস্তৃত। ক্রমশ তারা কালো ফুটকির মতো মিলিয়ে গেল উত্তর দিকে। নিকটতম দ্বীপটিও চার থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

মাস্তুলের মাথা থেকে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল—এই দ্বীপের সারির নিচের দ্বীপটির দিকে ভেলার মুখ ফেরানো থাকেও যদি, আমরা যে ভাবে স্রোতের টানে পাশাপাশি ভেসে চলেছি, কোন মতেই ভেলার অগ্রভাগের দিকে অগ্রসর হতে পারব না। আমরা কোনাকুনি প্রবাল প্রাচীরের দিকে চলেছি। দুই কাঠের মাঝখানে এখনও যে সব কীলক অটুট আছে, তাদের সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলে এখনও বিপদ কাটিয়ে ওঠার কিছুটা আশা করতে পারি। কিন্তু ভেলার পিছন দিকে হাঙ্গররা এত কাছাকাছি আনাগোনা শুরু করেছে যে ভেলার তলায় ডুব দিয়ে ঝুলেপড়া নড়বড়ে সেন্টার বোর্ডকে আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে খাড়া করার চেষ্টা করা অসম্ভব।

বুঝতে পারছি, কন-টিকির ডেকের উপর থাকার মেয়াদ আর মাত্র কয়েকঘণ্টা আমাদের হাতে আছে। প্রবাল প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই হাতে যেটুকু সময় আছে, তা প্রস্তুতির কাজে লাগাতে হবে। সেই চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে কি করতে হবে, প্রত্যেকেই জানে সে-কথা। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সীমিত দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। যখন চরম মুহূর্ত আসবে, তখন কেউ কারুর পা মাড়িয়ে

দেব না অর্থাৎ অন্যের কাজে বাগড়া সৃষ্টি করব না। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। বাতাসের ঝাপটায় যতই ভিতরে ঢুকছি, কন-টিকি একবার ঢেউ-এর মাথায় উঠছে নামছে—উঠছে নামছে। এখানকার জলের এই আলোড়ন যে প্রবাল-প্রাচীরের জন্যই —সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একদল ঢেউ এগিয়ে যাচ্ছে আর একদল প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ আক্রোশে ফিরে আসছে।

আমরা পাল খাটিয়ে দিয়েছি—এখনও আশা করছি হয়ত বিপদ কাটিয়ে বের হয়ে যেতে পারব। আমরা ভেসে চলেছি প্রায় পাশাপাশি অবস্থায়। যতই নিকটবর্তী হচ্ছি, মাস্তুলের মাথা থেকে দেখতে পাচ্ছি তালীবৃক্ষ শোভিত দ্বীপের সারিকে ঘিরে রেখেছে প্রবাল-প্রাচীর। প্রাচীরের কোন অংশ জলের উপর মাথা জাগিয়ে—কোন অংশ নিমজ্জিত জলের তলায়। যেন একটা প্রকাণ্ড বাঁধ। এখানে সমুদ্রের বারিরাশি সাদা ফেনায় আবিল—শূণ্যে লাফিয়ে উঠছে অনবরত। রারোইয়া অ্যাটল বা প্রবাল দ্বীপের আকারটা ডিমের মতো আর দ্বীপের ব্যাস হবে মাইল পঁচিশেক। এই হিসেবের মধ্যে সন্নিহিত টাকুমের প্রবাল-প্রাচীরের বিস্তৃতির কোন স্থান নেই। এই প্রাচীরের দীর্ঘতম অংশ পূব দিকে প্রসারিত। এই প্রাচীর লক্ষ্য করেই তো ভেলা এগিয়ে আসছে। সমগ্র প্রবাল-প্রাচীর এক রেখায় চলেছে দিগন্তের দিকে। শতাধিক গজ মাত্র নজরে পড়ে আর এর পিছনে রয়েছে কাব্যময় ছোট ছোট দ্বীপের মালা ভিতরের শান্ত লেগুনকে ঘিরে।

এরই পটভূমিকায় নীল প্রশান্ত মহাসাগর আমাদের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছিল। আমাদের সামনে এই নীলাম্বুরাশি নৃশংসভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে শূণ্যে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল দিগন্ত বরাবর। আমরা জানি ওখানে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। আগেও একবার আমি তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে গেছি। ডাঙ্গার নিরাপত্তায় দাঁড়িয়ে পূবের অপরিমেয় বিশাল দৃশ্যের দিকে অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি—অবারিত প্রশান্ত মহাসাগরের সফেন তরঙ্গমালা প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে এসে অবিরাম ভেঙ্গে পড়ছে। নতুন নতুন প্রবাল প্রাচীর ও দ্বীপ দক্ষিণ দিকে গড়ে উঠছে। প্রবাল-প্রাচীরের মাঝ বরাবর বাইরের দিক থেকে আমাদের দূরে থাকতেই হবে। না হলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

কন-টিকির ডেকে আমরা এই অভিযানের ইতি ঘটানোর সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছি। মূল্যবান যা কিছু আছে কেবিনের ভিতরে নিয়ে দ্রুত বাঁধাছাদা করা হয়ে গেছে। কাগজ পত্র ও দলিলাদি, সেই সঙ্গে ফিলিম ও অন্যান্য দ্রব্য যা জলে নষ্ট হয়ে যাবে, জল-নিরোধক থলেতে পুরে ফেললাম। সমস্ত বাঁশের কেবিনটা কেম্বিসের কাপড়ে মুড়ে এমোড়-ওমোড় ও কোনাকুনি দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল। যখন বুঝতে পারলাম আর কোনই আশা নেই তখন ছুরি দিয়ে কেটে বাঁশের

পাটাতন তুলে ফেলে দুটো কাঠের ফাঁকে যে-সব কীলক বা সেণ্টার বোর্ড দড়ি-বাঁধা ছিল, দড়িগুলো পট পট কেটে ফেললাম। সেণ্টার বোর্ড বা কীলকগুলো উপরে টেনে তোলা খুব সহজ হল না। কারণ তাদের গায়ে সামুদ্রিক আগাছা জমে তাদের চেহারাটাই দিয়েছে পাল্টে—তাছাড়া নাছোড়বান্দা গুগুলি-শামুকরাও ঘন হয়ে লেগে আছে সেণ্টারবোর্ডের গায়ে। এগুলো খুলে ফেলায় বালসা-কাঠের ভার কিছুটা লাঘব হতেই ভেলা জলের উপর অনেকটা ভেসে উঠল। এবার প্রবাল প্রাচীর সহজেই পার হওয়ার পথ অনেকটা সুগম হল। সেণ্টারবোর্ড খুলে ফেলা হয়েছে—নামিয়ে ফেলা হয়েছে পালও। ভেলা এখন বাতাস ও সমুদ্র-স্রোতের করুণার উপর নির্ভরশীল। ভেসেও চলেছে পাশাপাশি হয়ে।

ঘরে তৈরি নোঙরের সঙ্গে সব থেকে লম্বা দড়িটা বাঁধা আছে। নোঙরটাকে ভেলার বাঁদিকে মাস্তলের দড়ির সিঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। এবার প্রাচীরের গায়ে আছড়ে-পড়া তরঙ্গের মধ্যে কন-টিকির পশ্চাদ্‌ভাগ প্রথম এগিয়ে যাবে—যখন ভেলার উপর থেকে নোঙরটা জলে ছুঁড়ে দেওয়া হবে। নোঙরটা তৈরি করা হয়েছে একটা জলের পাত্রে রেডিয়োর নিঃশেষিত ব্যাটারির ফেলে-দেওয়া ভারী পুরানো লোহার টুকরো পুরে। কঠিন গজাল কাঠের টুকরো আড়াআড়ি ভাবে বসান হয়েছে পাত্রের মুখে এবং ভিতর থেকে কাঁটার আকারে বেরিয়ে আছে কাঠের আংঠাও।

প্রথম এবং শেষ নির্দেশ হল: ভেলা আঁকড়ে থাকো! যা ঘটে ঘটুক, আমরা ভেলার পাটাতন জাপটে ধরে থাকবই। ন'টা বালসা কাঠ প্রবাল প্রাচীরের ধাক্কা সামলাক! জলের চাপ সহ্য করতেই তো আমরা হিমশিম খাব—অন্য কোন কিছু নিয়ে ভাববার অবসর কোথায়? আমরা যদি পাটাতনের উপর থেকে জলে লাফিয়ে পড়ি, একবারে অসহায়ের মতো ভাঁটির টানে সমুদ্রে চলে যাব, আবার জোয়ারের টানে আছড়ে পড়ব তীক্ষ্ণ প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে। ফুলে-ওঠা ঢেউ উল্টে ফেলে দেবে রবারের ডিঙ্গি। আমরা সবাই মিলে যদি ডিঙ্গিতে গাদাগাদি করে থাকি—প্রবালের গায়ে ঘা খেয়ে রবারের ডিঙ্গি ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু বালসা কাঠের ভেলা একসময় না একসময় ভাসতে ভাসতে তীরে এসে ঠেকবেই—যদি কোনমতে ভেলাটাকে জাপটে ধরে থাকতে পারি।

একশ দিনের পর সবাইকে এবার পায়ে জুতো পরে নিতে নির্দেশ দেওয়া হল। লাইফ-বেল্টও হাতের কাছে প্রস্তুত রইল। শেষ সতর্কতা যদিও খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না, কারণ কেউ যদি পাটাতনের উপর থেকে ছিটকে জলে পড়ে যায় এমনিতেই সে প্রাচীরের গায়ে আঘাত খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব—নয়ত নিশ্চিত সলিল-সমাধি। আমরা পাসপোর্ট ও দুচারটে যা ডলার আছে পকেটে পুরে নিলাম। কিন্তু সময়ের অভাব নিয়ে আমরা একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না।

উৎকণ্ঠিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বয়ে চলেছে। ভেলাটা পাশাপাশি ভেসে চলেছে স্থির লক্ষ্যে প্রবাল-প্রাচীরের দিকে। এখন ভেলার উপর সবকিছু শান্তিময়। আমরা মাঝে মাঝে কেবিনে গুটি গুটি ঢুকছি আবার বের হয়ে আসছি বাঁশের পাটাতনের উপর। সবারই মুখ গম্ভীর। মুখের চেহারা দেখেই বোঝা যায় কি পরিণতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান আমরা। ঘাবড়াবার কোন ভাব নেই কারুর মুখে। আর এতদিন ভেলায় বসে আমাদের আস্থা অবিচল ও দৃঢ়প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে। যদি প্রাণ নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে আসতে পেরে থাকি, ডাঙ্গায়ও পৌছব জীবন্ত অবস্থায়।

কেবিনের ভিতরে খাবারের বাক্স, মালপত্তর সব এলোমেলো ভাবে বাঁধা দড়ি দিয়ে। টরস্টেইন রেডিও-কর্নারে নিজের জন্য একটু জায়গা করে নিয়েছে কোনমতে। সেখানে শর্ট-ওয়েভ ট্র্যান্সমিটার এখনও সক্রিয় আছে। পুরানো ঘাঁটি ক্যালাও থেকে এখন চার হাজার মাইল দূরে আছি। এখানকার পেরুর নৌ-বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমরা বেতার মারফত সব সময় সংযোগ রেখে চলেছি। তাছাড়া আরও দূরে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের হাল, ফ্রান্স ও আরও অনেক জায়গার সঙ্গেও আমাদের বেতার যোগাযোগ আছে, কিন্তু দৈব ঘটনাই বলতে হবে—গতকালই আমাদের আর-একটা রেডিও সংস্থার সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে। কুকদ্বীপের রারোটোঙ্গায় এই রেডিও স্টেশানটি অবস্থিত। বেশ জোরালো রেডিও সেট আছে এই স্টেশানের। সাধারণত যে-পদ্ধতি চালু-আছে. তার বিপরীত—অপারেটাররা সাত সকালে টরস্টেইনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের ভেলা নিরুদ্ধ গতিতে চলেছে প্রবাল প্রাচীরের দিকেই। আর টরস্টেইন তার স্টেশানে বসে চাবি টিপছে আর রারোটোঙ্গাকে ডাকছে।

কন-টিকির লগ-বইতে লেখা আছে:

—৮'১৫: আমরা ধীরে ধীরে ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে চলেছি। আমরা ভেলার বাঁদিকে দ্বীপের ভিতরের তালগাছ খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি।

—৮'৪৫: বাতাস আমাদের পক্ষে আরও প্রতিকূল দিকে দিক পরিবর্তন করেছে।

কাজেই এই জট ছাড়ানোর আর কোনই আশা নেই। ভেলায় কোনরকম আতঙ্কের ছাপ নেই, তবে ঝটপট প্রস্তুত হবার অস্থির চেষ্টা চলছে। সামনের প্রবাল প্রাচীরে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি—হয়ত কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের ভগ্নাবশেষ। কিংবা ভেসে-আসা কাঠের স্তূপও হতে পারে।

—৯'৪৫: বাতাস আমাদের প্রাচীরের পিছনের শেষতম দ্বীপের আগের দ্বীপটির দিকে সোজা নিয়ে চলেছে। এবার সমগ্র প্রবাল প্রাচীরটাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সাদা ও লাল ফুটকিওয়ালা একটা প্রাচীর—জলের উপর সামান্যই মাথা জাগিয়ে আছে। দ্বীপপুঞ্জকে বেল্টের মতো ঘিরে রেখেছে। সমগ্র প্রাচীরের গা

থেকেই সাদা ফেনপুঞ্জ আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। বেণ্ট এইমাত্র বেশ গরম খাবার পরিবেশন করলেন। বিরাট ঘটনা সংঘটিত হবার আগে শেষবারের মতো খাবার পরিবেশন।

প্রবাল প্রাচীরের গায়ে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। আমরা এত কাছে এসে পড়েছি, প্রবাল প্রাচীরের পিছনে ঝকঝকে লেগুন এবং লেগুনের অপর পার্শ্বে অন্য দ্বীপের তটরেখা দেখতে পাচ্ছি।

এই কথাগুলো যখন লেখা হচ্ছিল ফেনপুঞ্জের একঘেঁয়ে গুঞ্জন কানে এসে ঝাপটা মারল। সমস্ত প্রাচীরের গা থেকেই উঠছে এই শব্দ। বাতাসে উত্তাল দামামা পেটার আওয়াজ শুরু হয়েছে! যেন কন-টিকি নাটকের যবনিকা পাতের উত্তেজনাময় শেষ অঙ্কের এ ঘোষণা।

—৯'৫০ : চরম মুহূর্ত আসন্ন। প্রবাল প্রাচীরের গায়ের দিকেই ভেসে চলেছি। মাত্র শতখানেক গজ দূরে হবে। টরস্টেইন রারোটোঙ্গার লোকটির সঙ্গে কথা বলছে। সব পরিষ্কার। এখন কাঠ চেপে ধরতে হবে। সবাই উৎফুল্ল, দেখাচ্ছে খারাপ, কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত করতে হবেই।

কয়েক মুহূর্ত পরে নোঙরটা পাটাতনের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে তলদেশ কামড়ে ধরল। এর ফলে ভেলাটা ঘুরপাক খেয়ে গেল—পিছন দিকটা উর্মিভঙ্গের মুখোমুখি হল। আর কয়েকটি মূল্যবান মুহূর্ত ভেলায় আছি—আর টরস্টেইন পাগলের মতো সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে—চাবি টিপছে বেতার-প্রেরক যন্ত্রের। আবার রারোটোঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তরঙ্গভঙ্গের মেঘ-গর্জনে বাতাস মুখরিত। সমুদ্র ভীষণ ফুঁসছে। ডেকের উপর সবকটি হাতই সক্রিয় হয়ে উঠছে। টরস্টেইন বার্তা পাঠাতে পেরেছে—জানিয়ে দিয়েছে, আমরা রারোরিয়া প্রবাল-প্রাচীরের দিকে ভেসে চলেছি। প্রতি ঘণ্টা অন্তর খবর নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে তাদের—একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে খবর পাঠান হবে। ছত্রিশ ঘণ্টার পরও আমাদের কোন পাত্তা না পেলে ওয়াশিংটন ও নরওয়ের বৈদেশিক দপ্তরে খবরটা যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টরস্টেইনের শেষ-কথা হল : সব ঠিক হ্যায়। আর মাত্র পঞ্চাশ গজ বাকি। আমরা এগিয়ে চলেছি।

'বিদায়!'

তারপর টরস্টেইন বন্ধ করে দিয়েছে রেডিও স্টেশান। হুটের কাগজপত্তর শীল-মোহর করা সারা। দুজনেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুঁড়ি মেরে বের হয়ে এল ডেকে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। এটা জলের মতো পরিষ্কার, নোঙরে কাজ হচ্ছে না।

বিপুল জলরাশি নিয়ে সমুদ্র প্রতি মুহূর্তে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্ফীত হয়ে উঠছে—দু তরঙ্গের মাঝখানের খাদের গভীরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি ভেলা একবার তরঙ্গের চূড়োয় উঠছে আবার খাদে নামছে—উঠছে নামছে। উচ্চ

থেকে উচ্চতর চূড়োয় উঠছে।

আবার আদেশ ঘোষিত হল—শক্ত করে ভেলার কাঠ চেপে ধরো! মালপত্তর নিয়ে মাথা ঘামিও না। শক্ত করে ধরে থাকো!

আমরা জল-প্রপাতের এত কাছাকাছি এসে পড়েছি যে প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে ভেঙ্গে-পড়া ঢেউ-এর অশ্রান্ত গর্জন আর কানেই ঢুকছে না। এখন একটা নতুন গুরু গম্ভীর আওয়াজ কানে এসে বাজছে—যে-মুহূর্তে নিকটতম ঢেউ এসে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে।

প্রতিটি হাত প্রস্তুত হয়ে আছে—দড়ি চেপে ধরে আছে যেটাকে মনে করছে সব থেকে শক্ত। একমাত্র এরিক শেষ মুহূর্তে কেবিনে ঢুকে গেল। আমাদের নির্দেশিকার একটা অঙ্গ সে এখনও পালন করেনি—সে তার জুতো খুঁজে পায়নি।

ভেলার পিছন দিকে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই—প্রবাল-প্রাচীরের সঙ্গে প্রথম ধাক্কাটা সেদিক থেকেই আসবে। মাস্তুলের মাথা থেকে যে দুটো শক্ত দড়ি ভেলার পিছনের কাঠের সঙ্গে টানটান করে বাঁধা, সে-দুটোকেও কেউ নিরাপদ মনে করছে না। মাস্তুলটা ভেঙ্গে ভেলা থেকে পড়ে গেলে আমরা দড়ি ধরে প্রাচীরের উপর দোদুল্যমান অবস্থায় শূণ্যে ঝুলতে থাকব। হেরমান বেণ্ট ও টরস্টেইন ভেলার সামনের দিকে কেবিনের সঙ্গে আঁট করে বাঁধা বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে। কেবিনটাকে খাড়া রাখার জন্য থাম্বাটার সঙ্গে যে-দড়ি বাঁধা আছে কেবিনের ছাদের কিনারায়, সেই দড়িটা ধরে আছে হেরমান আর অন্য দু জন ধরে আছে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা দড়ি—যে দড়ি টেনে পাল খাটান হয়। আমি আর নুট ধরে আছি যে-দড়িটা মাস্তুলের মাথা থেকে ভেলার সামনের কাঠের সঙ্গে বাঁধা। যদি মাস্তুল কেবিন-টেবিন সব কিছুই ডেক থেকে জলে পড়ে যায়, ভেলার সামনের দিকের দড়ি ভেলার সঙ্গে বাঁধাই থাকবে বলে আমাদের ধারণা। এবার আমরা হুড়মুড় করে এগিয়ে চলেছি ঢেউয়ের এক্কি-স্নারের মধ্যে।

যখন বুঝতে পারলাম ঢেউ-এর হাতের মুঠোয় পড়ে গেছি, নোঙরের দড়ি কেটে দিলাম—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পলকে হাওয়া। বুঝতে পারছি ভেলার নিচে বিরাট একটা ঢেউ মাথা তুলে উঠছে—কন-টিকিও শূন্যে উৎখাত। মহেন্দ্রক্ষণ আগত। আমরা ঢেউ-এর পিঠ বেয়ে উঠছি—রুদ্ধশ্বাস গতিতে। নড়বড়ে রথটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আর্তনাদ করছে—শিহরিত হচ্ছে আপাদমস্তক। উত্তেজনায় আমাদের দেহের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। মনে হল আমি যেন উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম—হু-র-রা! তাতে একটু স্বস্তিও পেয়েছিলাম। না, কোন ক্ষতি হয়নি। অন্যেরা ভেবেছিল নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু তারাও উল্লাসে উদ্বেলিত—দাঁত বের করে হাসছে। আমরা ছুটে চলেছি—

আমাদের পিছনে ধাওয়া করে আসছে ঢেউ-এর পর ঢেউ। কন-টিকি যেন পূতবারিতে অভিসিঞ্চিত হতে চলেছে। ভালোয় ভালোয় সব শেষ হবে—হবেই।

কিন্তু আমাদের উল্লাসের আগুনে কে যেন জল ঢেলে দিল। চকচকে সবুজ কাচের দেয়ালের মতো একটা ঢেউ উঁচু হয়ে এগিয়ে এল ভেলার পিছনে। আমরা যখন খাদের দিকে নামছি—ঢেউটা হুড়মুড় করে পিছনে ধেয়ে এল এবং পর মুহূর্তেই আমার মাথার উপর উঁচু হয়ে উঠল। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম—সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জলরাশিতে ডুবে গেলাম। সারা শরীরে একটা টান অনুভূত হল—সে-টান এত কড়া যে আমার দেহের প্রতিটি মাংসপেশী ও স্নায়ুতন্ত্রীকে সক্রিয় করে তুলতে হল—একটিমাত্র কথাই বুকে হাতুড়ি পিটতে লাগল—সাপটে ধরে থাকো! আমার ধারণা, এই রকম মরিয়া অবস্থায় মস্তিষ্কের অনুমতি পাওয়ার আগেই হাত দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দেহ থেকে—ফল দেখেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি পাহাড়-প্রমাণ জলরাশি সরে যাচ্ছে—দানবীয় মুঠি শিথিল হয়ে আসছে। সেই বিরাট পাহাড়-প্রমাণ বারিরাশি কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলার মতো গর্জন আর হুড়মুড় শব্দ করতে করতে ধেয়ে চলে গেল আর তাকিয়ে দেখলাম নুট আমার পাশে ঝুলছে—পিছন থেকে দেখলে মনে হবে প্রকাণ্ড বলের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝুলছে। পিছন ফিরে দেখলাম—সমুদ্রটাকে দেখাচ্ছে ধূসর—তরঙ্গহীন সমতলের মতো। ঢেউ চলে যাওয়ার সময় কেবিনের ছাদের ধার ঘেঁষে বয়ে গেছে, বাকি তিন জন কেবিনের গায়ে লেপটে আছে। ঢেউ তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে আর ছাদটা জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

আমরা এখনও ভেসে আছি। ডুবে মরিনি।

মুহূর্তের মধ্যে আমি দড়িটা সবলে চেপে ধরলাম—পা দুটো বেঁকিয়ে দড়িটা ঘিরে রাখলাম। নুট দড়ি ছেড়ে দিয়ে বাঘের মতো এক লাফে বাক্সের উপর উঠে দাঁড়াল অন্যপাশে। কেবিনটাই ঢেউ-এর সমস্ত আক্রমণের মহড়া নিয়েছে। তাদের আশ্বাস কণ্ঠ কানে এল, কিন্তু ঠিক সেই সময় দেখলাম আর একটা নতুন সবুজ দেয়াল ফুলে উঠছে—বিপুল ফনা তুলে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। চিৎকার করে উঠলাম আমি। সাবধান করে দিলাম সবাইকে। যতদূর সম্ভব গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। মুহূর্তের মধ্যে জলরাশি ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর—কন-টিকি সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল জলের তলায়। সমুদ্রই আবার যথাশক্তি প্রয়োগ করে এই কটা মানুষের পুঁটলিকে জলের তলা থেকে টেনে তুলল উপরে। দ্বিতীয় তরঙ্গ চলে যেতেই এল তৃতীয় আর একটা।

এমন সময় নুটের উল্লসিত কলকণ্ঠ শুনতে পেলাম। এবার তাকে দড়ির সিঁড়িতে ঝুলতে দেখা গেল।

'—ভেলা অটুট আছে, চেয়ে দেখো !'

তিনটে ঢেউ-এর ধাক্কা খেয়ে দেখা গেল মাস্তুল আর কেবিনটা একটু ঝুঁকে পড়েছে এক দিকে। আবার উল্লাসানুভূতি হল—জয়ের আনন্দ নতুন শক্তি জোগাল।

আবার একটা ঢেউ তেড়ে আসছে উঁচু হয়ে। এ ঢেউটা সব থেকে উঁচু। আমি পিছন থেকে বলিবর্দী চিৎকারে সব্বাইকে সাবধান করে দিলাম। ঝটপট মাস্তুলের দড়ি বেয়ে যত উঁচুতে পারলাম উঠে শক্ত করে দড়ি ধরে ঝুলে রইলাম। পাশ থেকে আসা সবুজ দেয়ালের মধ্যে হারিয়ে গেলাম—দেয়ালটা আমাদের অনেক উঁচু দিয়ে চলে গেল। বাকিরা যারা অনেক পিছনে ছিল ও আমাকে প্রথম অদৃশ্য হতে দেখেছে, তাদের মতে এই দেয়ালটা পঁচিশ ফুট উঁচু হবে। আর এই কাচের মতো চকচকে যে দেয়ালের মধ্যে আমি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলাম, তার মাথায় যে-ফেনার মকুট ছিল তার উচ্চতাও হবে কমসে কম পনের ফুট। এবার বিরাট উঁচু ঢেউটা বাকিদের কাছে পৌছে গেল। সবার মনেই একটা চিন্তা—'ঘাবড়িও না, চালিয়ে যাও—চালিয়ে যাও!'

ইতি মধ্যে আমাদের ভেলা নিশ্চয়ই প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। আমি যে-দড়ি ধরে ছিলাম তাতে জোর টান পড়েছে—আচমকা মাস্তুলের দড়িটা একটু ঢিলাও হয়ে গেল। কিন্তু ধাক্কাটা তলা থেকে, কি উপর থেকে এসেছে বলতে পারব না। আমি তো দড়ি ধরে বসেছিলাম। কয়েক মুহূর্তের জন্য জলে হারিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু দেহে যে-সহনশীলতা পঞ্জিভূত আছে তার চেয়ে ঢের বেশি সহনশীলতার প্রয়োজন—এই ধাক্কা সামলাতে। একমাত্র মানুষের দেহের কল-কবজায় যে-শক্তি আছে, তা পেশীর শক্তির চেয়ে অনেক বেশি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যদি মরতেই হয় ঝুলন্ত অবস্থায় মরব—দড়ির একটা গিঁটের মতো দড়ির অঙ্গাঙ্গী হয়ে। সমুদ্র অবিশ্রান্ত গর্জন করে চলেছে—ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে-যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ভয়াল দৃশ্য উদঘাটিত হল চোখের সামনে। কন-টিকির সমস্ত চেহারাটাই আমূল পালটে গেছে—যেন হঠাৎ যাদুদণ্ডের স্পর্শে। সমুদ্রে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস যে-ভেলার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত ছিলাম, সে আর তেমনটি নেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের আনন্দের জগত একটা বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

ভেলার পাটাতনের উপর নিজেকে ছাড়া আর একজনকে মাত্র দেখতে পেলাম। সে কেবিনের ছাদের কিনারায় লেপটে আছে। মুখটা নিচের দিকে, হাত দুটো দু-পাশে প্রসারিত আর কেবিনটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তাসের ঘরের মতো—ভেলার পিছন দিকে ডান পাশে কাত হয়ে। এই নিশ্চল মূর্তিটা হেরমানের। জীবনের কোন লক্ষণ নেই। প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে পর্বত প্রমাণ জল প্রবাহিত হয়ে

যাচ্ছে। লোহার মতো কঠিন মাস্তুলের দণ্ডটা দেশলাইয়ের কাঠির মতো মচ করে ভেঙ্গে গেছে। দণ্ডের উপরের অংশটা ভেঙ্গে পড়বার সময় ঢুকে গেছে কেবিনের ছাদের ভিতর দিয়ে। মাস্তুলটা তার সমস্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে একটা ছোট্ট কোণ করে প্রবাল-প্রাচীরের দিকে ঝুঁকে আছে ভেলার ডান পাশে। ভেলার পিছন দিকের দাঁড় নিয়ন্ত্রণের কাঠের খণ্ডটা তুবড়ে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে, আড়াআড়ি কাঠের বীমটা ভেঙ্গে দু-খানা আর দাঁড়টা গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো। ভেলার সামনের দিকের জল ছিটকানো আটকাবার যে তক্তাটা ছিল, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে চুরুটের বাক্সের মতো, সমস্ত পাটাতন ছিঁড়ে ফর্দাফাই—কেবিনের গায়ে ভিজে কাগজের মতো লেপটে আছে। বাক্সটাক্স, পাত্রটাত্র, ক্যানভাস, মালপত্তর, সবকিছু সেঁটে আছে দেয়ালের গায়ে। এখানে-ওখানে ভাঙ্গা বাঁশের চাকলা দড়িদড়া ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ চারদিকে একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থা।

আমার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে হিমেল আতঙ্কের প্রবাহ বয়ে গেল। এভাবে টিকে থেকে লাভ কি আমার? যদি একজনেরও প্রাণহানি হয়, সবকিছুই তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে। অথচ এই সংঘর্ষের পর একটি মাত্র মানুষের মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেলার বাইরে টরস্টেইনের কোমর থেকে কুঁচকি পর্যন্ত কুঁজো চেহারাটা দেখা দিল। সে মাস্তুলের দড়িদড়া থেকে ঝুলছিল বানরের মতো—কোন মতে ভেলার কাঠের উপর এসে পা রাখল—হামা টেনে এগিয়ে গেল কেবিনের সামনে ধ্বংস-স্তূপের দিকে। হেরমানও এবার মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। একটু ফিকে হাসি দেখা গেল মুখে। আশ্বাসের হাসি। কিন্তু নড়ল না আদৌ। অন্যেরা কে কোথায় আছে জানতে হাঁক-ডাক করতে লাগলাম। এমন সময় বেণ্টের প্রশান্ত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সবাই ভেলায় আছে, কেউ ভেসে যায়নি। এই এলোমেলো জিনিস পত্রের বেড়াজালে সবাই আছে দড়ি আঁকড়ে ধরে—বাঁশের চ্যাটাল বাখারি দিয়ে যে প্রতিবন্ধকের ব্যূহ রচনা করা হয়েছিল তার মধ্যে কোথাও।

এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে। ডাইনীর খপ্পর থেকে কন-টিকিকে বের করে নিয়ে এল প্রতিসরণ স্রোত-প্রবাহ। নতুন আর একটা ঢেউ এগিয়ে আসছে—শেষবারের মতো আমি চেঁচিয়ে সাবধান করে দিলাম। চারদিকে তর্জন-গর্জন চলছে—তার মধ্যে গলা ফাটিয়ে সাবধান করে বললাম, 'দড়ি ধরে থাকো!' আমিও তাই করলাম—ঝুলে রইলাম দড়ি ধরে। আবার ধেয়ে-আসা বারিরাশির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলাম যেন অন্তহীন দুই বা তিন সেকেণ্ডের মধ্যে। আমার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। দেখলাম, ভেলার কাঠগুলোর শেষপ্রান্ত প্রবাল প্রাচীরের একটা ধারাল ধাপের উপর আছড়াচ্ছে—প্রাচীরের উপর দিয়ে পার হয়ে যায়নি। আবার প্রতিসরণের টানে বের হয়ে এলাম আমরা—কেবিনের ছাদের কিনারায় যে

দুজন লোক হাত প্রসারিত করে শুয়ে ছিল, তাদের দিকে তাকালাম। এবার আর আমরা কেউ হাসলাম না। এই বাঁশের বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা প্রশান্ত কণ্ঠ শুনতে পেলাম—'না, এরকম চলতে পারে না।'

আমি নিজেও বেশ হতাশ হয়ে পড়েছি। মাস্তুলের মাথাটা ভেলার ডান পাশে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে জলের গভীরে। আর দড়ি ঢিলে হয়ে যাওয়ায় আমি ঝুলছি ভেলার বাইরে। আবার একটা ঢেউ এল। চলেও গেল। আমার তখন অত্যন্ত হা-ক্লান্ত অবস্থা। আমার তখন একমাত্র ইচ্ছে, কোনমতে ভেলায় উঠে প্রতিবন্ধকের ব্যূহের আড়ালে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ি কাঠের উপর। প্রতিসরণ-ঢেউ যখন পিছু হটে আসছিল, প্রথম আমি নিচের দিকে তাকিয়ে এবড়ো খেবড়ো প্রবাল প্রাচীরের অনাবৃত চেহায়াটা দেখতে পেলাম। ঐ উজ্জ্বল জলজলে লাল প্রবালের দিকে তাকিয়ে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টরস্টেইন মাস্তুলের একগুচ্ছ দড়ি ধরে। হুট ভেলার পিছনে ঝাঁপ খাবার উপক্রম করছে। আমি চিৎকার করে জানিয়ে দিলাম, কেউ যেন ভেলা থেকে না জলে নামে। জলের চাপে টরস্টেইন ভেসে গিয়েছিল ভেলার উপর থেকে, আবার বেড়ালের মতো লাফিয়ে উঠল ভেলার উপর।

আরও দুটো তিনটে ঢেউ চলে গেল আমাদের উপর দিয়ে কিন্তু ক্রমশ তাদের তীব্রতা কমে আসছে। তখন ঠিক কি ঘটেছিল আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আশেপাশে জল ফেনায়িত হয়ে উঠেছিল। আনি নিজে লাল প্রবাল-প্রাচীরের ভিতরে ক্রমশ নিচের দিকে ডুবে যাচ্ছিলাম—ভেলাটা তখন প্রাচীরের উপর উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ছিল। তখন শুধু লবণাক্ত ফেনময় জলধারার মতো ছিটকে ওঠা জলধারা ভেলার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছিল। আমি ভেলার কাছে এগিয়ে আসতে পেরেছিলাম—আমরা সবাই ভেলার কাঠের শেষ প্রান্তে জড়ো হয়েছি—কাঠগুলো প্রাচীরের উপর সব থেকে উঁচুতে উঠে গেছে।

সেই মুহূর্তে হুট গুটিসুটি মেরে নিচে নেমে এসে লাফ মেরে উঠে পড়ল প্রাচীরের উপর—দড়িটা হাতে ধরা। প্রতিসরণ-তরঙ্গ পিছু হটতে শুরু করেছে—ঘূর্ণায়মান জলের ভিতর দিয়ে কুড়ি গজ ভিতরে এগিয়ে গেল। দড়ির প্রান্ত হাতের মুঠোয় ধরে নিরাপদে দাঁড়িয়ে রইল হুট। পরবর্তী সফেন তরঙ্গ ধাওয়া করে এল। হারিয়ে ফেলল গতির তীব্রতাও। প্রবাল প্রাচীরের মাথাটা ওখানটায় চেপটা—তাই তরঙ্গহীন প্রশস্ত নদীর মতো জলধারা বয়ে যাচ্ছিল।

এবার ভেঙ্গে-পড়া কেবিনের ভিতর থেকে এরিক গুঁড়ি মেরে বের হয়ে এল। পায়ে জুতো। তারমতো আমরাও যদি করতে পারতাম, এত ধকল সহ্য করতে হত না। কেবিনটাকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যেতে পারে নি জলরাশি—ক্যানভাসের আবরনের নিচে শুধু চেপে চ্যাপটা করে দিয়েছে। এরিক মালপত্রের মধ্যে নিজেকে গুঁজে

চুপচাপ পড়ে ছিল। মাথার উপর দিয়ে গুরু গুরু গর্জন গড়িয়ে যাচ্ছে শুনতে পেয়েছে। ভেঙ্গেপড়া বাঁশের দেয়াল নিচের দিকে বেঁকে বসে গেছে। মাস্তুলটা ভেঙে পড়লে বেণ্ট আঘাত পেয়েছিলেন মাথায়। তিনি কোনমতে হামা টেনে এরিকের পাশে চলে এসেছিলেন। আমরা যদি আগেভাগে বুঝতে পারতাম, জলের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও বাঁশের চাটাই, বাখারির দেয়াল ও অগুণতি রজ্জু-বন্ধন প্রভৃতির মতো বালসা কাঠের লগার সঙ্গে অক্ষত অবস্থায় সেঁটে থাকতে পারব, আমরা তো ওখানেই আশ্রয় নিতে পারতাম।

এরিক এবার ভেলার পিছন দিকে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। সমুদ্র ভাঁটির টান সরে যেতেই সে লাফিয়ে পড়ল প্রবাল-প্রাচীরের উপর। তারপর নামল হেরমান। বেণ্টও নামলেন। প্রতিবারই ভেলাটা ঢেউয়ের ধাক্কায় একটু একটু করে ভিতরে ঢুকছে। টরস্টেইন ও আমার নামার পালা এলে ভেলাটা এত ভিতরে ঢুকে গেল যে তাকে পরিত্যাগ করে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এবার আমাদের সবকটি হাত ভেলা থেকে জিনিসপত্র উদ্ধারের কাজে ব্যাপৃত হল।

আমরা এবার প্রবাল-প্রাচীরের উপরের সেই দানবীয় ধাপ থেকে কুড়ি গজ দূরে সরে এসেছি। সেই ধাপের উপর এবং ধাপ ছাড়িয়েও অনেকটা স্থান জুড়ে একের পর এক ঊর্মিমালা ভেঙ্গে পড়ছে। প্রবাল কীটেরা পঞ্জরাস্থি দিয়ে অ্যাটল বা উপহ্রদ বেষ্টিত বলয়াকার দ্বীপটি এত উঁচু করে তৈরি করেছে যে সমুদ্র তরঙ্গের চূড়োর জলরাশির কিছুটা মাত্র আমাদের পাশ দিয়ে লেগুন বা উপহ্রদে এসে পড়ছে। লেগুনে মাছ কিলবিল করছে। এখানে প্রবালের সম্পূর্ণ নিজস্ব জগত—নানা আকার ও বর্ণালীর বিচিত্র সমাবেশ।

প্রবাল-প্রাচীরের অনেকটা ভিতর দিকে রবারের ডিঙ্গিটা দেখতে পাওয়া গেল। ভেসে চলেছে—জলে ভরতি। ডিঙ্গিটা ভেলার কাছে নিয়ে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম অর্থাৎ রেডিও-সেট, জলের বোতল ও রসদে ভরতি করে ফেললাম। তারপর সব সুদ্ধ প্রাচীরের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা মস্ত বড় ও উঁচু প্রবাল স্তূপের উপর তুলে দিলাম। এই প্রবাল স্তূপটা প্রাচীরের ভিতর দিকে উল্কা পিণ্ডের মতো নিঃসঙ্গ পড়ে আছে। আবার বিধ্বস্ত ভেলাটার কাছে ফিরে এলাম আরও মালপত্র নিতে। আমাদের চারপাশে যখন সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার খেলা শুরু হবে, সমুদ্র তখন কি মূর্তি ধারণ করবে আমাদের কল্পনার বাইরে।

প্রবাল-প্রাচীরের মধ্যে জল অগভীর। জলে সূর্যের আলোয় কি একটা চকচক করছে দেখতে পেলাম। জিনিসটা কি কুড়িয়ে নিতে এগিয়ে গেলাম। আরে, এ যে দেখছি দুটো খালি টিন! আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা নেই। ও দুটোকে এখানে দেখতে পাব ধারণার বাইরে। আমাদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল যখন

দেখলাম, ছোট্ট টিনের কৌটো দুটো সন্ত খোলা হয়েছে এবং টিনের গায়ে স্পষ্ট লেখা—পাইন আপেল। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করবার রসদের উপযোগিতা পরীক্ষা করার জন্য সরবরাহ-সচিব আমাদের খাওয়ার জন্য যে-টিনের কৌটো দিয়েছিলেন—এ দেখছি সেই রকম খাবারের কৌটো। কন-টিকির ডেকে বসে শেষ খানা খেয়ে যে টিনের কৌটো দুটো জলে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম—সেই কৌটো দুটো এরা। আমরা দেখছি কৌটো দুটোর পিছু পিছুই এসে গেছি।

আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি—ধারাল এবড়ো-খেবড়ো প্রবালের স্তূপের মধ্যে। অসমতল তলদেশ। তার উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। জল কোথাও হাঁটু গভীর —কোথাও কোমর অবদি পৌছচ্ছে অর্থাৎ প্রবালের মাঝ দিয়ে যেখানে নালা বা ছোট নদী ধারা চলে গেছে, এরকম স্থান দিয়ে যখন যাচ্ছি, জলের গভীরতা সেই অনুপাতে বাড়ছে-কমছে। আনিমন আর প্রবাল কীটের কল্যাণে সমস্ত প্রবাল প্রাচীর শ্যাওলা ক্যাকটাস ও জীবাশ্মে পরিণত গাছপালা শোভিত পাহাড়ী উদ্যানের রূপ পেয়েছে। লাল ও সবুজ, হলদে ও সাদা—চারদিকে রঙয়ের সে কি বাহার! বর্ণালীর এমন কোন রঙ নেই যা সেখানে শোভা পায়নি। হয় প্রবাল, নয়ত ছত্রাক, খোলাহীন বা খোলাযুক্ত শামুক-ঝিনুকের গায়ে অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সমাবেশ। কত অদ্ভুত অদ্ভুত আকারের মাছ চারদিকে কিলবিল করছে আর তাদের গায়ে কত বিচিত্র রঙয়ের ঝিলিমিলি! যেখানে জল একটু গভীর, সেখানে তিন-চার ফুট লম্বা হাঙরদের ঘুরতে ফিরতে দেখা যাচ্ছে। তারা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে—আমাদের চারপাশে ছোঁক-ছোঁক করে ফিরছে। স্ফটিক স্বচ্ছ জলে তাদের দেখতে পাচ্ছি। হাত দিয়ে জলে আঘাত করে তাদের তাড়িয়ে দিতে হচ্ছে দূরে। আমাদের কাছে তো এখন হাঙর মারার অস্ত্রশস্ত্র নেই।

আমরা এখন 'অকূল পাথারে' পড়েছি—চারদিকে শুধু জল থৈ থৈ করছে। আর ভিজে প্রবালের ছড়াছড়ি। দূরে লেগুনের শান্ত নীল জলে জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলেছে নিরন্তর। আশেপাশে প্রবালের স্তূপ জল থেকে মাথা জাগিয়ে তুলেছে। প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে সগর্জনে ভেঙ্গে পড়ছে—যেন এক তলা নিচে। আবার যখন জোয়ারের জল আছড়ে পড়বে এই সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের উপর তখন কি যে ঘটবে কে জানে! সময় থাকতে সরে পড়তে হবে।

উত্তরে থেকে দক্ষিণে অর্ধ নিমজ্জিত দুর্গ-প্রাকারের মতো এই প্রবাল প্রাচীর প্রসারিত। বেশ দূরে দক্ষিণে ঘন ও দীর্ঘ তাল-নারিকেল বৃক্ষ শোভিত একটা লম্বা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। আর উত্তর দিকে আমাদের থেকে একটু উঁচুতে ছশ থেকে সাতশ গজ দূরে আর-একটা অপেক্ষাকৃত বেশ ছোট তাল গাছ শোভিত দ্বীপ রয়েছে। প্রবাল-প্রাচীর ঘেরা দ্বীপ। তালগাছের মাথা আকাশ ছোঁয়া। তুষারের মতো সাদা

বালি আচ্ছাদিত বেলাভূমি—শান্ত লেগুনের জলে এসে মিশেছে। দ্বীপটাকে দেখাচ্ছে স্ফীতোদর ফুলের ঝুড়ির মতো। এই তো মর্ত্যের স্বর্গ!

এই দ্বীপটাকেই আমরা বেছে নিলাম।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল হেরমান। তার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। মুখে একটা কথাও নেই। শুধু হাত টান টান করে হাসছে মিটিমিটি। কন-টিকিকে এখনও দেখা যাচ্ছে দূরে প্রবাল-প্রাচীরের উপর—তার উপর দিয়ে থেকে থেকে জলধারা বয়ে যাচ্ছে। কন-টিকির এখন ধ্বংসাবস্থা। কিন্তু এ সম্মানহ ধ্বংসাবস্থা। ডেকের উপরের সবকিছু গুঁড়িয়ে গেছে। অথচ ইকুয়াডোরের কুয়েভেডোর অরণ্য থেকে আনা নটা বালসা কাঠ আগের মতো এখনও অটুটই আছে। তারাই আমাদের জীবন রক্ষক। সমুদ্র আমাদের রসদটসদের সামান্যই ক্ষতি করতে পেরেছে। আর কেবিনের মধ্যে যা-যা জমা করেছিলাম, তার কোনই ক্ষতি হয়নি। সত্যিকার মূল্য আছে যার—সবকিছু বের করে নিয়ে এসেছি। সেগুলো এখন প্রবাল প্রাচীরের ভিতর দিকে সূর্যকরোজ্জ্বল উঁচু শৈলস্তূপের উপর নিরাপদে রক্ষিত।

আমি ভেলা থেকে লাফিয়ে নেমেছিলাম, তাই ভেলার সামনে যেসব পাইলট মাছেরা গুলতানি করছিল, দেখতে পাইনি তাদের। বিরাট বালসা কাঠের ভেলাটা এখন প্রবাল প্রাচীরের উপর যেখানে রয়েছে, সেখানকার জলের গভীরতা ছ-ইঞ্চি। শুধু সামনের দিকে ভেলার কাঠের নিচে স্নাগেরা গা মোচড়া-মোচড়ি করছে। পাইলট মাছেরা উধাও। ডলফিনরাও বেপাত্তা। কেবলমাত্র চ্যাপটা শরীর, ভোঁতা লেজ—দেখতে অনেকটা ময়ূরের মতো এক ধরণের অজানা মাছ দুই কাঠের ফাঁক দিয়ে লেজ ঢোকাচ্ছে—বের করে আনছে। দুরন্ত কৌতূহলে উচ্চকিত। আমরা নতুন জগতে এসে পড়েছি। জোহান্‌নেসও ছেড়ে গেছে তার গর্তের আশ্রয়। নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছে আর একটা নিভৃত ডেরা—যেখানে ঘাপটি মেরে থাকতে পারবে।

ধ্বংসপ্রায় ভেলার উপর থেকে চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। একটা চ্যাপটা ঝুড়িতে নারকেল গাছের চারা দেখতে পেলাম। কোন একটা চোখ থেকে ইঞ্চি দশেক লম্বা অঙ্কুর গজিয়েছে। নিচের দিক থেকে দুটো শেকড়ও বেরিয়ে এসেছে। নারকেলের চারাটা হাতে নিয়ে দ্বীপের দিকে রওনা দিলাম। নুটও একটু আগে হাঁটা দিয়েছে দ্বীপের দিকে। তার হাতে একটা খেলনা-ভেলা। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এটাকে সে তৈরি করেছে বসে বসে। বেণ্টকেও পেরিয়ে এলাম। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর স্টুয়ার্ড। কপালের খানিকটা মার্বেলের গুলির মতো ফুলে উঠেছে। দাড়ি থেকে টস্‌টস্ করে জল ঝরছে। কুঁজো হয়ে একটা বাক্স ঠেলে নিয়ে চলেছেন তিনি। বাক্সটা নাচছে প্রতিমুহূর্তে—যখনি ঢেউ প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়ে লেগুনের দিকে জল ছুঁড়ে দিচ্ছে পিচকারির মতো। বেশ গর্বের সঙ্গে

বাক্সটা খুলে দেখছেন মাঝে মাঝে। এটা তাঁর রান্নার বাক্স। ভিতরে আছে রান্নার স্টোভ আর বাসন-কোসন—বেশ গোছগাছ করে রাখা আছে তাতে।

প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে জল ভেঙ্গে যখন তালীবৃক্ষ-বন্দিত স্বর্গোপম দ্বীপের দিকে যাচ্ছিলাম, সেদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলব না। যতই এগোচ্ছি দ্বীপটা ততই বৃহদাকার চেহারা ধারণ করছে। সাদর আহ্বান জানাচ্ছে আমাদের। রোদে ঝলমল বেলাভূমিতে পৌঁছে আমি পায়ের জুতো খুলে ফেললাম। আতপ্ত হাড়ের মতো শুকনো খটখটে বালির মধ্যে অনাবৃত পা ঢুকিয়ে দিলাম। এই অহল্যা বেলাভূমিতে প্রতিটি পদচিহ্ন দেখে মন আমার আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। বেলাভূমি তাল গাছের গুঁড়িতে এসে শেষ হয়েছে। শীগগিরই তাল গাছ আমার মাথায় ছাতি মেলে ধরল। আমি এগিয়ে চললাম ছোট্ট দ্বীপের নাভি-কেন্দ্রের দিকে। সবুজ নারকেল গাছের পাতার নিচ থেকে নারকেল থোকা থোকা ঝুলছে। ছোট ছোট ঘন সবুজ প্রচুর সরস পাতায় ঢাকা ঝোপঝাড়। তুষার সাদা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে ঝোপঝাড়। এত মন-মাতানো মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে ফুল থেকে যে আমার তো প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা। দ্বীপের অভ্যন্তর থেকে দুটো শান্ত শঙ্খচিল এসে আমার মাথার উপর উড়ে বেড়াতে লাগল—যেন কত পোষা। সাদা ধবধবে আর পাখির পালকের মতো হালকা। পায়ের আশপাশ থেকে কয়েকটা কৃকলাস ছিটকে পালিয়ে গেল। এই দ্বীপের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাসিন্দে হল রক্ত-লাল বড় সড় ঝিঁঝিঁকাকড়ারা। তারা চারদিকে গাদাগাদি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পিছনের নরম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চুরিকরা ডিমের মতো বড় শামুকের খোলক লেগে আছে।

সব দেখেশুনে আমি একেবারে অভিভূত। হাঁটু গেড়ে বসে নরম গরম বালিতে আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম আমি।

সমুদ্র-অভিযানের ইতি। সবাই আমরা বেঁচে আছি। তীরে এসে পৌঁছেছি—প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের লোকবসতিহীন একটি ছোট্ট দ্বীপে। কি অপূর্ব দ্বীপ! টরস্টেইনও এসে পড়েছে। কাঁধ থেকে একটা ঝোলা ফেলে দিয়ে চিত-পাত হয়ে সটান শুয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখতে লাগল তাল-নারকেল গাছ, সাদাসাদা পাখি—পালকের মতো হালকা। নিঃশব্দে আমাদের মাথার উপরে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা।

আমরা ছ জন এসে মিলিত হলাম। প্রত্যেকেই শুয়ে পড়েছে মাটিতে। আমাদের মধ্যে হেরমানই সবসময় সক্রিয়—কর্মচঞ্চল। একটা নারকেল গাছে উঠে সে একগুচ্ছ সবুজ ডাব পেড়ে আনল। ছুরি দিয়ে ডাবের মুখটা কেটে ফেললাম—তারপর ঢুকটো করে গলায় ঢেলে দিলাম পৃথিবীর সব থেকে মিষ্টি ক্লান্তি-নিরোধক পানীয়—মিঠে, ঠাণ্ডা প্রাণ-জুড়ানো কচি ডাবের জল। বাইরে প্রবাল প্রাচীরের গায়ে অশ্রান্ত বেজে চলেছে

স্বর্গরাজ্যের রক্ষী-বাহিনীর দামামা পেটানো।

'নরক একটু ভিজে স্যাঁতস্যেঁতে', বললেন বেণ্ট, 'কিন্তু স্বর্গ আমি যেমন কল্পনা করতাম অনেকটা সেই রকমই।'

আমরা বেশ আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে দেহ এলিয়ে মাটিতে শুয়ে রইলাম। অয়নবায়ু তাড়িত সাদা সাদা মেঘ নারকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে পশ্চিম দিকে। এখন আর নিরুপায়ের মতো তাদের পিছনে ধাওয়া করার কোন কারণ নেই। আমরা এখন পলিনেশিয়ায় স্থিতু লাভ করেছি—অনড়, অচল।

আমরা হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছি আর বাইরে ঢেউ-এর সারি ট্রেনের মতো ঝম ঝম আওয়াজ তুলে ইতস্ততঃ ছুটছে দিগন্তের কোল ঘেঁষে।

বেনেট ঠিকই বলেছেন। আমরা এখন স্বর্গে আছি!

॥ ৮ ॥

ছোট্ট দ্বীপ। জনবসতি হীন। প্রতিটি নারকেল কুঞ্জ, প্রতিটি বেলাভূমি আমাদের নখদর্পণে এসে যাবে। কারণ আড়াআড়ি ভাবে দ্বীপটা মাত্র দুশ গজ। সব থেকে উঁচু জায়গা লেগুন থেকে মাত্র ছ-ফুট উঁচু। নারকেল গাছের মাথায় বড় বড় গুচ্ছে সবুজ ডাব ঝুলছে। সবুজ ছোবড়ার খোলসের অভ্যন্তরে আছে ঠাণ্ডা পানীয়—গরম দেশের রোদের ঝাঁজ থেকে সুরক্ষিত। কাজেই সপ্তাহ খানেক আমাদের আর তেষ্টার জলের জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। ঝুনো নারকেলেরও অভাব নেই, তপস্বী কাঁকড়ার ঝাঁক, লেগুনে কত রকমারি মাছ—আমাদের খাওয়া-থাকার চিন্তাই করতে হবে না, বেশ আরামেই থাকব।

দ্বীপের উত্তর দিকে একটা পুরানো ক্রুশ কাঠ দেখতে পেলাম। অর্ধেকটা প্রবাল দ্বীপের বালিতে প্রোথিত। রঙটং করা নয়। এখানেই উত্তর দিকে প্রবাল-প্রাচীর বরাবর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সরু ও লম্বা কাঠের টুকরো দেখতে পেয়েছিলাম প্রথমে। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তখন সেই দিক বরাবর ভেসে আসছিলাম। আরও উত্তরে আর একটা ছোট দ্বীপের নারকেল গাছের মাথার আবছা নীলাভ আভাস দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু দক্ষিণ দিকের দ্বীপ আরও কাছে মনে হল। সেখানে গাছ-গাছালি আরও ঘন সন্নিবিষ্ট। সেখানেও প্রাণের কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। সে যাই হোক—এখন আমাদের অন্য অনেক বিষয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপার আছে।

রবিনসন ক্রুশো হেসেলবার্গ বড় খড়ের টুপি বোঝাই ঋষিকাঁকড়া নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল। কয়েকটা শুকনো কাঠের টুকরোয় অগ্নি সংযোগ করল নুট। শীগগিরই কাঁকড়া, নারকেলের জল ও কফি সহযোগে আমরা ভোজ-পর্ব সমাধা করলাম।

'বৎসগণ, তীরে পৌঁছে আনন্দ হচ্ছে না, কি ?' উল্লসিত কণ্ঠে প্রশ্ন রাখল হুট। আংগাটাউতে নিজেই এই আনন্দের স্বাদ একবার উপভোগ করেছে সে। বলতে বলতে হোঁচট খেল আর আধ কেতলী গরম জল বেনেটের খালি পায়ের উপর ঢেলে দিল। একশ এক দিন সমুদ্রের বুকে ভেলায় কাটিয়েছি—তাই আজ ডাঙ্গায় প্রথম দিনটিতে সবারই বেসামাল অবস্থা। নারকেল গাছের গুঁড়ির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। যে-ঢেউ-এর আক্রমণ প্রতিহত করতে ডাঙ্গায় পা দিয়েছি, সে-আক্রমণ আর হয়নি।

বেণ্ট যখন আমাদের প্রত্যেকের হাতে খাবারের থালা ধরিয়ে দিলেন, এরিক বত্রিশ পাটি দাত বিকশিত করে হেসে উঠল। আমার তো মনে পড়ে গেল ভেলার উপর শেষ যেদিন খেয়েছিলাম, আমি একটু কাত হয়ে বাসন-কোসন ধুয়েছিলাম, যেমন রোজ ধুতাম আর এরিক প্রবাল-প্রাচীরের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলেছিল, 'আজকে আর ধোওয়া-পাকলা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' রান্নার বাক্সে নিজের বাসনের খোঁজ করেছিল, দেখে সেগুলো আমার গুলোর মতোই ঝকঝক তকতক করছে।

খাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ মাটিতে শুয়ে থাকার পর আমরা ভেজা রেডিও-এর সাজ-সরঞ্জাম ঠিকঠাক করতে লেগে গেলাম। খুব তাড়াতাড়িই কাজটা সেরে ফেলতে হবে—যাতে টরস্টেইন ও হুট বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ করতে পারে। তা নাহলে বারোটোঙ্গার লোকটি আমাদের মর্মান্তিক চরম সর্বনাশের খবর রটিয়ে দেবে সর্বত্র।

রেডিও-এর বেশির ভাগ সাজ-সরঞ্জামই তীরে নামান হয়েছে। প্রবাল-প্রাচীরের উপর যেসব জিনিসপত্র ভাসছিল তার মধ্যে একটা বাক্স দেখতে পেয়ে বেণ্ট সেটি হাতে তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠলেন। সন্দেহ নেই সেটি রেডিও এর সরঞ্জামের অন্তর্ভুক্ত। অপারেটাররা স্ক্রু আলাগা করা, সংযোজন করা প্রভৃতি কাজে যখন ব্যস্ত ছিল, আমরা তখন একটা তাঁবু খাটাতে মনোনিবেশ করলাম। ভেলার উপর ভারী জলে-ভেজা পালটা ছিল। সেটাকে টেনে এনে তীরে তুললাম। দুটো নারকেল গাছের মাঝখানে একটু ফাঁকা স্থান পেয়ে পালটা ঐ দুটো গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম। জায়গাটা লেগুনের মুখোমুখি। তাঁবুর আর দুটো কোণ দুটো বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাদের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। তিন দিকে সপুষ্পক ঘন ঝোপ থাকায় বেড়া ও ছাদের ব্যবস্থাও হল। খোলা দিকটা রইল লেগুনের মুখোমুখি। তাঁবুর ভিতরটা সুগন্ধে ম-ম করতে লাগল। বেশ উত্তেজক গন্ধ। এখানে থাকতে বেশ ভালোই লাগছিল। আমরা স্মিত হাসলাম, সবাই এই আরামটুকু নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে লাগলাম। টাটকা নারকেল পাতা বিছিয়ে শয্যা রচনা করা হল। আলাগা প্রবালের ডালপালা সব মাটি থেকে তুলে ফেললাম—এগুলো মাটিতে গাঁথা ছিল এবং বেশ অসুবিধের সৃষ্টি করছিল। রাত ঘনিয়ে আসবার আগেই আমরা এক দফা নিবিড় বিশ্রাম সুখ উপভোগ করে নিলাম। মাথার উপর বুড়ো প্রিন্স

কন-টিকির শ্মশ্রুমণ্ডিত মাথাটি দেখতে পাচ্ছি। পিছনে পূবেল হাওয়ায় আর বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। সে এখন নিশ্চল—চিত হয়ে শুয়ে আছে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে। তারারা পলিনেশিয়ার দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করছে।

চারপাশের ঝোপঝাড়ের উপর ভিজে পতাকা ও স্লিপিং-ব্যাগগুলো শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এরা ছাড়াও আরও অনেক জিনিসপত্র বালিময় তারে ছড়ানো-ছিটনো রয়েছে। রোদে শুকোবে। এই সূর্য-করোজ্জ্বল দ্বীপে আর একটা দিন কাটাতে পারলে সবকিছু শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে উঠবে। রেডিও-বিশারদরাও রেডিও-এর ভিতরের যন্ত্রপাতি রোদে শুকনোর জন্য ফেলে রাখল। গাছ থেকে স্লিপিং-ব্যাগগুলো নামিয়ে উল্টে-পাল্টে দিলাম। কার ব্যাগটা সব থেকে বেশি শুকনো খটখটে, তা নিয়েও কথা কাটাকাটি হল কিছুক্ষণ। বেণ্টই শেষ পর্যন্ত জিতলেন, কারণ তাঁর ব্যাগটাই ওল্টনো-পাল্টানোর সময় বেশি পোঁচ পোঁচ শব্দ করল না। ঘুমোতে পারা যে কত আনন্দের একমাত্র ঈশ্বরই তা জানেন!

পরের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি পালটা কেমন ঝুঁকে পড়েছে—পালের উপর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলকণা টলমল করছে। বেণ্ট জলটা সংগ্রহ করে ফেললেন—তারপর মনের আনন্দে হেলতে দুলতে এগিয়ে গেলেন লেগুনের দিকে। প্রাতরাশের জন্য অদ্ভুত কতকগুলো মাছ ধরলেন। বালিতে নালা কেটে মাছগুলোকে সেই নালার মধ্যে ঢুকিয়ে তারপর ছেঁকে তোলেন।

লিমা থেকে যাত্রার সময় হেরমান ঘাড়ে ও পিঠে আঘাত পেয়েছিল। সেই ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। ফিরে এসেছে এরিকের অদৃশ্য-হওয়া লামবাগো। কিন্তু আমরা অটুট স্বাস্থ্য নিয়েই প্রবাল-প্রাচীর পেরিয়ে এসেছি। সামান্য একটু-আধটু অঘোত পেয়েছি—বা ছড়ে গেছে এখানে-ওখানে। একমাত্র মাস্তুলটা ভেঙ্গে পড়লে বেণ্ট কপালে আঘাত পেয়েছিলেন। আঘাতটা খুব গুরুতর কিছু নয়। আর দড়ির চাপে ও ঘর্ষণে সবারই হাতে অল্প বিস্তর কালশিরা পড়ে গিয়েছিল।

তবে কেউই এমন অসুস্থ নয়। তাই প্রাতরাশ খাওয়ার আগে ঝকঝকে লেগুনের জলে একটু সাঁতার কাটার লোভ সামলাতে পারল না। আকারে বেশ বড়ই লেগুনটা। দূরে জল নীল আর অয়ন বায়ুর আলোড়নে ছোট ছোট ঢেউ-এ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এত প্রশস্ত যে দ্বীপের নারকেল গাছের মাথার উপরের নীলাভ কুয়াশাচ্ছন্ন পাতার আভাসই মাত্র দেখতে পাচ্ছি—ওখানটায় বলয়াকার প্রবাল-দ্বীপ বাঁক নিয়েছে আর একদিকে। কিন্তু এই দ্বীপের অভ্যন্তরে অয়ন বায়ু বয়ে চলেছে শান্ত মূর্তিতে—গাছের পাতা নাচিয়ে। ডালপালা মৃদুমন্দ আন্দোলিত হচ্ছে। লেগুনকে দেখাচ্ছে নিথর আয়নার মতো—সৌন্দর্যমণ্ডিত দ্বীপটি আয়নায় যেন মুখ দেখছে। জল তীব্র লবনাক্ত কিন্তু জল এত স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন যে স্ফুট গভীর জলের তলায় বিচিত্র বর্ণের প্রবালরা

জলের উপরিতলের এত কাছে মনে হচ্ছে যে সাঁতার কাটতে গেলে হাত পা ছড়ে যাওয়ার ভয় হতে লাগল। জলে সাঁতার কাটছে অজস্র সৌন্দর্যের আধার নানা বর্ণের নানা আকারের মাছ। চিত্ত বিনোদনের পক্ষে এ এক অপূর্ব জগত। জল ঠাণ্ডা। ততটুকু ঠাণ্ডা যা হলে আরাম পাওয়া যায়। বাতাস রোদে আতপ্ত ও শুকনো। তাড়াতাড়ি তীরে উঠতে হবে। দিনের শেষে ভেলা থেকে কোন খবর না পৌছলে রারোটোঙ্গা থেকে ভয়াল বার্তা প্রেরিত হবে বেতারে।

প্রবালের চাঁইয়ের উপর রেডিয়োর তার ও অন্যান্য অংশ শুকোতে দেওয়া হয়েছে রোদে। হুট আর টরস্টেইন দ্রুত বিভিন্ন অংশ সংযোজিত করে স্ক্রু এঁটে দিল। সারাটা দিন কেটে গেল। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। আমরা অন্য কাজকর্ম ফেলে রেডিও-এর চারপাশে জড়ো হলাম—যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেই আশায়। রাত দশটার আগে বেতার-সংযোগ করতেই হবে। কারণ তারপর ছত্রিশ ঘণ্টার সময় সীমা পেরিয়ে যাবে আর রারোটোঙ্গার লোকটি সাহায্যের জন্য প্লেন পাঠানোর আবেদন জানিয়ে বার্তা পাঠাবে।

দুপুর কেটে গেল—বিকেল এল। সূর্যও ডুবে গেল। এখনও রারোটোঙ্গার লোকটি যদি আত্মসম্বরণ করে থাকে! সাতটা বাজল, আটটা—ন-টা। স্নায়ুর উপর চাপ শেষ পর্যায়ে পৌছেচে। বেতার-প্রেরক যন্ত্রে জীবনের কোন সাড়াই নেই। কিন্তু বেতার প্রাপক যন্ত্রে সাড়া পাচ্ছি। ক্ষীণ গানের সুর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রেরক-যন্ত্র এখনও পাথরের মতো মৃত—বর্ত্মক্ষেপ আর সর্বত্র বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এক ঘণ্টারও কম সময় হাতে আছে। এ রকম চললে তো হবে না! সাধারণ বেতার-প্রেরক যন্ত্রের আশা ছেড়েই দেওয়া হল। এবার ছোট যুদ্ধের সময়কার অন্তর্ঘাতমূলক বেতার-প্রেরক যন্ত্রের সাহায্য নিলাম। দিনের বেলা এটাকে নিয়ে অনেকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু কোনই সুরাহা হয়নি। হয়ত এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। ব্যাটারিটা বিলকুল নষ্ট। ছোট্ট হাত-জেনারেটার ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে লাগলাম। বেশ ভারী যন্ত্রটা। রেডিও-এর ব্যাপারে আমরা চারজনই গোলালোক। সারাদিন ধরে এটাওটা ঘুরিয়ে নাড়িয়ে এই জঘন্য যন্ত্রটা চালাতে চেষ্টা করেছি।

ছত্রিশ ঘণ্টার মেয়াদ শীগগিরই ফুরিয়ে যাবে। মনে পড়ছে, কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল—'আর সাত মিনিট বাকি আছে।' 'আর পাঁচ মিনিট।' এরপর কেউ আর তার ঘড়ির দিকে তাকাবেও না। বেতার-প্রেরক যন্ত্রটা আগের মতোই বোবা হয়ে আছে। কিন্তু রিসিভারটা থেকে থেকে লাফিয়ে উঠছে—ঠিক বেতার-তরঙ্গকে পাকড়াও করতে। হঠাৎ রারোটাঙ্গার বেতার চালকের বেতার-তরঙ্গের

স্পন্দনের উপর দ্রুত আঘাত হল। আমরা জানতে পারলাম সে এখন তাহিতির সব কটি টেলিগ্রাফ স্টেশানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। এবার রারোটোঙ্গা থেকে প্রেরিত বার্তার টুকরো টুকরো কথা শুনতে পেলাম।

'...এদিকে কোন প্লেন নেই। আমি স্থির নিশ্চিত...'

তারপর আর কোন খবর নেই। হারিয়ে গেল খবরের সূত্র। অসহ্য চাপ পড়ছে স্নায়ুর উপর। সেখানে এখন কি ঘটছে? তারা কি ইতিমধ্যেই বিমান পাঠিয়েছে অভিযানকারীদের উদ্ধার করতে? কোন সন্দেহ নেই, বেতার তরঙ্গ মারফত আমাদের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

অপারেটার দুজন পাগলের মতো কাজ করে চলেছে। আমরা যারা জেনারেটারের হ্যাণ্ডেল ঘুরোচ্ছি, আমাদের মতো তাদেরও গাল বেয়ে টসটস করে ঘাম ঝরে পড়ছে। হ্যাঁ, এবার একটু একটু করে এয়ারইঅ্যালে শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। উল্লসিত টরস্টেইন স্কেলের গায়ে তীরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এবার শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে প্রেরক যন্ত্রে। বেতার-তরঙ্গ আসা-যাওয়া করছে।

আমরা পাগলের মতো হাতল ঘোরাতে লাগলাম, টরস্টেইন রারোটোঙ্গার লোকটাকে ডাকছিল। কেউ আমাদের ডাক শুনতে পায়নি। আরও চেষ্টা করা হল। গ্রাহক যন্ত্র কাজ করছে। রারোটোঙ্গা কই শুনতে পারছে আমাদের কথা! লস অ্যাঞ্জেলের হল, ফ্রাঙ্ক ও লিমার নৌ-বিদ্যালয়কে ডাকলাম। কিন্তু কেউই তো শুনতে পাচ্ছে না আমাদের ডাক!

এরপর টরস্টেইন সি. কিউ বার্তা পাঠাল—অর্থাৎ সে পৃথিবীর সমস্ত রেডিও স্টেশানকে ডাকতে লাগল যারা আমাদের বিশেষ ধরনের প্রেরিত তরঙ্গ বার্তা শুনতে পাবে।

কিন্তু তাও ব্যর্থ হল। এবার যেন ইথার থেকে কার একটা ক্ষীণ আহ্বান আসছে। আমরা আবার ডাকলাম—জানালাম তার ডাক শুনতে পাচ্ছি। এবার ইথারের ক্ষীণ আওয়াজ বলল, 'আমার নাম পল। আমি কোনারাডোতে থাকি। তোমার নাম কি? কোথায় থাক তুমি?'

টরস্টেইন চাবি ঘোরাতে লাগল—এদিকে আমরাও অবিশ্রাম হাতল ঘুরিয়ে চলেছি। জবাবে বললাম—'আমরা কন-টিকি থেকে বলছি। আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের এক জনহীন দ্বীপে আটকা পড়েছি।'

পল এই বার্তা বিশ্বাস করল না। সে ভাবল, পাশের রাস্তার কোন পাজি ছেলে তার সঙ্গে রসিকতা করছে। সে আর কোন বার্তা পাঠাল না।

হতাশায়-ব্যর্থতায় আমরা নিজেদের চুল ছিঁড়তে লাগলাম। নক্ষত্রখচিত আকাশের চন্দ্রাতপতলে নারকেল গাছের নিচে একটা জনমানবহীন দ্বীপে বসে আছি

আমরা। যা আমরা বলছি কেউ বিশ্বাস করছে না!

টরস্টেইন আশা ছোড়নেওয়ালা নয়। আবার সে চাবি ঘোরাতে লাগল। 'সবাই ভালো আছি। ভালো আছি!' অনর্গল বকে যেতে লাগল। যেমন করেই হোক উদ্ধারকারীদের নিবৃত্ত করতেই হবে। তারা যেন কোনমতেই প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে না পড়ে। এবার প্রাপকযন্ত্রে ক্ষীণ আওয়াজ এল, 'যদি সবাই ভালো আছ, তবে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছ কেন?'

ঐ পর্যন্তই। আবার ইথারে কোন সাড়া শব্দ নেই। নিশ্চুপ।

আমরা এত মরিয়া হয়ে উঠেছি যে পারলে নারকেল গাছে উঠে গাছ ঝাঁকিয়ে সব ডাব পেড়ে ফেলতাম! একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কি করতে পারতাম, যদি না রারোটোঙ্গার লোকটি আর প্রিয় হাল আমাদের কথা শুনতে পেত! হাল তো আনন্দে কেঁদে ফেলল। তখুনি স্নায়ুচাপ শিথিল হয়ে এল। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে আবার আমরা একা—নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। কেউ আমাদের বিরক্ত করবার নেই। হৃত ক্লান্ত! নারকেল পাতার বিছানায় পা টান-টান করে শুয়ে আছি।

পরের দিন সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিলাম। এবার পরিপূর্ণ মহিমায় জীবনটা উপভোগ করতে লেগে গেলাম। কেউ প্রাণ ভরে স্নান করছে, কেউ মাছ ধরছে, কেউ বা ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রবাল-প্রাচীরে যদি কোন রহস্যময় সামুদ্রিক জীবের সন্ধান পাওয়া যায় তারই খোঁজে। আমাদের মধ্যে সব থেকে উৎসাহী কর্মঠ যে, তাঁবু ও তাঁবুর আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শোভন করে তোলবার কাজে লেগে গেল সে।

যে-বিন্দু থেকে কন-টিকিকে সরাসরি দেখা যায় সেখানে গাছের গোড়ায় একটা গর্ত কাটলাম। গর্তের চারধারটা লতা দিয়ে সাজালাম—তারপর পেরু থেকে আনা অঙ্কুর উদগত নারকেলটি মাটিতে পুঁতলাম। পাশেই প্রবালের স্তূপ সাজিয়ে রাখলাম—যেখানে কন-টিকি চড়ায় এসে আটকেছে, ঠিক তার বিপরীতে।

রাতের মধ্যে কন-টিকি তরঙ্গ-তাড়িত হয়ে আরও অনেকটা ভিতরে ঢুকে পড়েছে। প্রায় শুকনো খটখটে অবস্থা।

চারদিকে প্রবাল স্তূপ জড়ো হয়ে মাঝখানে একটা ডোবা সৃষ্টি করেছে। কন-টিকি কোনমতে নাক গলিয়ে ঠেলেঠুলে এই ডোবার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। জায়গাটা প্রবাল প্রাচীরের গায়েই—বেশ কিছুটা দূরে।

তপ্ত বালিতে শরীরটাকে আচ্ছাসে চাটুসঁ্যাকা করে নিয়ে এরিক আর হেরমান চমৎকার চাঙ্গা ও সজীব হয়ে উঠেছে। প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে দক্ষিণের দ্বীপটার দিকে অভিসার চালাতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। ঈল মাছ সম্বন্ধে ওদের সাবধান করে দিলাম। হাঙরের ভয় তত নেই। প্রত্যেকেই বেল্টে ঝুলিয়ে নিল বড় ম্যাচেট ছুরি। আমি জানতাম প্রবাল-প্রাচীর ভয়াল ঈলমাছের আড্ডা

খানা। তাদের দাঁত যেমন ধারাল তেমনি বিষাক্ত। দাঁত দিয়ে অতি সহজেই মানুষের পা কেটে নিতে পারে। এমন অদ্ভুত বিদ্যুৎ গতিতে কিলবিল করতে করতে এসে আক্রমণ করে মানুষকে যে এখানকার অধিবাসীরা হাঙরকে যত না ভয় করে, তার চেয়ে বেশি ভয় করে এদের। তারা হাঙরদের সঙ্গে পাশাপাশি সাঁতার কাটতে ভয় খায় না।

এরা দুজন প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে দীর্ঘপথ দক্ষিণে জল ভেঙে যেতে সক্ষম হল, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এমন জায়গা আছে যেখানে জল খুব গভীর—যে-জায়গা তাদের সাঁতারে পার হতে হবে। তাছাড়া এ জায়গা দিয়ে জল সর্বক্ষণ ভিতরে ঢুকছে বা বের হয়ে আসছে সমুদ্রের বুকে। যা হোক তারা নিরাপদে দক্ষিণের বড় দ্বীপে এসে পৌছল—জল ভেঙে তীরে উঠল।

দ্বীপটি বেশ লম্বা কিন্তু প্রস্থে ছোট। দক্ষিণ দিকে দূর প্রসারিত। রৌদ্র-তপ্ত বালিময় সৈকতভূমি ঘিরে রেখেছে দুদিকে। কাছেই প্রবাল প্রাচীরের পরিখা। ঘন নারকেল বন। দুজনে হাঁটা দিল। হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বিন্দুতে এসে পৌছল। এরপর প্রবাল-প্রাচীর সফেন জলধারায় পরিস্নাত হয়ে এগিয়ে গেছে আরও দক্ষিন দিকে—আরও অন্যান্য দ্বীপের দিকে। এখানেও একটা বড় জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। চারটে মাস্তল দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে বেলাভূমির উপর। একটা স্পেনীয় বাণিজ্য-জাহাজ। জাহাজে অনেক রেল ছিল—মরচেধরা কত রেল পড়ে আছে এখানে-ওখানে। তারা অন্য পাশ দিয়ে ফিরে এল। কিন্তু বেলাভূমিতে মানুষের আসা-যাওয়ার কোন পথ দেখতে পেল না।

প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়েই আবার ফিরে আসতে লাগল তারা। ফেরার পথে অদ্ভুতদর্শন মাছের সঙ্গে মোলাকাত হতে লাগল অনবরত। তাদের ধরবারও চেষ্টা করেছিল তারা।

এই সময় আটটা বড় বড় ঈল মাছ আক্রমণ করে বসল তাদের। স্বচ্ছ জলে তাদের এগিয়ে আসতে দেখে তারা দুজন একটা বড় প্রবাল স্তূপের উপর লাফিয়ে উঠল। এটার চারপাশ ও তলা দিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল ঈলরা। হড়হড়ে গা। এক একটা মানুষের পায়ের গুলের মতো মোটা হবে। গায়ে কালো ও ছিটছিট দাগ। দেখাচ্ছিল ঠিক বিষধর সাপের মতো। মাথাটা ছোট। সাপের মতোই চোখদুটো জীঘাংসাপূর্ণ। দাঁতগুলো ইঞ্চিখানেক লম্বা আর মুচিদের স্থচের মতো ধারাল। ওদের কাছাকাছি আসতেই ওরা ছুরি চালাল। একটার মাথা গেল উড়ে—আর একটা আহত হল মারাত্মকভাবে। রক্তের গন্ধ পেয়ে এক ঝাঁক ছোট নীল হাঙর এসে জড়ো হল। তারা আহত ও নিহত ঈলদুটোকে আক্রমণ করল। সেই সুযোগে এরিক ও হেরমান আর একটা প্রবাল স্তূপের উপর লাফিয়ে পড়ে নিঃসাড়ে কেটে পড়ল।

সেই দিনই আমি জল ভেঙ্গে যাচ্ছিলাম এমন সময় কি যেন বিদ্যুৎ গতিতে এসে আমার পায়ের গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরল—দু-পাশ থেকে। বেশ জোরেই। একটা কাট্‌ল মাছ। খুব বড় নয় কিন্তু মনে এক বীভৎস ভাবের সৃষ্টি হল। নীলাভ লাল সচক্ষু থলে, জুল জুল করছে ছোট ছোট দুটো অশুভ চোখ—এমন একটা জীব হিমেল হাত দিয়ে শক্ত করে পা চেপে ধরলে আর তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলে আতঙ্কে মন কুঁকড়ে যায় বইকি! আমি যত জোরে পারলাম পা ঝাঁকালাম। কিন্তু তার নাগপাশ থেকে পা মুক্ত করতে পারলাম না। অথচ স্কুইডটা তিন ফুটের বড় হবে না। আমার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। হয়ত তারই লোভে আকৃষ্ট হয়েছে। পা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তীরের দিকে এগুতে লাগলাম। তখনও বিরক্তিকর প্রাণীটি পায়ের সঙ্গে ঝুলছে। যখন শুকনো বালিতটের কিনারায় এলাম, তখন মুঠি আলগা করে দিল। ধীরে ধীরে সেটা অগভীর জলের ভিতর দিয়ে ফিরে চলল—হাতগুলো প্রসারিত করে। চোখ কিন্তু তীরের দিকে নিবদ্ধ। ভাবখানা দরকার হলে এক হাত লড়ে যেতে আপত্তি নেই। আমি একমুঠো প্রবাল পাথর ছুঁড়ে মারতেই ব্যাটা দ্রুত সটকে পড়ল।

বাইরে প্রবাল-প্রাচীরে নিত্যনতুন যে-সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তা দ্বীপের অন্দরে আমাদের দেবদুর্লভ জীবন-যাত্রা তরকারিতে মশলার মতো আরও উপভোগ্য করে তুলছে। কিন্তু তাই বলে এখানেই তো সারাটা জীবন কাটাতে পারি না! কিভাবে আবার এখান থেকে বাইরের পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব—সে-কথাটাই এখন ভাবতে হবে। এক সপ্তাহ পরে কন-টিকি যেন লাফিয়ে চলে এসেছে ভিতরে—প্রাচীরের মাঝামাঝি শুকনো ডাঙ্গায়। সেখানে জোরসে আটকে গেছে। লম্বা বালসা কাঠগুলো লেগুনে ঢুকে পড়বার জন্য প্রবালের বাধা অনেক জায়গায় ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেছে। কিন্তু এবার ভেলা অনড় হয়ে পড়েছে। সামনের দিকে টেনে আনতে বা পিছনের দিকে ঠেলে দিতে আমরা অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। যদি ভেলাটাকে লেগুনে নিয়ে আসতে পারতাম, ভেলাটাকে আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে, পাল খাটিয়ে বাতাসের আনুকূল্যে এই বন্ধুভাবাপন্ন লেগুনে ভেসে বেড়াতাম—দেখতাম অন্যদিকে কি আছে। যদি কোন একটা দ্বীপে লোকের বসতি থেকে থাকে, তা হবে নিশ্চয়ই পূবে দিগন্তের কাছ বরাবর—অ্যাটলের বহির্ভাগের দিকে, যেদিকের অভিমুখে বাতাস বয়।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল।

একদিন সকালে কয়েকজন হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল। ভীষণ উত্তেজিত। লেগুনে তারা সাদা পাল দেখতে পেয়েছে। নারকেলের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট কালো ফুটকি নজরে পড়ল। লেগুনের নীল জলে ফুটকিটাকে অদ্ভুত সাদা

দেখাচ্ছে। হ্যাঁ নৌকোর পালই বটে—অপর পাশের ডাঙ্গার ধার ঘেঁষে আসছে। মনে হল পাল ঘুরিয়ে নৌকোর গতি পরিবর্তন করছে। শীগগিরই আর একটা নৌকো দেখা গেল।

ক্রমশ নৌকোর আকার বাড়ছে যত কাছে এগিয়ে আসছে। সকাল এগিয়ে চলেছে। সোজা তারা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। একটা নারকেল গাছের মাথায় ফরাসী পতাকা ওড়ালাম আর একটা নরওয়ের পতাকা লাঠির ডগায় লাগিয়ে আন্দোলিত করতে লাগলাম। একটা নৌকো এত কাছে এসে পড়েছে, দেখে বুঝলাম একটা পলিনেশীয় বাইচ খেলার ক্যানু। ক্যানুর পাল ও রশারশি একেবারে হাল আমলের। দুজন বাদামী আদমী পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমরা হাত নাড়লাম। তারাও হাত নাড়ল। তারা সোজা অগভীর জলের দিকে এগিয়ে এল।

'ইয়া-ওরা-না'—পলিনেশীয় ভাষায় আমরা অভিনন্দন জানালাম তাদের।

'ইয়া-ওরা-না', তারাও সমস্বরে প্রত্যভিবাদন করল। একজন জলে লাফিয়ে নেমে ক্যানুটাকে জল ভেঙ্গে টেনে নিয়ে আসতে লাগল। জলমগ্ন বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে আসতে লাগল সোজা আমাদের দিকে।

লোক দুজনের পরনে সাদা আদমীদের পোশাক কিন্তু গায়ের রঙ বাদামী আদমীদের মতো। খালি পা, সুগঠিত দেহ—রোদের তেজ থেকে বাঁচাতে মাথায় দিয়েছে ঘরে তৈরি খড়ের টুপি। তারা নৌকো থেকে নেমে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকেই। হালচাল একটু ভয়-মেশানো। কিন্তু আমরা মুখে হাসি টেনে করমর্দন করলাম ওদের সঙ্গে। ওরাও মুক্তোর মতো দাঁত বের করে আনন্দে ঝলমল করতে লাগল। ওরা আর একটা ক্যানুর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেটাও আসছে এ দিকেই।

ঐ ক্যানুতে তিন জন লোক আছে। জল ভেঙ্গে ওরাও তীরে এসে পৌছল, আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। এখন বোঝা গেল ওদের মধ্যে একজন ফরাসি বলতে পারে।

ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম লেগুন পেরিয়ে ছোট একটা গ্রাম আছে। কয়েক রাত আগে ওদের গাঁ থেকে আগুন দেখতে পেয়েছে এখানে। রারোইয়া প্রবাল-প্রাচীরের ভিতরে লেগুনের চারপাশে চক্রাকারে যে সব দ্বীপ আছে সেখানে যাওয়ার একটাই মাত্র পথ। ওদের গাঁয়ের সামনে দিয়েই গেছে এই পথ। কাজেই প্রবাল-প্রাচীরের ভিতর এইসব দ্বীপে কেউ এলে গ্রামবাসীদের নজরে পড়বেই। তাই গাঁয়ের বুড়োরা পূবদিকে প্রবাল-প্রাচীরের কাছাকাছি আগুন দেখে ভেবেছিল—এটা কোন মানুষের তৈরি আলো নয়, ভৌতিক আলো। এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কি

দেখে আসবার সকল ইচ্ছার আগুনে জল ঢেলে দিয়েছিল তারা। কিন্তু একদিন একটা ভাঙ্গা বাক্সের অংশ জলে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে লাগে। বাক্সের গায়ে কিছু আঁকিবুকি আঁকা ছিল। তাহিতি গিয়েছিল এমন দুজন লোক আছে তাদের গাঁয়ে—তাদের কিছুটা অক্ষর পরিচয়ও আছে। তারা এই আঁকিবুকির মর্মোদ্ধার করেছে। একটা কাঠের গায়ে বড় বড় কালো হরফে টিকি কথাটা লেখা আছে। তখন দ্বীপে যে অপদেবতার অধিষ্ঠান ঘটেছে—এ সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশই রইল না। কারণ টিকি তো তাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা— তিনি বিগত হয়েছেন বহুকাল আগে। এ কথাটা তো সবাই জানে। এরপর টিনের খাবার, সিগারেট, কোকো, পুরানো জুতোর বাক্স প্রভৃতি জলে ভাসতে ভাসতে এসে ডাঙ্গায় ভিড়েছে। তখন ওরা বুঝল নিশ্চয়ই কোন জাহাজ-ডুবি ঘটেছে পূবদিকের কোথাও। তাই গাঁয়ের মোড়ল দুটো ক্যানু পাঠিয়েছে, যারা বেঁচে আছে তাদের উদ্ধার করে আনতে। তাদের প্রজ্জলিত আগুনই তো ওরা দেখেছে।

বাকিদের উৎসাহে ফরাসি-জানা লোকটি জানতে চাইল—ভেসে-আসা কাঠের টুকরোর গায়ে টিকি কথাটা কেন লেখা আছে। আমাদের সব রকম সাজ সরঞ্জামে কন-টিকি লেখা এবং আমরা যে-ভেলা করে এসেছি তার নামও দেওয়া হয়েছে কন-টিকি।

প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও অসহায় নিরুপায় যাত্রীরা সবাই বেঁচে আছে শুনে আমাদের নতুন বন্ধুরা খুবই বিস্মিত হল। বিশেষ করে যখন জানল প্রাচীর গাত্র থেকে মুক্তি পাওয়া চ্যাপটা ভেলাটাই যে আমাদের জলযান, যাতে চেপে এসেছি আমরা—তাদের বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। তারা তখুনি আমাদের সব্বাইকে ক্যানুতে চাপিয়ে গাঁয়ে নিয়ে যেতে চাইল। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে অস্বীকার করলাম। আমরা যতক্ষণ না কন-টিকিকে প্রবাল প্রাচীরের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করতে পারছি, ততক্ষণ এখানেই থাকব। তারা ভয়ার্ত চোখে প্রবাল-প্রাচীরের উপর আটকে-থাকা ভেলার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। আর আমরাও যে ঐ ভেঙ্গে-পড়া জলযানের কাঠামোটা আবার জলে ভাসাতে পারব, সে-সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। শেষ পর্যন্ত বক্তা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, আমাদের অবশ্যই যেতে হবে তাদের সঙ্গে। মোড়লের নির্দেশ—আমাদের ফেলে রেখে ওরা যেন কোনমতেই ফিরে না আসে।

তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আমাদের মধ্যে একজন গ্রামবাসীদের সঙ্গে যাবে, মোড়লের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে জানাবে সেখানকার অবস্থা কি রকম ও বসবাসের পক্ষে অনুকূল কি না। আমরা ভেলাটাকে প্রবাল-প্রাচীরের উপর ফেলে রেখে যাব না। তাছাড়া আমাদের সাজ-সরঞ্জামও এই ছোট্ট দ্বীপে ফেলে রেখে যাওয়া চলতে

পারে না।

বেণ্ট ওদের সঙ্গে গেলেন। বালুতট থেকে ক্যানুটোকে জলে নামান হল। হাওয়া উঠেছে। ওরা পশ্চিমমুখো অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরের দিন দিগন্ত সাদা সাদা পালে ছেয়ে গেল। মনে হল দ্বীপবাসীরা ওদের যত জলযান আছে সব সঙ্গে নিয়ে আসছে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে।

সমস্ত পোতবহর পাল নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের দিকেই আসছে। নিকটে আসতে দেখলাম, বন্ধুবর বেণ্ট প্রথম ক্যানু থেকে হাত নাড়ছেন। তাঁকে ঘিরে কয়েক জন বাদামী লোক। বেণ্ট চিৎকার করে জানালেন, স্বয়ং মোড়ল তাঁর সঙ্গে আছে।

আমরা পাঁচ জনই ছুটে গেলাম একসঙ্গে মোড়লকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাতে। ওরা জল ভেঙ্গে তীরের দিকে আসছে।

বেণ্ট সাড়ম্বরে মোড়লের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেণ্ট জানালেন মোড়লের নাম—তেপিয়ারাইয়ারি তেরিফাতাউ। আমরা তাকে টেকা বলেও ডাকতে পারি। আমরা ঐ নামেই ডাকতাম তাকে।

লোকটি লম্বা, পাতলা চেহারা। পলিনেশীয় তাহিতির প্রাচীন রাজবংশের একটি শাখার অন্তর্গত। সে রারোইয়া ও টাকুম দ্বীপপুঞ্জের অধিপতি। তাহিতিতে স্কুলে পড়েছে। তাই ফরাসি ভাষা লিখতে ও বলতে পারে। নরওয়ের রাজধানী যে ক্রিস্টিয়ানিয়া তাও জানে সে। আমি বিংগ ক্রসবিকে চিনি কিনা জানতে চাইল। গত দশ বছরে মাত্র তিনটে বিদেশী জাহাজ রারোইয়ায় এসেছে। কিন্তু বছরে বেশ কয়েকবার ছোবড়ার জন্য তাহিতি থেকে স্কুনার আসা-যাওয়া করে। নানা পণ্য আমাদানি হয় আর রপ্তানী হয় নারকেল ও নারকেলের শাঁস। কয়েক সপ্তাহ ধরেই আশা করছে একটা স্কুনার আসবে। যে-কোন সময়েই এসে পড়তে পারে।

বেণ্টের সংগৃহীত সংবাদ থেকে জানা গেল ঐ দ্বীপে কোন স্কুল বা রেডিও নেই—নেই কোন সাদাচামড়া লোক। একশ সাতাশ জন পলিনেশীয় থাকে ঐ গাঁয়ে। ওরা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা কিছু দরকার সব করবে—আমরা দ্বীপে পৌছলে আমাদের যথোচিত অভ্যর্থনারও বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। যে-নৌকো করে আমরা বেঁচে এই দ্বীপে এসেছি, মোড়ল সেই নৌযানটাও তাকে দেখাতে অনুরোধ করল। আমরা জল ভেঙ্গে কন-টিকির দিকে গেলাম। পিছনে একদল দ্বীপবাসী। ভেলার কাছে আসতেই হঠাৎ থেমে পড়ল তারা—প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ল। সবাই এক সঙ্গে কথা বলছে। কন-টিকির কাঠগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একজন দ্বীপবাসী চিৎকার করে উঠল—'এ তো নৌকো নয়—পাই—পাই।'

'পাই—পাই'—সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। ওরা ছুট লাগাল জল ভেঙ্গে—

কন-টিকির কাছে লাফিয়ে গেল। ওরা উত্তেজিত—বাচ্চাদের মতো ভেলার সারা গায়ে, দড়িতে, বাঁশের বাখারির পাটাতনে হাত বুলোতে লাগল। ওদের মতো মোড়লও উত্তেজনার তুঙ্গ শিখরে। ফিরে এসে সে পুনরাবৃত্তি করল প্রশ্নের ভঙ্গিতে—'টিকি নৌকো নয়—পাই-পাই।'

পলিনেশীয় ভাষায় 'ভেলার' ও 'পাটাতনের' নাম পাই-পাই। ইস্টার দ্বীপের স্থানীয় অধিবাসীরা ক্যানুকেও ঐ নামে অভিহিত করে থাকে। মোড়ল জানাল, এ ধরনের ভেলার আজকাল আর চলন নেই। গাঁয়ের প্রাচীনতম লোকেরা ভেলার ঐতিহ্য বর্ণনায় এখনও পঞ্চমুখ। সবাই বালসা কাঠের দরাজ প্রশংসা করতে লাগল কিন্তু দড়ি দেখে ওরা নাক সিঁটকাল। এধরনের দড়ি নোনাজল ও রোদে বেশিদিন টেকে না। ওরা গর্বের সঙ্গে ওদের ক্যানুর দড়ি দেখাল—এ দড়ি নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ওরা নিজেরাই পাকিয়েছে। সমুদ্রের লোনা জলে এই সব দড়িকাছি পাঁচ বছর পরেও একেবারে নতুনের মতো অটুট থাকে।

আমরা আবার ছোট্ট দ্বীপে ফিরে এলাম। দ্বীপের নাম রাখা হল 'ফেনুয়া কন-টিকি' বা 'কন-টিকি দ্বীপ'। এ নামটা আমরা উচ্চারণ করতে পারি, কিন্তু আমাদের নরডিক ক্রীস্টান নাম বাদামী বন্ধুদের উচ্চারণ করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। ওরা আমায় তেরাই মাতিনেতা বলে ডাকতে পারে, একথা বলতে খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল। এ অঞ্চলে আমি যখন প্রথম পদার্পণ করি, তাহিতির প্রধান দলপতি আমায় পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে ঐ নামকরণ করেছিল।

দ্বীপবাসীরা ক্যানু থেকে মুরগি, ডিম, রুটি-ফল প্রভৃতি বের করে আনল—কেউ কেউ বর্শাবিদ্ধ করে বড় বড় মাছ ধরল লেগুন থেকে। এদের বর্শা ত্রিশূলের মতো তিন ফলাওয়ালা। আমরা আগুন জেলে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করলাম। ভেলায় চেপে আসার সময় সমুদ্রে যা-যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সব বর্ণনা করতে হল। ওরা বারবার তিমি-হাঙরের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। এরিক কেমন করে হাঙরের মাথায় হারপুন ছুঁড়ে মেরেছিল সেকথা যখন বর্ণনা করছিলাম, শ্রোতারা শুনে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। যে-সব মাছের ছবি এঁকে এনেছি ওরা তাদের দেখেই চিনতে পারল। পলিনেশিয়ায় তাদের কি নাম তাও জানিয়ে দিল। ওরা কখনও তিমি-হাঙর বা জেমফাইলাস দেখেনি—নামও শোনেনি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে আমরা রেডিও-এর স্মরণাপন্ন হলাম। ওরা খুব হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। গির্জার সংগীত এরা ভারি পছন্দ করে। সব থেকে বিস্ময়ের ব্যাপার দাঁড়াল যখন রেডিও-তে আমেরিকা থেকে আসা হুলা-হুলা গান শুরু হল। এদের মধ্যে যারা অত্যুৎসাহী আনন্দপ্রবন, তারা এই গান শুনে মাথার উপর হাত তুলে শরীরকে দুলিয়ে মুচড়িয়ে এঁকেবেঁকে নাচতে লাগল তালে তালে। ক্রমশ সমস্ত দলটি

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল—গানের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল উদ্দাম নাচ। রাত ঘনিয়ে এলে আগুন জ্বেলে তটভূমিতেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল। দ্বীপবাসীদের কাছে যেমন, আমাদের কাছেও এ ব্যবস্থা অ্যাডভেনচারের সামিল।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি ওরা কখন উঠে পড়েছে। মাছ ধরে ভাজছে, আমাদের জন্য ছটা ডাব কেটে রেখে দিয়েছে—প্রভাতী তৃষ্ণা মেটাবার উদ্দেশে।

সেদিন প্রবাল-প্রাচীর রোজকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত তীব্রতর গর্জন শুরু করে দিয়েছে। বাতাসের বেগও বেশ বেড়ে গেছে। ভেলার পিছনে তরঙ্গমালা প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে।

'টিকি আজ এসে পড়বে,' ভেলাটাকে দেখিয়ে বলল মোড়ল, 'আজকে প্রবল জোয়ার আসবে।'

বেলা এগারটা নাগাদ হু-হু শব্দে লেগুনে তোড়ে জল ঢুকতে লাগল। বিরাট চৌবাচ্চার মতো লেগুন জলে পূর্ণ হয়ে উঠল। দ্বীপের চারদিকে জলস্ফীতি দেখা দিল। আরও পরে সমুদ্রের আসল জলপ্রবাহ ভিতরে প্রবাহিত হতে লাগল। ঢেউ-এর পর ঢেউ আবর্তিত হয়ে আসতে লাগল—প্রবাল-প্রাচীরের উপরিভাগ জলের তলায় ডুবে গেল। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বড় বড় প্রবালের স্তূপ। ধ্বসে পড়ল বালির তীর, বাতাসে ময়দা উড়ে যাওয়ার মতো এক এক জায়গার বালি ধুয়ে মুছে গেল। আবার নতুন জায়গায় জেগে উঠল বালির স্তূপ। ভেলা থেকে আলগা বাঁশ আমাদের পাশ দিয়ে ভেসে গেল। কন-টিকিও নড়তে শুরু করেছে। বেলাভূমিতে রাখা জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি দ্বীপের অভ্যন্তরে সরিয়ে ফেললাম, যাতে না জোয়ারের টানে ভেসে যায়। এক সময় প্রবাল-প্রাচীরের সব থেকে উঁচু উঁচু স্তূপ ছাড়া সব কিছু তলিয়ে গেল জলের তলায়। দ্বীপের চারদিকের বেলাভূমিও উধাও। আসকে পিঠের মতো দেখতে দ্বীপের ভিতরের ঝরে-পড়া লতাপাতা অবধি ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কেমন একটা আতঙ্ক-জাগানো ভুতুড়ে অবস্থা! মনে হল সমস্ত সমুদ্র আমাদের গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে! কন-টিকি যেখানে ছিল সেখান থেকে একটা চক্কর মেরে ছিটকে বের হয়ে এল—ভাসতে ভাসতে আবার প্রবাল স্তূপের গোলক-ধাঁধায় আটকে গেল।

দ্বীপবাসী কয়েকজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কখনও সাঁতরে, কখনও জল ভেঙে হেঁটে চলল সেই ঘূর্ণাবর্তের ভিতর দিয়ে—নানা মগ্ন জায়গায় ঘা খেতে খেতে ভেলার কাছে পৌঁছে গেল। নুট আর এরিকও ওদের পিছু পিছু গেল। ভেলার পাটাতনের উপর দড়িদড়া রাখাই ছিল। ভেলাটা তখন শেষ প্রবাল-প্রাচীরের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়েছে। দ্বীপ বাসীদের কেউ কেউ লাফিয়ে উঠে পড়ল ভেলার উপর—আটকাতে

চেষ্টা করল ভেলাটাকে। ওরা তো জানে না কন-টিকিকে। সবসময় পশ্চিমমুখো ভেসে চলবে দুরতিক্রমণীয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে। কাজেই ওরাও অসহায়ের মতো ভেসে চলল ভেলার সঙ্গে। বেশ তীব্র গতিতেই ছুটে চলেছে—প্রবাল-প্রাচীর ডিঙিয়ে লেগুনের দিকে। শান্ত জলে এসে ভেলাটা কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। গতি মন্থর করে যেন চারদিক নিরীক্ষণ করে দেখছে—পালানোর আর কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। আবার ছোটা শুরু করার—লেগুন থেকে বের হয়ে যাবার পথ দেখতে পাওয়ার আগেই দ্বীপবাসীরা ইতিমধ্যেই দড়ির শেষ প্রান্তটা একটা নারকেল গাছের গুঁড়ির চারপাশে জড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এইভাবে লেগুনের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ল কন-টিকি। যে-ভেলা ডাঙা পেরিয়ে, জলরাশি অতিক্রম করে এসেছে, প্রাচীরের প্রতিবন্ধকতা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত রারোরিয়ার অভ্যন্তরে লেগুনে বন্দী হয়ে পড়ল।

তারপর উত্তেজক রণহুঙ্কার দিয়ে, সেই সঙ্গে কে-কে-তি-হুররা-হুররা বিজয়োল্লাস ধ্বনি সহযোগে কন-টিকিকে সমবেত চেষ্টায় ডাঙায় টেনে তুললাম—নিয়ে এলাম তার নামে নাম—কন-টিকি দ্বীপে। জোয়ারের জল সাধারণ উচ্চতা থেকে চার ফুট ফুলে উঠেছে। মনে হল—সমস্ত দ্বীপটাই আমাদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

বায়ু তড়িত তরঙ্গমালা লেগুনের সর্বত্র ভেঙ্গে পড়ছে। আমরা আমাদের সব সাজ-সরঞ্জাম সঙ্কীর্ণ ও ভেজা ক্যাম্পুতে তুলতে পারলাম না। দ্বীপবাসীদের নিজেদের এলাকায় তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে—ভীষণ তাড়া আছে। হেরমান ও বেণ্ট ওদের সঙ্গে গেলেন। সেখানে আবার একটা বাচ্চা ছেলে মরণাপন্ন! মাথায় ফোঁড়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গে পেনিসিলিন আছে।

পরের দিন কন-টিকি দ্বীপে আমরা চারজন আছি। আর কেউ নেই। পুবেল হাওয়া এখন এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে দ্বীপবাসীদের লেগুন বেয়ে এখানে আসা অসম্ভব। লেগুনের এখানে-ওখানে তীক্ষ্ণ ধারাল প্রবালে ভরে গেছে আর আছে ডুবো চড়া। জোয়ারে কিছুটা ভাঁটির টান এলেও আবার তীব্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিরাট বিরাট ঢেউ পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে তেড়ে আসতে লাগল।

পরের দিন বায়ুর গতিবেগ অনেকটা শান্ত হয়ে এল। এবার কন টিকির তলায় ঢুকে দেখার কোন অসুবিধে নেই। ন-টা কাঠই মোটামুটি অটুট আছে। প্রবাল প্রাচীর তলা থেকে কাঠের দু-এক ইঞ্চি থাবলে নিতে চেষ্টা করেছে! দড়িদড়া কাঠের খাঁজে এমন ভাবে চেপে বসেছে যে প্রবালের ঘা খেয়ে খেয়ে মাত্র চার জায়গার দড়ি কেটে গেছে। আমরা প্লাটাতনের উপর সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে লেগে গেলাম। ডেকের উপর থেকে ছেঁড়া-ফাটা হাবিজাবি সব দূর করে দেওয়া হল। ভাঙা পড়ে-যাওয়া কেবিনটা আবার খাড়া করা হল। দেখাতে লাগল ঠিক

বাদ্যযন্ত্রের মতো। মাস্তুলটাকে আবার দড়িদড়া বেঁধে দাঁড় করানো হল। এবার গর্বিত ভেলাটাকে সুন্দরই দেখাতে লাগল।

পড়ন্ত বেলায় আবার পাল দেখা গেল দিগন্তে। দ্বীপবাসীরা বাকি মালপত্র ও আমাদের নিয়ে যেতে আসছে। হেরমান আর বেণ্টও আছেন ওদের সঙ্গে। তাঁরা জানালেন গাঁয়ে বিরাট ভোজোৎসবের ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ দ্বীপে পৌছলে আমরা ক্যাম্প থেকে নামব না, যতক্ষণ না মোড়ল অনুমতি দেন অর্থাৎ সে সঙ্কেত দিলেই তবে নামব।

লেগুন পেরিয়ে চললাম। সাত মাইল দীর্ঘ। আবার প্রবল বাতাস সুরু হবার আগেই রওনা দিলাম। কন-টিকি দ্বীপের সুপরিচিত নারকেল বন ছেড়ে আসতে দুঃখ হচ্ছিল। তারা যেন ডালপালা নেড়ে আমাদের বিদায় জানাতে লাগল। ক্রমশ পূব দিকের প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে দ্বীপটা ছোট হতে হতে একটা অস্পষ্ট ছায়া মূর্তির মতো দেখাতে লাগল। কিন্তু আমাদের সামনে বড় বড় দ্বীপ বিশাল চেহারা নিয়ে দেখা দিতে লাগল। একটা দ্বীপে জেটিও দেখতে পেলাম। নারকেল গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে।

গাঁয়ে কোন সাড়া শব্দ নেই—নীরব নিঝুম। জনমনিষ্যির কোন নাম গন্ধও নেই কোথাও। কি হচ্ছে সেখানে? প্রবালের স্তূপের জেটির পিছনে দু-জন লোক দাঁড়িয়ে। একজন লম্বা পাতলা, আর একজন বেশ শক্ত-পোক্ত—দেখতে পিপের মতো। কাছে এলে আমরা নমস্কার করলাম দুজনকেই। একজন প্রধান মোড়ল টেকা আর একজন উপ-প্রধান তুপু হো। তুপু হোর সহৃদয় আকর্ণ বিস্তৃত হাসি আমাদের মুগ্ধ করল। টেকার মাথা খুব পরিষ্কার—কূটনীতিবিদ। কিন্তু তুপুহো অতি সরল—প্রকৃতির হাতে গড়া মানুষ! সচ্চরিত্র। আদিম মানুষের মতো আবেগ ও মানসিকতা বিশিষ্ট। সচরাচর এ রকমটি দেখা যায় না। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ—পলিনেশীয় প্রধান হতে যা যা দরকার তেমনি মর্যাদাবিশিষ্ট। এই দ্বীপে তুপু হোই প্রধান। কিন্তু টেকা ক্রমশ সর্বোচ্চ প্রধানের পদ-ক্ষমতা দখল করেছে—কারণ সে ফরাসি জানে, লিখতে ও বলতে পারে। তাহিতি থেকে ছোবড়া নিতে স্কুনার যখন আসে, তারা যাতে গ্রামবাসীদের ঠকাতে না পারে সেদিকে টেকাই নজর রাখে।

টেকা জানাল, তারা দুজন গ্রামের দিকে শোভাযাত্রা সহকারে আমাদের নিয়ে যাবে—যেখানে আমাদের অভ্যর্থনা করতে গ্রামবাসিগণ জড়ো হয়েছে। সবাই ক্যাম্প থেকে নামলে একসঙ্গে যাত্রা করা হবে। আমাদের দলে হেরমান থাকবে সবার আগে—হারপুনের ডাণ্ডার মাথায় একটা পতাকা বেঁধে আন্দোলিত করতে করতে এগুবে। তার পিছনে থাকব আমি—আমার একপাশে প্রধান আর একপাশে উপপ্রধান।

তাহিতিদের সঙ্গে ছোবড়ার ব্যবসা করার সব রকম প্রত্যক্ষ চিহ্ন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে গাঁয়ে। স্কুনারে করে তক্তা, করোগেটেড টিন প্রভৃতি আমদানি করা হয়েছে। প্রাচীনকালের ফ্যাশান মাফিক কতকগুলো অপূর্ব কুঠরি দেখতে পেলাম—গাছের ডালপালা আর নারকেলের পাতায় ছাউনি দিয়ে তৈরি। এ ছাড়া কাঠের তক্তায় পেরেক ঠুকে করোগেটেড টিনের ছাউনি দেওয়া হাল ফ্যাশানের বাংলোও আছে। নারকেল কুঞ্জের মধ্যে কাঠের মস্ত বড় একটা নিঃসঙ্গ বাড়ি দেখতে পেলাম। এটাই গ্রামের নতুন তৈরি মিলন-আবাস। এখানেই আমরা ছজন সাদা-চামড়া মানুষ থাকব। এখানে সভাটবা হলে গাঁয়ের সবাই মিলিত হয় অর্থাৎ গ্রামের মিলনকেন্দ্র। আমরা পতাকা হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম পিছনের একটা দরজা দিয়ে। তারপর কয়েকটা প্রশস্ত সিঁড়ি অতিক্রম করে বাড়ির সামনে বাইরে এসে পৌছলাম। সামনের উঠোনে গাঁয়ের সব লোক এসে জড়ো হয়েছে—মেয়ে পুরুষ, বুড়োবুড়ী, যুবক যুবতী। এমন কি কাচ্চাবাচ্চারাও যারা হাঁটতে বা হামাগুড়ি দিতে পারে। প্রত্যেকের মুখেই আন্তরিকতার ছাপ। কন-টিকি দ্বীপের হাসিখুশি আনন্দময় বন্ধুরাও এই দলে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে। তারা যে আমাদের চেনে এমন আভাসও দিল না।

আমরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়ালাম, সমবেত জনতা একসঙ্গে গান শুরু করে দিল—'দি মার স্যালেইজ!' ফরাসী বিপ্লবের গান! টেকা গানের কথাগুলো সম্বন্ধে পারঙ্গম। সে-ই প্রথম কলি গাইছে আর বাকিরা সমবেত কণ্ঠে পরে গাইছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে গান চলল। দলে কিছু বুড়ী ছিল—গাইতে গাইতে তাদের গলা ধরে এল। গান রপ্ত করতে কঠোর অনুশীলন করেছে তারা। সিঁড়ির সামনে ফরাসী ও নরওয়ের পতাকা উত্তোলন করা হল। এইভাবে একসময় টেকার সম্বর্দ্ধনা-সভা শেষ হলে সে নিঃসাড়ে পিছনে সরে গেল। এবার জবরদস্ত তুপু হো লাফিয়ে সামনে এল। সে এবার উৎসবের কর্ণাধার। সে ইংগিত করতেই জনতা আবার নতুন গান ধরল। এবারের গানটা ভালোভাবেই চলল। কারণ এর কথা ও সুর নিজেদের ভাষায় লেখা। লোক-সংগীত— যা তারা গাইতে পারে। গানের সুর খুবই হৃদয়গ্রাহী। ভাষা অতি সহজ ও সরল। পিঠে একটা সুড়সুড়ানি অনুভব করতে লাগলাম আমরা—যেন প্রশান্ত মহাসাগর সগর্জনে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। কয়েকজন গান ধরল প্রথমে, বাকিরা সমস্বরে সুরে সুর মেলাচ্ছে। গানের কথা একই, কিন্তু সুরে তারতম্য ঘটছে।

'শুভ দিন, তেরাই মেতিয়েতা। পাই-পাই চড়ে আপনি ও আপনার লোকেরা সমুদ্র পেরিয়ে রারোরিয়ায় আমাদের এখানে এসেছেন। হ্যাঁ, শুভ দিন বইকি! ইচ্ছা করলে, দীর্ঘকাল আপনারা আমাদের কাছে থাকতে পারেন, আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বলবেন আমাদের। আপনারা, সুন্দর কোন দেশে চলে

গেলেও আপনাদের স্মৃতি চিরসঙ্গী হয়ে থাকবে আমাদের। শুভ দিন!'

তাদের লোক-সংগীত আবার গাইতে বলতে হল আমাদের। আস্তে আস্তে আড়ষ্টতা কেটে যেতে লাগল। জনতা প্রাণ-চাঞ্চল্যে সজীব হয়ে উঠল। তুপু হো কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করল আমায়। কেন আমরা পাই-পাই চড়ে সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি এখানে। এসব কথা শোনবার জন্য সবাই উদগ্রীব। আমি ফরাসী ভাষায় বলব আর টেকা একটু একটু করে তাদের ভাষায় অনুবাদ করে দেবে।

এই বাদামী আদমীদের শিক্ষা-দীক্ষা কিছু নেই সত্যি, কিন্তু যারা আমার বক্তৃতা শোনবার জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি। আমি জানালাম এর আগেও আমি এখানে এই দ্বীপপুঞ্জে এসেছি—দেখা হয়েছে এদের স্বজাতীয়দের সঙ্গে। আমি জেনেছি, এদের প্রথম অধিপতি টিকির কথা। তিনিই এদের পূর্ব পুরুষদের এই দ্বীপে এনে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। যে রহস্যময় দেশ থেকে এসেছিলেন তিনি, সে-দেশ কোথায়, কেমন ছিল সে-দেশ—এখানকার কেউ আজ আর তা জানে না। কিন্তু বহু দূরে পেরু বলে একটা দেশ আছে, বললাম আমি। সেখানে একজন বিরাট পুরুষ রাজত্ব করতেন—নাম তাঁর টিকি। লোকেরা তাঁকে বলত কন-টিকি বা সূর্য-টিকি। কারণ তিনি বলতেন, সূর্যই নাকি তাঁর আদি পিতা। সূর্যের বংশধর তিনি। টিকি এবং তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক অনুগামী বিরাট ভেলা চেপে হঠাৎ সে-দেশ থেকে অন্তর্ধান করেন। তিনিই যে সেই টিকি, যিনি এদেশে এসেছিলেন—আমাদের ছজনের তাই দৃঢ় বিশ্বাস। পাই-পাই করে সমুদ্র পেরিয়ে যে এদেশে আসা যায়, একথা কেউ বিশ্বাস করত না। তাই আমরা পাই-পাই চেপে পেরু থেকে এদেশে এসেছি। আসা যে সম্ভবপর, প্রমাণ করেছি আমরা।

আমার ছোট্ট বক্তৃতাটুকু টেকা অনুবাদ করে দিলে তুপু হো লাফিয়ে এসে পড়ল জনতার সামনে। যেন অগ্নিগর্ভ। আনন্দের আবেগে ঝলমল। পলিনেশীয় ভাষায় অনর্গল বাক্যস্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। শূন্যে হাত ছুঁড়তে লাগল। স্বর্গ ও আমাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কথার পর কথার মালা গাঁথতে লাগল সে। তার বক্তৃতায় বার বার টিকির কথা উচ্চারিত হচ্চে। এত দ্রুত কথার খই ফুটছে যে বক্তৃতার সূত্র অনুসরণ করা অসম্ভব। কিন্তু জনতা তার প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলছে—তারাও যেন নাচছে আনন্দের আতিশয্যে। তারাও উত্তেজিত-উদ্বেলিত। কিন্তু টেকাকে আমার বক্তৃতা যখন অনুবাদ করতে হচ্ছিল, সে বেশ বিব্রত বোধ করছিল।

তুপু হো বলে যেতে লাগল, তার বাবা, বাবার বাবা, তারও পূর্বপুরুষেরা—সবাই টিকির কত গল্প বলেছে! টিকিই তাদের আদি প্রধান। তিনি এখন স্বর্গবাসী। কিন্তু সাদা আদমীরা এসে বলেছে—এসবই ঝুটা বাত। টিকির কোন অস্তিত্বই ছিল

না কোন কালে। স্বর্গে বাস করার কথা তাহা মিথ্যা। কারণ জিহোভা থাকেন সেখানে। টিকি পৌত্তলিক দেবতা। আমরা যেন টিকির খোস গল্পে আর না বিশ্বাস করি। এখন আমরা ছজন পাই-পাই চড়ে সমুদ্র পেরিয়ে এখানে এসেছি। সাদা আদমীদের মধ্যে আমরাই প্রথম যারা প্রমাণ করেছি ওদের পূর্ব পুরুষরা যা বলে গেছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। টিকি একদিন পৃথিবীতে বাস করতেন। তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এখন মৃত, স্বর্গবাসী।

মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপ ভণ্ডুল হয়ে যাবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। কাজেই তাড়াতাড়ি যুক্তি প্রদর্শন করে বললাম, টিকি যে একদা এ পৃথিবীতে বাস করতেন একথা ধ্রুব সত্য—তিনি এখন স্বর্গবাসী। কিন্তু তিনি স্বর্গে না নরকে আছেন —একথা জিহোভাই জানেন। টিকি যখন মর্তে বাস করতেন, জিহোভা তখন স্বর্গের বাসিন্দা। টিকি মানুষ ছিলেন—টেকা ও তুপু হোর মতোই দল প্রধান। চাই কি এদের চেয়েও ঢের ঢের বড় নেতা ছিলেন।

আমার বক্তব্য শুনে এই বাদামী মানুষগুলো খুশি ও সন্তুষ্ট হল। ওদের মাথা নাড়া ও কথাবার্তায় এটাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল যে আমার যুক্তির বীজ সরস মাটিতেই পড়েছে। টিকি যে একদিন এই পৃথিবীতে বাস করতেন—এটাই সার কথা। এখন যদি তিনি নরকগামী হয়ে থাকেন, সে তো তাঁর ব্যাপার। তবে তুপু হোর বক্তব্য হল —আবার তিনি এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে পারেন।

জনতার ভিতর থেকে তিন জন বুড়ো এগিয়ে এল সামনে। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করতে চায় এরা। সন্দেহ নেই, এরাই সাধারণের মধ্যে টিকির স্মৃতি চির-জাগরূক রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে একজন সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অসংখ্য ঐতিহাসিক কাব্যগাথা জানে—যা সে পূর্ব সূরীদের কাছ থেকে লাভ করেছে, আজও সাধারণ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি বুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম, টিকি কোথা থেকে এখানে এসেছিলেন তার জানা কাব্যগাথা বা গল্পে কোন ইংগিত আছে কিনা। না, সে রকম কোন কথা শোনা নেই তার। কিন্তু এই তিন জনের মধ্যে সব থেকে বয়োবৃদ্ধ যে, সে জানাল টিকির এক অতি নিকট আত্মীয় তাঁর সঙ্গে ছিল যখন তিনি এদেশে এসেছিলেন। তাঁর নাম মাউই। মাউই সম্পর্কে কাব্য-গাথায় উল্লেখ আছে —তিনি পুরা থেকে এখানে এসেছিলেন। আকাশের সেই অংশের নাম পুরা— যেখান থেকে সূর্য ওঠে। মাউই যদি পুরা থেকে এখানে এসে থাকেন, বৃদ্ধের মতে টিকিও নিশ্চয় সেখান থেকেই এসেছিলেন। আমরা ছ-জন পাই-পাই চেপে সেই পুরা থেকেই তো এসেছি। এও ধ্রুব সত্য।

আমি বুড়োকে বললাম, ইস্টার দ্বীপের কাছে ম্যানগারেভা নামে একটা দ্বীপ আছে—সেখানকার লোকেরা এই সেদিন পর্যন্ত ক্যানুর ব্যবহার জানত না। তারা

আমাদের কাল পর্যন্ত সমুদ্রে বড় বড় ভেলা চেপে যাতায়াত করত। বুড়ো অবশ্য এ খবর জানে না, কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষেরা পাই-পাই ব্যবহার করত একথা তারা জানে। যাহোক ভেলার ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। আজ শুধু তার স্মৃতি ও ঐতিহ্যই আছে বেঁচে। সব থেকে বুড়ো লোকটি বলল, প্রাচীনকালে তাদের রঙ্গো-রঙ্গো বলত। পলিনেশীয় ভাষায় এই কথাটার আর অস্তিত্ব নেই। অতি সুপ্রাচীন উপকথায় এর একমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়।

কথাটা ভারি মজার। কোন কোন দ্বীপে আবার রঙ্গো উচ্চারিত হত লোনা। পলিনেশীয়দের সব থেকে জনপ্রিয় লোক-কাহিনীতে পূর্বপুরুষেরা রঙ্গো নাম অভিহিত। তাদের গায়ের রঙ ছিল সাদা—চুলও ধবধবে সাদা। ক্যাপ্টেন কুক যখন প্রথম হাওয়াই আসেন, দ্বীপবাসীরা দু হাত প্রসারিত করে তাঁকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে এসেছিল। তারা ভেবেছিল কুক তাদের শ্বেতকায় আত্মীয়—রঙ্গো। বহুযুগ পরে তাদের পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি থেকে বিরাট জাহাজে চেপে এসেছেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। ইস্টার দ্বীপে রহস্যময় চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার প্রতি শব্দ—রঙ্গো। এর গোপন সূত্র লেখাপড়া-জানা শেষ লম্বকর্ণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত।

টিকি ও রঙ্গো-রঙ্গো নিয়ে আলোচনা করতে বুড়ো উদগ্রীব কিন্তু তরুণরা তিমি-হাঙ্গর ও সমুদ্র-অভিযান সম্পর্কে আরও খুঁটিনাটি খবর জানতে চায়। এদিকে ভোজ্য-পানীয় অপেক্ষা করছে। টেকাও আমার বক্তব্য অনুবাদ করতে করতে পরিশ্রান্ত!

এবার দ্বীপবাসীদের প্রত্যেককে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করার অনুমতি দেওয়া হল। তারা অনুচ্চ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল শুধু—ইয়া-ওরা-না, আর এমন জোরে হাত ঝাঁকুনি দিতে লাগল যে মনে হল হাত বুঝি ছিঁড়ে আসবে দেহ থেকে। কিশোরীরা এল দেহ-লতাকে দুলিয়ে দুলিয়ে—বেশ ছেনাল অথচ লাজুক সম্বর্দ্ধনা জানাল আমাদের। বুড়ীরা হেসে কুটোপাটি হয়ে বক্‌বক্ করতে লাগল—আমাদের দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গায়ের রঙ দেখিয়ে নানা মন্তব্য চলল। কিন্তু প্রত্যেকের মুখেই বন্ধুত্বের ভাব স্ফুরিত। কাজেই ভাষার গোলকধাঁধা কোন প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করতে পারল না। পলিনেশীয় ভাষায় অবোধ্য কিছু বললে আমরা তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতাম নরওয়ের ভাষায়। অর্থাৎ বিরাট হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি হচ্ছিল। স্থানীয় ভাষায় আমরা প্রথম যা শিখলাম তা হল—পছন্দ করা। যখন আমাদের কোন কিছু পছন্দ হয় এবং তখুনি পেতে চাই, বলা মাত্র হাতে এসে যায়। 'পছন্দ' কথাটা শুনে কারুর যদি নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—বুঝতে হবে, সে তা অপছন্দ করে। এইভাবে ওদের সঙ্গে আমাদের আচরণ অনেক সহজ হয়ে আসতে লাগল।

গাঁয়ের একশ সাতাশ জন অধিবাসীর সঙ্গেই আমাদের আলাপ-পরিচয় সমাপ্ত হল। এরপর আমরা ছজন, প্রধান ও উপপ্রধানের জন্য বিরাট একটা টেবিল পাতা

হল। কিশোরীরা সব থেকে সুস্বাদু খাবার ডিশে করে পরিবেশন করতে লাগল। কেউ টেবিল সাজাল, কেউ এসে আমাদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল। মাথায়ও ছোট ছোট ফুলের মালা। ফুল থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বের হতে লাগল। রোদের তাপ সত্ত্বেও বেশ ঠাণ্ডা ও মধুর ঠেকছে। যে-উৎসব শুরু হয়েছিল প্রথম দিন, আমাদের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত তার জের চলেছে সমানভাবে। কয়েক সপ্তাহ পরে এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাই আমরা। টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো রোস্টকরা মুরগি ও শুয়োরের বাচ্চা ও হাঁসের টাটকা নরম মাংস, টাটকা চিংড়ি, পলিনেশীয় পদ্ধতি রান্না-করা মাছ, রুটি-ফল, নারকেল ও প্যাপাইয়ার সুমিষ্ট জল প্রভৃতি দেখে আমাদের চোখ তো ছানাবড়া! জিভ দিয়ে জল গড়াতে লাগল! আমরা যখন খেতে ব্যস্ত, জনতা তখন উদ্দাম সংগীতে আমাদের আপ্যায়িত করতে লাগল আর কিশোর-কিশোরীরা টেবিলের চারপাশ নাচের সমারোহে মাতিয়ে তুলল। ছেলেরা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল। তারাও উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। আমাদের অবস্থাই বরং হয়ে দাঁড়িয়েছে বেহাল ও বেমানান হাস্যকর। কত যুগ যেন আমরা অনাহারী আছি! এমনি গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম খাবার!

দীর্ঘ শ্মশ্রু দোলায়িত মাথায় ফুলের মালা। প্রধান ও উপপ্রধান দুজনও আমাদের মতোই সমস্ত অন্তর দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করছিল।

আহার-পর্ব শেষ হলে আর একবার উদ্দাম নৃত্যসংগীত চলল। গ্রামবাসিগণ স্থানীয় লোকনৃত্য দেখাতে উদগ্রীব। টেকা তুপুহো ও আমাদের ছজনকে অর্কেস্ট্রায় বসতে টুল দিল, দুজন গীটার বাজিয়ে এগিয়ে এসে গীটার বাজাতে লাগল—সত্যিকার দক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের সুর। নারী পুরুষের দুটি দল। কোমরে নারকেলের পাতার ঘাঘরা। গায়করা যারা বসে বসে গান গাইছিল, তাদের সারির ভিতর দিয়ে দেহকে হেলিয়ে দুলিয়ে নেচে নেচে ফিরতে লাগল। একজন তেজীয়ান গায়ক ওদের দলে আছে যার একটা হাত হাঙর কেটে নিয়েছে। সেই উদাত্ত কণ্ঠে প্রথম কলি গাইছে আর দোহারগণ তার পুনরাবৃত্তি করছে। গোড়ার দিকে নাচিয়েরা একটু আত্মসচেতন ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু যখন দেখল ভেলাযাত্রীরা এই লোক-নৃত্য দেখে নাক কোঁচকাচ্ছে না, নাচিয়েরা ক্রমশ উদ্দীপিত হয়ে উঠতে লাগল। কিছু কিছু বুড়োও যোগ দিল। অদ্ভুত তাদের ছন্দময় দেহভঙ্গী—তারা এমন নাচ দেখাতে লাগল যা এখন অপ্রচলিত। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সূর্য অস্তমিত হল। নারকেল গাছের নিচে নৃত্যগীত ধীরে ধীরে সজীব থেকে সজীবতর হয়ে উঠতে লাগল। দর্শকরাও স্বতঃস্ফূর্ত হাততালি দিতে লাগল। ওরা ভুলেই গেল আমরা যারা দর্শক, তারা বিদেশী। আমরা যেন ওদেরই একজন—ওদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে গেছি।

এদের নাচগানের মহড়ার শেষ নেই যেন। একের পর এক মন মাতানো পালা

অভিনীত হয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত একদল কাছাকাছি এসে আমাদের অর্ধ বৃত্তাকারে ঘিরে বসল। তুপুহোর কাছ থেকে ইংগিত পাওয়া মাত্র মাটিতে হাত চাপড়ে এক ছন্দময় বাজনার সুর সৃষ্টি করতে লাগল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত তালে। ক্রমশ এক ছন্দময় ঐক্যতান সৃষ্টি হল। হঠাৎ একজন ঢাক বাজিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। দুটো কাঠির সাহায্যে হাড়ের মতো শুকনো ফাঁপা কাঠের ঢাকে এক গুরুগম্ভীর সুউচ্চ আওয়াজ তুলতে লাগল।

ঢাকের বাজনা যখন প্রার্থিত উত্তেজনার তুঙ্গশীর্ষে উঠল, দুর্বার প্রাণচাঞ্চল্যের তখনই হল শুরু। সংগীতের উদাত্ত ঝংকার। হঠাৎ একজন নৃত্যচটুল মেয়ে—গলায় ফুলের মালা, কানের পিছনে গোঁজা ফুলের গুচ্ছ—লাফিয়ে ঢুকে পড়ল এই বৃত্তে। তারপর গানের তালে তালে সে তার অনাবৃত পা-হাঁটু বেঁকিয়ে লিলায়িত ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে হাত দুটো মাথার উপরে তুলে নাচতে লাগল। ঠিক পলিনেশীয় কায়দায়। অপূর্ব নাচল মেয়েটি। একসময় দেখা গেল সমগ্র জনতা হাতে তালি বাজাচ্ছে। আরও একটি কিশোরী বৃত্তে ঢুকে পড়ল লাফিয়ে—তারপর আর একটি। এক অবিশ্রান্ত ছন্দময় সহজ ভঙ্গিতে রমনীয় ছায়ার মতো বৃত্তাকারে নাচতে লাগল। মাটিতে ধপাধপ হাতের আঘাত, একটানা গান, ঢাকের আনন্দসঞ্চারী বাদ্যি দ্রুত তালে পর্দা থেকে পর্দায় লাফিয়ে চলতে লাগল। সেই সঙ্গে নাচও উদ্দাম হয়ে উঠল—দর্শকরাও হাততালি ও বাহবা দিতে লাগল ছন্দময় ভঙ্গিতে।

এটাই ছিল সে যুগে দক্ষিণ সমুদ্রের অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের স্বাভাবিক জনজীবন। আকাশে তারার প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলছে। ফুলের গন্ধে মাতাল রাত মৃদু ছন্দে এগিয়ে চলেছে। ঝি-ঝিঁ পোকার অশ্রান্ত ঝিঝিঁ শব্দ ভেসে আসছে। আনন্দে উদ্বেল তুপুহো আমার কাঁধে মৃদু আঘাত করল।

'মাই তাই?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, মাই তাই,' বললাম আমি।

'মাই তাই?' অন্যদেরও সে একই প্রশ্ন করল।

'মাই তাই'—তারাও জোরের সঙ্গে বলল। এটা তাদের মনের কথা।

'মাই তাই', তুপুহো মাথা ঝাঁকাল। নিজেকে দেখিয়ে জানাল, সে নিজেও খুব উপভোগ করছে—প্রাণভরে।

এমন কি টেকার কাছেও ভোজোৎসব অপূর্ব মোহময় হয়ে উঠেছে।

রারোরিয়ায় এই প্রথম সাদা মানুষেরা নাচের উৎসবে উপস্থিত। আরও দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে ঢাক পেটানো, হাততালি, গান ও নাচ চলেছে। এবার একটি কিশোরী নাচুনে মেয়ে বৃত্তের মধ্যে নাচ থামিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল—হের-মানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেহ মুচড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে নাচতে লাগল। হেরমান

দাড়ির আড়ালে কুঁই-কুঁই আওয়াজ করতে লাগল। কি ভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করবে বুঝতে পারছে না।

'খেলুড়ে ভাব দেখাও', ফিসফিস করে বললাম আমি, 'তুমিও তো একজন চৌখোস নাচিয়ে।'

জনতা অসীম আনন্দে ফেটে পড়ল। হেরমান ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুটা শুঁড়ি মেরে দেহ মুচড়িয়ে হুলা-নাচের দুরূহতম অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। একটু পরে বেংট আর টরস্টেইনও সেই বৃত্তে লাফিয়ে পড়ল—নাচে যোগ দিতে। এমন তীব্র নাচতে লাগল যে গা দিয়ে ঘামের বন্যা বইতে লাগল। আর এই নাচ এমন একটা তুঙ্গে উঠে গেল যে একমাত্র দীর্ঘয়াত তালে ঢাকই বাজতে লাগল আর তিন হুলা নাচিয়ের নাচের গতি এমন তুঙ্গে উঠে গেল যে তারা পপলার পাতার মতো কাঁপতে লাগল! এবার নৃত্যগীতের অবসান ঘটল। ঢোল বাজানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আজকের সন্ধ্যা আমাদের করায়ত্ত। উৎসাহ-উত্তেজনার সীমা-পরিসীমা নেই।

উৎসবের পরবর্তী কার্যক্রম—বিহগ-নৃত্য। রারোরিয়ার উৎসব অনুষ্ঠানের একটি প্রাচীনতম কার্যক্রম। মেয়ে আর পুরুষেরা দুটো দলে ভাগ হয়ে ছন্দোময় লীলায়িত ভঙ্গিতে সামনে লাফিয়ে এগিয়ে যায় পাখির ঝাঁকের দলপতিকে অনুসরণের অনুকরণে। নাচিয়েদের দলপতি পাখিদের দলপতির খেতাব গ্রহণ করলেও প্রকৃত নাচে যোগ না দিয়ে অদ্ভুত দেহভঙ্গি করে। নাচ শেষ হলে তুপুহো বুঝিয়ে দিল ভেলার সম্মানার্থে এই নৃত্যানুষ্ঠান। আবার নাচের পুনরাবৃত্তি হবে। এবার নাচিয়েদের দলপতির স্থান নেব আমি। আমার মনে হল নাচিয়েদের দলপতির মুখ্যত কাজ হল মুখে বুনো গর্জন তোলা, কোমর থেকে কুঁচকি পর্যন্ত বেঁকিয়ে লাফান, দেহের পিছন মোচড়ান আর হাত দুটো মাথায় তুলে ঝাঁকান। আমি ফুলের মালাটা টেনে মাথার উপর তুলে নৃত্যের রণাঙ্গনে প্রবেশ করলাম। নাচের ভঙ্গিতে আমিও দেহকে বাঁকাতে লাগলাম। আমি দেখলাম তুপুহো হাসছে—হাসতে হাসতে টুল থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার যোগাড়। সংগীত ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। কারণ গায়ক ও নাচিয়েরাও তুপুহোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

এখন বুড়ো-বুড়ি, তরুণ-তরুণী, মেয়ে-পুরুষ সবাই নাচতে উৎসুক। আবার ফিরে আসছে ঢোল বাজিয়ে আর মাটি চপাড়নেওয়ালারাও এসে উপস্থিত হয়েছে। শুরু হয়ে গেল উদ্দাম হুলা-হুলা নাচ রৈ-রৈ শব্দে। প্রথমে হুলা-মেয়েরা সেই বৃত্তে লাফিয়ে এসে নাচকে এমন এক তুঙ্গে পৌছে দিল যে তা উন্মত্ততার পর্যায়ে উঠে গেল। নাচে যোগ দিতে আমাদেরও আহ্বান জানান হল—আরও অনেক মেয়ে-পুরুষ নাচে যোগ দিতে লাগল—দেহকে নানাভাবে বেঁকিয়ে মুচড়িয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে নাচতে লাগল। ধূলির ঝড় উঠল।

কিন্তু এরিককে কোন মতেই নড়ান গেল না। ভেলার উপরের স্যাঁতস্যাতানি ও জলের ঝাপটা আবার তার অদৃশ্য লামবাগো বাতকে চাগিয়ে তুলেছে। বুড়ো ইয়টচালকের মতো বসে আছে,—আড়ষ্ট, একমুখ দাড়ি, পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়ছে শুধু। হুলা নাচিয়ে মেয়েরাও তাকে টলাতে পারেনি—ওরা তাকে আসরে টেনে নামাতে যথেষ্ট লোভ দেখিয়ে ছিল। সে একটা ভেড়ার চামড়ার ট্রাউজার পরে আছে। হমবোল্ড স্রোতের এলাকার শীতলতম রাতে পরত এটাকে। রবিনসন ক্রুসোর এক অবিকল অনুকৃতি। নারকেল গাছের তলায় বিরাট শ্মশ্রু নিয়ে বসে আছে, দেহ কোমর অবধি অনাবৃত—পায়ে ভেড়ার চামড়ার ব্রিচেস বা আঁটো পাজামা। একের পর এক সুন্দরী কিশোরী তার প্রীতি কাড়তে চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু বৃথাই। সে শুধু গম্ভীর মুখে পাইপ টানতে লাগল। মাথার চুলের জঙ্গলে ফুলের মালা বসানো।

এইবার একজন সুগঠিতদেহ মহিলা নৃত্য-রণাঙ্গনে প্রবেশ করল। প্রতিটি মাংসপেশী বলিষ্ঠ। কয়েকটা রূপময় ভঙ্গিতে নাচের কসরত দেখিয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে গেল এরিকের দিকে। ওকে দেখেই শঙ্কিত হয়ে উঠল এরিক। এই রণরঙ্গিনী মর্দানী তার মন কাড়বার জন্য মুখ হাসিতে ভরিয়ে হাত শক্ত করে চেপে ধরে তাকে টুল থেকে টেনে তুলল। এরিকের আঁটো পাজামার বাইরেটা ভেড়ার চামড়ার কিন্তু ভিতরটা লোমের। দেখে হাসি সম্বরণ করা কঠিন। অধিকন্তু পাজামার পিছনের একটা জায়গা ছেঁড়া। কাজেই সেখান থেকে একগুচ্ছ সাদা লোম বেরিয়ে আছে—দেখাচ্ছে ঠিক খরগোসের লোমের মতো। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে অনুসরণ করতে বাধ্য হল এরিক—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চঞ্চল নাচের অঙ্গনের দিকে। এক হাতে পাইপ আর এক হাত যেখানে লামবাগো ব্যথাটা কষ্ট দিচ্ছে সেখানটা খিমচে ধরা। যখনই এরিক চক্রাকারে লাফাতে চেষ্টা করছে, ট্রাউজার থেকে হাতটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। মাথায় জড়ানো মালা এই বুঝি পড়ে যায় আর কি, সেই আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকতে হচ্ছে। এদিকে গলার মালা আর-এক দিকে ঝুলে পড়ছে যেই, হাত দিয়ে পাজামাটা চেপে ধরতে চেষ্টা করছে। মালাগুলো নিজেদের ভারেই গড়িয়ে যেতে লাগল। সেই মর্দানী মহিলাটি যে তার সামনে নাচের ভঙ্গিতে লাফাচ্ছিল—সে বেশ রসিক। আমাদের মুখের নিবিড় শ্মশ্রু ভেদ করেও হাসি ছিটকে বের হয়ে আসতে লাগল। সেই বৃত্তে যারা ছিল, তারাও নাচা থামিয়ে ওদের দুটিকে দেখতে লাগল—হুলা-এরিক আর ভারীওজন মহিলা চক্রাকারে নাচের ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে! নারকেল কুঞ্জ ভেদ করে তীব্র হাসির রোল চারদিকে ঝরে পড়তে লাগল। এক সময় থামতে হল ওদের দুজনকেও। কারণ এই হাস্যকর দৃশ্য দেখে বাজিয়ে আর নাচিয়েদের হাসি সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছিল।

ভোর পর্যন্ত এই ভোজোৎসব চলল। এবার আমাদের একটু বিশ্রাম নিতে দেওয়া হল। আবার একশ সাতাশ জনের সঙ্গে করমর্দন। আমরা যতদিন এই দ্বীপে ছিলাম, প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করতাম। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে কিছু কিছু নিয়ে ছটা বিছানা তৈরি করে সেই মিলন-আবাসনে পাশাপাশি রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। এখানে আমরা রূপকথার সাতটা ক্ষুদে বামনের মতো পাশাপাশি শুয়ে থাকতাম। আমাদের মাথা থেকে ফুলের মালা ঝুলত। ফুলের সে কি মিষ্টি মনমাতানো গন্ধ!

পরের দিন যে-ছ বছরের ছেলেটার মাথায় ফোঁড়া হয়েছিল তার অবস্থা খারাপের দিকে গেল। দেহের তাপ উঠে গেল ১০৬ ডিগ্রীর কোঠায়। মানুষের হাতের মুঠির মতো বড় বিস্ফোটক—যন্ত্রণায় দপ দপ করছে।

এইভাবে অনেক ছেলে এখানে মারা যায়, টেকা জানাল। আমরা যদি চিকিৎসা করে সারিয়ে না তুলতে পারি, এ ছোঁড়াটাও আর বেশি দিন বাঁচবে না। আমাদের কাছে অনেকগুলো পেনিসিলিন ভরতি বোতল ছিল। কিন্তু একটা ছোট ছেলে কটা বড়ি সহ্য করতে পারবে জানতুম না আমরা। ছেলেটা যদি আমাদের চিকিৎসায় মারা যায়—গুরুতর পরিস্থিতি ঘটতে পারে।

হুট আর টরস্টেইন আবার রেডিও বের করে সব থেকে উঁচু নারকেল গাছের মাথায় এয়ারইঅ্যাল খাটিয়ে লস অ্যাঞ্জেলসে নিজেদের ঘরে বসে থাকা হাল ও ফ্রাঙ্ক—অদৃশ্য বন্ধু দু'জনের সঙ্গে বেতার সংযোগের চেষ্টা করল। ফ্রাঙ্ক একজন ডাক্তারকে টেলিফোনে ডেকে পাঠাল। আমরা রেডিও-এর চাবি ঘুরিয়ে ছেলের রোগের সবরকম উপসর্গ ও আমাদের কাছে কি কি ওষুধ আছে তারও ফিরিস্তি দিলাম। ফ্রাঙ্ক ডাক্তারের নির্দেশ রেডিও মারফত জানিয়ে দিল। ছেলেটির নাম হাউমাতা। যে-কুটিরে বিকারের ঘোরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে আর গাঁয়ের অর্ধেক লোক জড় হয়ে চোখের জল ফেলছে আর সোরগোল বাধিয়ে তুলেছে—সেখানে গেলাম আমরা।

হেরমান ও হুট চিকিৎসা শুরু করে দিল। আমরা গ্রামবাসীদের রোগীর ঘরের বাইরে রাখার চেষ্টায় প্রয়াসী হলাম। ফুটন্ত গরম জল ও ধারাল একখানা ছুরি চাইলাম যখন, ছেলের মায়ের তো ভিরমি খাবার মতো অবস্থা। ছেলেটির মাথা কামিয়ে ফোঁড়ায় অস্ত্রোপচার করা হল। এত পুঁযরক্ত জমেছিল যে ছুরি বসাতে পুঁয রক্ত ছিটকে ঘরের ছাদে গিয়ে লাগল। তাই না দেখে কয়েকজন দ্বীপবাসী ক্ষেপে জোর করে ঘরে ঢুকে পড়ল। তাদের আবার বল প্রয়োগ করে ঘর থেকে বের করে দিতে হল। একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ফোঁড়ায় অস্ত্রোপচারের পর ঘা-টা ধুয়ে মুছে বীজাণুমুক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হল। তারপর পেনিসিলিনের সাহায্য নিলাম। দুদিন-দুরাত জ্বর খুব বেড়ে গেল—প্রতি চার ঘন্টা অন্তর অন্তর ঘা পরিষ্কার

করতে লাগলাম। ঘায়ের মুখও খোলা রাখতে হচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লস অ্যাঞ্জেলসের ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হত। হঠাৎ ছেলেটির জ্বর কমতে শুরু করে দিল। পুঁষ জমতে বাধা দিতে প্লাজমা ব্যবহার করা হত। ঘা শুকোচ্ছে। ছেলেটির জ্ঞান ফিরে এসেছে। হাসি দেখা দিয়েছে মুখে। সে সাদা আদমীদের আনা ছবির বই দেখার বায়না ধরল—যাতে আছে মোটরকার গরু ও বহুতলা বাড়ির দৃশ্য।

সপ্তাহ খানেক পরে—হাউমাতা অন্য ছোট ছেলেদের সঙ্গে বেলাভূমিতে খেলা করছিল। মাথায় বড় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শীগগিরই ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলার আদেশও পেয়েছে।

ছেলেটি সুস্থ হওয়ার পর এ গাঁয়ে আরও অনেকের অসুখ দেখা দিল। রোগের যেন শেষ নেই। কারুর দাঁতে ব্যথা—পাকাশয়ের আন্ত্রিক রোগে ছোট বড় অনেকেই ভোগে আর ছোটদের ফোঁড়া তো প্রায় ঘরে ঘরে। আমরা রোগীদের পাঠিয়ে দেই ড. হেরমান ও ড. মুটের কাছে। তারা খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নানা নির্দেশ দেয়। তাদের ওষুধের বাক্সের বড়ি বটিকা ও মালিশ প্রায় নিঃশেষ। কারুর কারুর রোগ ভালো হয়ে গেল। তবে কারুরই রোগ না সারলেও বাড়ে নি। ওষুধের বাক্স খালি হয়ে গেল। আমরা যইয়ের পরিজ কোকো তৈরি করে খেতে দিতাম—বায়ুরোগাক্রান্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে তা ধন্বন্তরির কাজ করত।

আমরা এই বাদামী বন্ধুদের সঙ্গে খুব বেশিদিন থাকতে পারিনি। সেই ভোজোৎসবের পর আবার নতুন অনুষ্ঠানের সূচনা হল। আমাদের রারোরিয়ার নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। সেই সঙ্গে পলিনেশীয় নামকরণও করা হবে। আমার তেরাই মাতিয়েতো নামটা তাহিতিতে চললেও এখানে চলবে না।

একটা বাগানের মধ্যে ছ-টা টুল রাখা হল। গাঁয়ের লোকেরা সাত সকালে জড়ো হতে লাগল সেখানে—যাতে বৃত্তের প্রথম সারিতে জায়গা করে নিতে পারে। তাদের মধ্যে টেকাও আসন নিল। গম্ভীর মুখ। সে প্রধান হলেও যেখানে প্রাচীন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তার স্থান সাধারণের মতো। তুপুহো এই অনুষ্ঠানের পুরধা হল।

সবাই চুপচাপ বসে। ভীষণ উদগ্রীব। এমন সময় বেশ ঠাটঠমকের সঙ্গে তুপুহো গম্ভীর ও ধীর পায়ে এল এগিয়ে। হাতে গাঁটওয়ালা মোটা ছড়ি। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল সে। যখন সে এগিয়ে এল সবার চোখ তার উপর পড়ল। গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল সে। নেতৃত্বে তার জন্মগত অধিকার। অদ্ভুত বক্তা। সময়োপযোগী অভিনেতা।

প্রধান গায়ক ঢোল বাজিয়ে ও নাচের অধিনায়কদের দিকে তাকাল। তারপর

সেই গাঁটওয়ালা ছড়ি এক এক দলের দিকে তুলে ধরতে লাগল মাপা কথায়, ছোট ছোট স্পষ্ট নির্দেশ দিতে লাগল। এবার সে তাকাল আমাদের দিকে। হঠাৎ বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। চোখের বড় বড় শ্বেতচ্ছদ দাঁতের মতো ঝকঝক করছে তামাটে বাদামী মুখের পটভূমিকায়। অভিব্যক্তিপূর্ণ সে-মুখ। আবার গাঁটওয়ালা ছড়িটা উত্তোলিত হল শূণ্যে—ঠোঁঠ থেকে কথার স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল নিরুদ্ধ গতিতে। প্রাচীন মন্ত্র অনর্গল উচ্চারিত করে যেতে লাগল। বুড়োরা ছাড়া কেউ তার অর্থ অনুধাবন করতে পারল না। কারণ মন্ত্রের ভাষা সুপ্রাচীন—বহুকাল বিস্মৃত।

সে যা বলল টেকা তা অনুবাদ করে দিতে লাগল। তুপুহো বলল, যিনি প্রথম এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তাঁর নাম রাজা টিকারোয়া। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে এবং মানুষের মাথার উপরের আকাশ নিয়ে জলস্থল অন্তরীক্ষ উপহ্রদ বেষ্টিত এই বলয়াকার প্রবাল দ্বীপের উপর রাজত্ব করে গেছেন তিনি।

রাজা টিকারোয়া সম্বন্ধে প্রাচীন লোকগাথা সমগ্র গায়ক মণ্ডলী গাইতে লাগল। তুপুহো তার বিরাট হাতখানা আমার বুকের উপর স্থাপনা করে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বলল, সে আমার নামকরণ করছে ভেরোয়া টিকারোয়া বা টিকারোয়ার প্রেত-আত্মা।

গান শেষ হলে হেরমান ও বেন্টের পালা এল। তাদের বুকেও বিরাট হস্ত ন্যস্ত হল একের পর এক। তাদের নাম হল—তুপুহো-ইতেতাহুয়া ও তোপাকিনো। দুজন প্রাচীন বীরের নাম। বীভৎস সামুদ্রিক দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল তারা—রারোরিয়া প্রবাল-প্রাচীরের প্রবেশ মুখে নিহত করেছিল তাকে।

ঢাকী কয়েক দফা প্রচণ্ড বেগে ঢাক বাজাল। এমন সময় নেঙটি পরনে দুজন বলিষ্ঠ জোয়ান, হাতে দীর্ঘ বর্শা, এগিয়ে এল লাফিয়ে। বর্শাটা মাথায় ও হাঁটুটা বুকের কাছে তুলে তারা দ্রুত বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল আর এপাশে-ওপাশে তাকাতে লাগল। আবার ঢাকের বাদ্যি শুরু হতেই লাফিয়ে উঠল শূণ্যে—রীতিমতো নৃত্যছন্দে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের মহড়া দিতে লাগল যৌথ নাচের ভঙ্গিতে। সমস্ত ঘটনাটা অভিনীত হল অতি অল্প সময়ের জন্য আর খুবই দ্রুত গতিতে। সমুদ্র দানবের সঙ্গে বীরোচিত যুদ্ধের মহড়া। সংগীত ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টরস্টেইনের নামকরণ সমাপ্ত হল। নাম হল তার ম্যারোয়েক—এই গাঁয়ের এক প্রাচীন রাজার নাম। এরিক ও নুটের নাম হল—তানে-মাতারাউ আর তেফাউনুই। অতীতের দুজন নাবিক ও সমুদ্রের বীর। এই নামকরণের দীর্ঘ একঘেঁয়ে সঙ্গীতাভিনয় ঝড়ের বেগে সমাপ্ত হল—চলল অনর্গল বাগবিস্তার। আর এমন অবিশ্বাস্য ঝটিকা গতিতে সম্পাদিত হল সমস্ত অনুষ্ঠান যে উপভোগ্য করে তোলা ও মনের উপর দাগ কাটাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠান সমাপ্ত। আর একবার রারোরিয়ায় পলিনেশীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে শ্বেতকায় শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষের। মেয়ে-পুরুষের দুসারি নাচিয়ে এগিয়ে এল। পরনে বিনুনিকরা চ্যাপটা খড়ের ঘাঘরা, মাথায় লেবুজাতীয় ফলের ভিতরের ছালের আঁশ দিয়ে তৈরি মুকুট। নাচতে নাচতে এগিয়ে এল তারা আমাদের দিকে। মুকুটগুলো নিজেদের মাথা থেকে খুলে পরিয়ে দিল আমাদের মাথায়। আমাদের কোমরেও মর্মরিত খড়ের ঘাঘরা জড়াতে হল। উৎসব নিরবচ্ছিন্ন ধারায় গড়িয়ে যেতে লাগল।

একদিন ফুলের পোশাকপরা রেডিও চালকরা রারোটোঙ্গার লোকটির সঙ্গে বেতার যোগাযোগ করল। লোকটিও তাহিতি থেকে পাওয়া একটি খবর পরিবেশন করল। প্রশান্ত মহাসাগরের ফরাসী কলোনীর গভর্নর আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্যারি থেকে নির্দেশ এসেছে। আমাদের এখান থেকে তাহিতি নিয়ে যাবার জন্য সরকারী স্কুনার তামারাকে (মধ্য যুগের দুই মাস্তলযুক্ত জাহাজ) পাঠান হচ্ছে। কাজেই কবে ছোবড়া নিতে স্কুনার আসবে সেই অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় আর বসে থাকতে হবে না। তাহিতি ফরাসী কলোনীর কেন্দ্র-অঞ্চল। তাছাড়া এটাই একমাত্র দ্বীপ যার সঙ্গে সারা পৃথিবীর যোগাযোগ আছে। আমাদের নিজেদের জগতে ফিরে আসতে হলে তাহিতি হয়ে যেতেই হবে।

রারোরিয়ার ভোজোৎসব এক নাগাড়ে চলেছে। একদিন সমুদ্রের দিক থেকে অদ্ভুত সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। নারকেল গাছের মাথায় বসে যারা পাহারা দেয়, তারা জানাল লেগুনের প্রবেশমুখে একটা জাহাজ ভিড়েছে। নারকেল বন ভেঙে আমরাও ছুট দিলাম একেবারে বেলাভূমির দিকে। দ্বীপের অনুবাতের দিক এটা। বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে যে-দিক থেকে এসেছি, আমরা তার বিপরীত সমুদ্রের পানে তাকালাম।

লেগুনে ঢোকবার পথের ঠিক বাইরে একটা জাহাজের আলোক বর্তিকা দেখতে পেলাম। বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে রাত। আকাশে অগণিত নক্ষত্র। একটা বড় স্কুনারের প্রশস্ত হাল ও দুটো মাস্তল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটাই কি গভর্নর প্রেরিত জাহাজ যেটা আমাদের নিতে আসছে? ভিতরে ঢুকছে না কেন জাহাজটা?

দ্বীপবাসী ক্রমশ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগল। এবার আমরা বুঝতে পারলাম কি ঘটতে যাচ্ছে। জাহাজটা ভারী। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে—উলটে যাবে। জলের তলায় অদৃশ্য প্রবালপ্রাচীরে আটকে গেছে।

টরস্টেইন একটা আলো হাতে নিয়ে সঙ্কেত করতে লাগল। কোথাকার জাহাজ? 'মারোয়ী'—আলোর মারফত উত্তর এল।

'মারোয়ী' একটা ছোবড়ার স্কুনার—যেটা দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে আসা-যাওয়া

করে। রারোরিয়া থেকে ছোবড়া নিতে এসেছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাবিকরা সবাই পলিনেশীয়। তারা সমুদ্রে কোথায় প্রবাল প্রাচীর আছে সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু লেগুনের বাইরের সমুদ্রের স্রোতধারা অন্ধকারে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সৌভাগ্যবশত স্কুনারটা দ্বীপের অনুবাতে আছে। আবহাওয়া মোটামুটি শান্ত। মাস্তুলের সঙ্গে মোটা মোটা কাছি বেঁধে কাছির আর এক প্রান্ত নৌকো করে দ্বীপে এনে নারকেল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হতে লাগল—যাতে না জাহাজটা উলটে যায় যখন জোয়ারের জল ভাঁটির টানে লেগুন থেকে বের হয়ে যেতে শুরু করবে। দ্বীপের লোকেরা সবকটা ক্যানু জলে ভাসাল জাহাজের মালপত্র উদ্ধার করে নিয়ে আসতে। জাহাজে নব্বুই টন মূল্যবান ছোবড়া আছে। বস্তার পর বস্তা কাত হওয়া জাহাজ থেকে ক্যানুতে নামান হতে লাগল। তারপর ডাঙায় বয়ে নিয়ে আসা হবে।

গভীর জলেও স্কুনারটা আটকে গেছে মগ্ন চড়ায়। স্রোতের ধাক্কায় লাফাচ্ছে, দুলছে। শেষ পর্যন্ত জাহাজের এক জায়গায় ফুটো হয়ে গেল। সকালের দিকে দেখা গেল স্কুনারটার অত্যন্ত কাহিল ও সঙ্কটজনক অবস্থা। ক্যানু আর নিজেদের নৌকোর সহায়তায় একশ পঞ্চাশ টনের ভারী জাহাজটাকে স্থানচ্যুত করার নাবিকদের সব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। যেখানে আটকে আছে সেখানেই যদি অনবরত নড়াচড়া, দোদুল্যমান করে, তাহলে জাহাজটা ক্রমশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আবহাওয়ার যদি পরিবর্তন হয়, স্রোতের টানে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হবে জাহাজটা—তরঙ্গের কবলে পড়ে সঙ্গীন বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

জাহাজটার কোন রেডিও-ব্যবস্থাদি নেই। আর থাকলেও তাহিতি থেকে উদ্ধার-কারী জাহাজ পাওয়াও অসম্ভব। ইতিমধ্যে স্কুনারটা আবর্তিত হতে হতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একমাসে দু-দুবার রারোরিয়ার প্রবাল প্রাচীরের গ্রাস থেকে শিকার ফসকে গেল।

সেদিন দুপুরের দিকে পশ্চিমে দিগন্তের কোলে তামারাকে দেখা গেল। রারোরিয়া থেকে আমাদের নিয়ে যেতে পাঠানো হয়েছে তাকে। জাহাজে যারা ছিল তারা তো অবাক! কোথায় তারা একটা ভেলা দেখবে আশা করে এসেছে, সেখানে কিনা একটা বিরাট স্কুনারের মাস্তুল দেখতে পাচ্ছে! অসহায়ের মতো স্কুনারটা প্রবাল প্রাচীরের বুকে পড়ে আছে আর স্রোতের আবর্তে খাবি খাচ্ছে!

তামারায় আছেন তুয়ামোতু ও তুবুয়েই দ্বীপপুঞ্জের ফরাসী প্রশাসক মসিঁয় ফ্রেদরিক আনে! ফরাসী গভর্নর জাহাজের সঙ্গে তাঁকেও পাঠিয়েছেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। একটা ফরাসী মুভি ক্যামেরাও আছে জাহাজে—একজন টেলিবার্তা প্রেরকও। কিন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকরা সবাই পলিনেশীয়। মসিঁয় আনের

জন্ম তাহিতিতে। বাপ-মা ফরাসী। একজন নামকরা নাবিক। তিনি তাহিতির ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে জাহাজ পরিচালনার দায়িত্ব চেয়ে নিলেন। ক্যাপ্টেনও এই বিপদসঙ্কুল এলাকায় পরিচালন-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পেরে খুশি। তামারা অসংখ্য ডুবো প্রবাল-প্রাচীর ও জলের ঘূর্ণী এড়িয়ে যেতে লাগল। জাহাজ দুটোকে মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা হল। আনে এবার তাঁর বিপজ্জনক ও কুশলী অবঘাতন ক্রিয়া বা জাহাজকে পাক খাওয়ানোর খেলা চালাতে লাগলেন। এদিকে জোয়ারের জল জাহাজ দুটোকে একই প্রবাল-প্রাচীরের দিকে নিয়ে যাওয়ার মারাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

জোয়ারের জল যখন ফুলে উঠল মায়োয়ী প্রবাল-প্রাচীরের বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেল। তামারা তাকে গভীর জলে টেনে নিয়ে এল। এবার জাহাজের খোলের ফুটো দিয়ে হু-হু শব্দে জল ভিতরে ঢুকতে লাগল। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ফুটো-হওয়া জাহাজটাকে লেগুনে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তিন দিন জাহাজটা গাঁ থেকে কিছু দূরে জলমগ্ন অবস্থায় রইল—জল বের করে দেওয়ার পাম্প দিবারাত্রি কাজ করা সত্ত্বেও। দ্বীপের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তো ডুবুরীরা দস্তার পাত ও পেরেক নিয়ে জলের তলায় গিয়ে ফুটোগুলো বন্ধ করার কাজে লেগে গেল। তাহলে জাহাজটাকে তামারা সঙ্গে করে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তাহিতিতে নৌ-ঘাটায়। অবশ্য পাম্পের সাহায্যে জল বের করে দেওয়ার কাজ অবিচ্ছিন্ন চলতে লাগল।

মায়োয়ীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রস্তুত হলে আনে লেগুনের জলের তলায় ডুবো প্রবাল স্তূপের বেড়াজাল ভেদ করে তামারাকে কন-টিকি দ্বীপের দিকে নিয়ে চললেন—ভেলাটা ও মায়োয়ীকে পিছনে বেঁধে। তামারাকে লেগুন থেকে বের হয়ে যাবার মুখের কাছে চালিত করে নিয়ে যাওয়া হল। মায়োয়ীকে কাছাকাছি বেঁধে রাখা হল। সমুদ্রে যদি ছিদ্রপথে জল ঢুকে জাহাজটা ডুবে যায়, তখন জাহাজের নাবিকদের তামারায় চালান করে দেওয়া আদৌ কষ্টকর হবে না।

রারোয়িয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর্ব খুবই বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। যারা হাঁটতে পারে বা হামাগুড়ি দিতে পারে, সবাই জাহাজ ঘাটায় জড়ো হল আমাদের বিদায় জানাতে। নাচে গানে মুখরিত করে তুলল বেলাভূমি যখন আমাদের নৌকো করে তামারায় নিয়ে যেতে লাগল।

তুপুহোকে সবার মাঝখানে দেখা যাচ্ছে—ছোট্ট হাউমাতাকে ধরে আছে। কাঁদছে হাউ মাতা। বর্ষীয়ান প্রধানের গাল বেয়েও টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ছে। জেটিতে এমন কেউ ছিল না যার চোখ শুকনো। কিন্তু গান ও বাজনা মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয়নি। তরঙ্গের গর্জন সব শব্দ ডুবিয়ে দিলেও তারা আরও অনেকক্ষণ গান ও বাজনার জলসা চালিয়েছে।

জাহাজ ঘাটায় দাঁড়িয়ে যারা গান করছে তারা ছ-জন বন্ধুকে হারাল। আমরা তামারার ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম যতক্ষণ না শেষ নারকেল গাছের আড়ালে আর নারকেল বন সমুদ্রে হারিয়ে গেল। আমরাও একশ সাতাশ জন বন্ধুকে হারালাম। এখনও সেই অদ্ভুত সংগীত কানে লেগে আছে। মন নিবিষ্ট করলে অন্তঃকর্ণে এখনও বেজে ওঠে—'আমাদের সঙ্গে স্মৃতি বিনিময় করলে দেখতে পাবে, আমরা তোমাদের পাশেই আছি—এমন কি যখন তোমরা সুদূরে যাবে চলে। বিদায়।'

চারদিন পর। সমুদ্র গর্ভ থেকে মাথা জাগিয়ে উঠল তাহিতি। নারকেল কুঞ্জ বেষ্টিত মুক্তার মালার মতো নয়। বন্য বন্ধুর নীল পাহাড় আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে আছে। তুঙ্গ শীর্ষে মালার আকারে পালকের মতো মেঘ ছেয়ে আছে।

যতই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজ নীল পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের সবুজ ঢাল দেখা যাচ্ছে। সবুজের পর সবুজের ঢেউ। মরচে লাল পাহাড় ও দুরারোহ পাহাড়ের পাশ থেকে রসাল ও শাঁসাল সবুজের ঢল নেমেছে। গভীর গিরিখাত। উপত্যকা পেরিয়ে এসে সমুদ্রে মিশেছে। সর্বত্র সবুজের সমারোহ। তীরের কাছে এলে, সমস্ত উপত্যকা ও সোনালী বেলাভূমির পশ্চাৎপটে তটদেশ জুড়ে ঘনসন্নিবিষ্ট কচি নারকেল গাছের সারিও দেখতে পেলাম। সুদূর অতীতে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট এই তাহিতি দ্বীপ। আগ্নেয়গিরি এখন মৃত। প্রবাল কীটেরা তাদের পঞ্জর অস্থি দিয়ে ঘিরে রেখেছে সমগ্র দ্বীপটা। এর ফলে সমুদ্র দ্বীপের মাটি ধুয়ে মুছে ফেলতে পারছে না।

একদিন ভোরের দিকে প্রবাল প্রাচীরের বেষ্টনীর একটা ফাঁক-মুখ দিয়ে তাহিতি বন্দরে এসে ভিড়ল আমাদের জাহাজ। বন্দরের নাম পাপিতি। সামনে দেখতে পাচ্ছি গির্জার সুউচ্চ চূড়া, লাল ছাদ—বিপুলকায় বনস্পতি ও নারকেল গাছের পাতার আড়ালে অর্ধ ঢাকা পড়ে গেছে। তাহিতির রাজধানী পাপিতি। ফরাসী এলাকার সমুদ্রের একটি মাত্র শহর। আনন্দের রাজ্য। শাসনকর্তার আবাসস্থল। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে যানবাহন ও লোক চলাচলের নাভি-কেন্দ্র।

আমরা যখন বন্দরে প্রবেশ করলাম, তাহিতির জনসাধারণ অপেক্ষা করছিল জাহাজ ঘাটায় ঠাসাঠাসি হয়ে—যেন একটা বর্ণাঢ্য জীবন্ত দেয়াল। সমগ্র তাহিতিতে হাওয়ায় যেন খবর প্রচারিত হয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে দুস্তর সমুদ্র পেরিয়ে একটা পাই-পাই এসেছে। প্রত্যেকেই একবার দেখতে চায় ভেলাটাকে।

সমুদ্র সৈকতের সন্নিহিত তৃণাচ্ছাদিত ময়দানে কন-টিকিকে একটা সম্মানিক স্থান দেওয়া হয়েছে। পাপিতির মেয়র আমাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা জানালেন। আর সমস্ত পলিনেশীয় সমাজের পক্ষ থেকে একটি পলিনেশীয় কিশোরী বুনো ফুলের এক বিরাট চক্র উপহার দিল। তারপর এগিয়ে এসে প্রত্যেকের গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা পরিয়ে

দিয়ে 'দক্ষিণ সমুদ্রের মুক্তা' তাহিতি দ্বীপে আন্তরিক আহ্বান জানাল সকলকে।

এই জনতার মধ্যে একটি মুখ আমি হন্তে হয়ে খুঁজছিলাম! তাহিতির সেই বুড়ো বাপ যে আমাকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল—তেরিয়েরুকে। তেরিয়েরু এই দ্বীপের সতেরটি দলপ্রধানের অধিনায়ক। না, সে হারিয়ে যায়নি। বিরাট মোটাসোটা চেহারা—আগে যেমন ছিল আজও তেমনি হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল মানুষটি ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে চিৎকার করে ডাকল—'তেরাই মাতিয়েতা।' তার প্রশস্ত মুখাবয়বে হাসি যেন উপচে পড়ছে। অনেক বুড়িয়ে গেছে মানুষটি কিন্তু এখনও মনকে অভিভূত করার মতো অধিনায়কের সেই চেহারাটি অটুট আছে।

'বড্ড দেরি করে ফেলেছ,' হাসতে হাসতে বলল সে, 'তবে শুভ সংবাদ বহন করে এনেছ তুমি। তোমার পাই-পাই তাহিতিতে নীল আকাশের বার্তা এনেছে। এখন আমরা জানতে পারলাম আমাদের পূর্ব পুরুষেরা কোথা থেকে এসেছে এদেশে।'

গভর্ণরের রাজপ্রাসাদে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হল। টাউন হলেও একটা ভোজ দেওয়া হল। এই আতিথ্যপরায়ণ নগরীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে আসতে লাগল বৃষ্টি ধারার মতো আমন্ত্রণের পর আমন্ত্রণ।

আগে যেমন হত, অধিনায়ক তেরিয়েরু প্যাপেনো উপত্যকায় নিজের বাড়িতে বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করল আমাদের। জায়গাটা আমার খুব চেনা। রারোয়িয়া তো আর তাহিতি নয়। তাই প্রত্যেককে যার নাম নেই, তাকে আবার তাহিতি নাম দেওয়া হল।

আকাশে ভাসমান মেঘ আর সূর্যের কিরণস্নাত আকাশের নিচে সে এক চিন্তাহীন আনন্দঘন দিন। লেগুনের জলে স্নান, পাহাড়ে ওঠা, নারকেল কুঞ্জে হুলা-নাচ। দিন কেটে যায়—সপ্তাহও গড়িয়ে আসে। সপ্তাহান্তে মাসও আসবে! কিন্তু মাস পূর্ণ হবার আগেই একটা জাহাজ এল আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে—আমাদের জন্মভূমিতে। সেখানে বহু কর্তব্য কর্ম আমাদের মুখ চেয়ে বসে আছে।

নরওয়ে থেকেও বার্তা এসে পৌছল।—লারস থুস্টেনসন চার হাজার টনের জাহাজ 'থর-আই'কে স্যামোয়া থেকে তাহিতি যাবার নির্দেশ দিয়েছে। সেখান থেকে অভিযাত্রীদের তুলে নিয়ে আমেরিকায় পৌছে দেবে।

একদিন খুব ভোরে নরওয়ে থেকে আসা জাহাজ পাপিতি বন্দরে এসে ভিড়ল। একটি ফরাসী নৌযান কন-টিকিকে বয়ে এনে তার স্বদেশবাসীর কাছে পৌছে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা লোহার হাত জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট আত্মীয়টিকে ডেকের উপর তুলে নিল! জাহাজের সাইরেন থেকে তীব্র আওয়াজ নিঃসৃত হল—তাল-বৃক্ষ অধ্যুষিত দ্বীপের বনে বনে প্রতিধ্বনি তুলল। পাপিতির বন্দরে শ্বেতকায় ও বাদামী জনতার ভিড় জমে উঠল অভিনন্দন জানাতে—নানা উপহার ও ফুলের মালা

নিয়ে দলে দলে লোক জাহাজের ডেকে আসাতে লাগল। আমরা রেলিংয়ের ধারে জিরাফের মতো গলা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কোনমতে ক্রমবর্দ্ধমান ফুলের স্তূপ থেকে থুতনিটাকে মুক্ত রাখতে।

জাহাজের হুইসেল বেজে উঠে দ্বীপে ছড়িয়ে পড়তেই দল নেতা তেরিয়েক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আবার যদি কোনদিন তাহিতিতে ফিরে আসতে চাও তার প্রমাণ হিসেবে জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেগুনের জলে প্রত্যেকে এক একটা মালা ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

আমরা ছ-টা মালা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে।

দড়ি কাছি খুলে ফেলা হল, গর্জে উঠল জাহাজের ইঞ্জিন, সবুজ জলে আছড়ে পড়তে লাগল প্রপেলার (চালন-চক্র)। আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে জাহাজঘাটা ছাড়িয়ে সমুদ্রের দিকে এগুতে লাগল।

ধীরে তালগাছের পিছনে লাল ছাদ অদৃশ্য হয়ে গেল—তালগাছদেরও পাহাড়ের নীলিমা গ্রাস করে নিল আর নীল পাহাড়ও প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছায়ার মতো ডুবে গেল।

শুরু হয়ে গেছে নীল সমুদ্রের তরঙ্গের আখালি-পাথালি আর তাদের কাছে আমরা ফিরে যেতে পারব না। অয়নবায়ু তাড়িত সাদা মেঘ নীল আকাশের বুকে ভেসে চলেছে। আমরা আর তাদের গতিপথের দিকে যাচ্ছি না। এবার আমরা প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে চলেছি। আমরা এগিয়ে চলেছি বিংশ শতাব্দীর দিকে এখনও দূরে—বহু দূরে।

ডেকের উপর আমরা ছ জন দাঁড়িয়ে আছি নটা বালসা-কাঠের খণ্ডের কাছে। আমরা যে এখনও প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছি তার জন্য কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। তাহিতির লেগুনের জলে ছটা মালা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছে—অনবরত আসা-যাওয়া ছোট ছোট ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে—একবার তীরে এসে উঠছে আবার ভেসে যাচ্ছে জলে।